# বাংলার আর্থিক ইতিহাস

( অষ্টাদশ শতাব্দী )

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, হইতে মুদ্রিত ও কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত।

উৎসর্গ

শ্রীমান সুনন্দকে

# ভূমিকা

পন্ডিত মহলে ভারত ইতিহাসের অষ্টাদশ শতক অরাজকতার শতবর্ষ (century of anarchy) নামে অভিহিত। এ শতকের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় শক্তির পতন, সিংহাসন নিয়ে বিরোধ, গৃহযুদ্ধ, প্রাদেশিক সুবাদারগণের বিদ্রোহ, বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক আক্রমণ, বিভিন্ন আঞ্চলিক বিদ্রোহ ( মারাঠা, শিখ, জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী ইত্যাদি ) ও শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি। অষ্টাদশ শতকের বাংলা এসব থেকে মুক্ত ছিল। মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি পর্যন্ত বাংলার নবাবরা বাংলাদেশে শান্তি বজায় রেখেছিলেন। আলিবর্দির সময়ে বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ ( ১৭৪২-১৭৫১ ) হয়েছিল ঠিকই তবে এ আক্রমণ বাংলার পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি। বাংলার উপকূলভাগে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের উৎপাত ছিল। পলাশী থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যভার গ্রহণ পর্যন্ত ( ১৭৫৭-১৭৭২ ) বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ( ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ )। তবে শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে কোনো বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেনি। সুতরাং বলা যেতে পারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় বাংলাদেশে সারা শতকব্যাপী আপেক্ষিক শান্তি ছিল।

এ শান্তি নিঃসন্দেহে বাংলার আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। এ শতকে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্চর্যরকম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার উর্বর জমি, প্রাকৃতিক জলসেচ ব্যবস্থা, শান্ত ও পরিশ্রমী মানুষ বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির কারণ। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী অনেকগুলি পণ্য বাংলাদেশে উৎপন্ন হত। এগুলি হল বিভিন্ন ধরনের সুতীবস্ত্র, মসলিন, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম। ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এগুলির উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং এজন্য বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের পরিধিও বাড়ে। এ শতকের শেষ দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে বাংলার আর্থিক কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আধুনিক আর্থিক পরিচালন সংস্থাগুলি—ব্যাঙ্কিং, বীমা, এজেন্সি প্রভৃতি—গড়ে উঠে যেগুলি পরবর্তীকালে বাংলার আর্থিক কর্মকাণ্ডের মেরুদণ্ড হয়। বাংলার অর্থনীতির আধুনিকীকরণ এবং সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক কর্মনীতির সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শুরু হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতকে বাংলার আর্থিক জীবনধারা দুভাগে বিভক্ত। প্রাক্-পলাশী যুগে আর্থিক কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন। পলাশী-উত্তরকালে

বাংলার অর্থনীতি ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারি বাণিজ্য এবং কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের বেসরকারি বাণিজ্য দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। তাই দ্বিতীয়পর্বে আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি বাংলার কৃষক, কারিগর, কারুশিল্পী ও শ্রমিকের পক্ষে তেমন লাভজনক হয়নি। উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কায়েম করা হয় যে এদেশীয় কারিগর ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দুই বা তিনদশক আগের তুলনায় কম হয়ে যায়। লবণ, সুতীবস্ত্র ও আফিম উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগরদের বেতন সূচকে এরকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছিল।

বাংলার সুধীজনের কাছে এ গ্রন্থ সাদরে গৃহীত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

# সূচীপত্র

# ১

# ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব

## মুর্শিদকুলি থেকে দেওয়ানি (১৭০০—১৭৬৫)

### ১

দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুঘলসম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ কর্মচারী মুর্শিদকুলিকে বংলার দেওয়ান নিযুক্ত করে পাঠালেন। যুদ্ধরত সম্রাটের টাকার খুব প্রয়োজন। বাংলা ঐ সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ (জিন্নাতুল বিলাদ)। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় ত্রুটি বিচ্যুতি এবং নানারকম আর্থিক বিশৃংখলা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়েছিল। (১) বাংলার প্রায় সমস্ত খালসা জমি[১] উচ্চ রাজকর্মচারীরা জাগির হিসাবে গ্রহণ করেছিল; এর ফলে জমি থেকে রাষ্ট্রের কোনো আয় ছিল না। বাণিজ্য শুল্ক সায়ির শুধু রাষ্ট্রীয় আয়ের একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (২) অন্য প্রদেশ থেকে টাকা এনে মাঝে মাঝে বাংলার প্রশাসনিক আয় ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে হত। (৩) সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার সুবাদার আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২) সওদা-ই-খাস বা ব্যক্তিগত ব্যবসা করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়েছিলেন। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ তছরূপ এবং জবরদস্তি টাকা আদায়ের অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে ছিল।

মুর্শিদকুলির রাজস্ব, ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংস্কার ও বন্দোবস্ত সম্পর্কে সমস্তরকম তথ্যের উৎস হল তিনটি : (১) সলিমুল্লাহর 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' (১৭৬৩), (২) ইনায়েতুল্লাহ খানের 'আহকাম-ই-আলমগিরী' এবং জেমস্ গ্রান্টের 'এ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল' (১৭৮৬)। সলিমুল্লাহর ইতিহাস মূলত রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ঘটনাবলী নিয়ে। এর মাঝে মাঝে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে মুর্শিদকুলির ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা এবং রাজস্ব নীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন। ইনায়েতুল্লাহ খানের 'আহকাম' সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশ ও পত্রাবলীর এক সংকলন। আওরঙ্গজেবের পত্রাবলীতে মুর্শিদকুলি ও আজিমুশশানকে লেখা কয়েকখানি পত্র আছে যাতে বাংলার তৎকালীন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেরিস্তাদার জেমস্ গ্রান্টের প্রতিবেদন (এ্যানালিসিস) মুর্শিদকুলি তথা অষ্টাদশ শতাব্দীর

১। মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমি দুভাগে বিভক্ত—খালসা ও জাগির। খালসা জমি থেকে প্রাপ্য রাজস্ব সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট (Imperial tribute)। জাগির জমি প্রশাসনিক ব্যয়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন ও জনহিতকর কাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকত।

বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার এক অতি-জটিল, বিস্তৃত অথচ অতিমূল্যবান দলিল।

বাংলার দেওয়ানি কার্যভার গ্রহণ করে মুর্শিদকুলি প্রথমেই রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। তিনি বাংলাদেশে অফিসারদের সমস্ত জাগির খালসায় পরিণত করলেন এবং এভাবে খালসা খাতে তিনি রাষ্ট্রীয় আয় বাড়ালেন দশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো পনেরো টাকা।[২] বাংলায় জাগিরচ্যুত অফিসারদের তিনি উড়িষ্যার অনাবাদী, অনুন্নত এবং অনধিকৃত অঞ্চলে জাগির দিলেন। বাংলার রাষ্ট্রীয় অর্থ-নীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা মুর্শিদকুলির জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। আয় ব্যয়ের হিসাবে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় তিনি তৎপর এবং মনোযোগী হলেন। সুবাদার আজিমুশশান রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ করতেন; জনগণের কাছ থেকে অন্যায় ও জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা হত। সুবাদার নিজের বেতন খাতে নির্ধারিত অর্থের বেশি নিতেন।[৩] তাছাড়া ছিল তাঁর সওদা-ই-খাস বা ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা। মুর্শিদকুলি এসব বন্ধ করার চেষ্টা করাতে সুবাদার ঢাকার নগদী সেনাবাহিনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মুর্শিদকুলি তিনপ্রদেশের মধ্যস্থল মুক্‌সুদাবাদে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ) তাঁর দেওয়ান বিভাগের সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত করলেন (১৭০৪) এখানে প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করে তিনি ধীরে ধীরে বাংলার আর্থিক ব্যবস্থায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হাট, বাজার, ঘাট, উৎপন্ন পণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ধার্য শুল্ক সায়ির এ যুগে রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস। এখাতে আয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুর্নীতি-পরায়ণ অফিসার ও কর্মচারীরা ব্যক্তিগত উৎকোচ ও পারিতোষিক নিয়ে রাষ্ট্রীয় আয়ের ক্ষতি করত। মুর্শিদকুলি দক্ষ ও সৎ অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং দুর্নীতি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি দিয়ে সায়ের খাতে আয় বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস, হিসাবের তদারকি এবং প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কমিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় বাজেটে উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তাঁর অর্থনীতির এক মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল ব্যয় সংকোচ (retrenchment)। এদিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক ব্যয় কমালেন। অসৎ সরকারি কর্মচারীরা যাতে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করতে না পারে সেজন্য হিসাবের খাতা নিজে পরীক্ষা করে সই করতেন। বাংলার সেনাবাহিনী কমিয়ে মাত্র দু হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিকে এনে দাঁড় করালেন। এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতিরক্ষা খাতে

২। জেমস্ গ্রান্ট, 'এ্যানালিসিস,' ফিফ্‌থ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০।
৩। যদুনাথ সরকার সম্পাঃ, হিস্ট্রি অব বেংগল, ২য় খণ্ড, অধ্যায় একুশ।

তাঁর ব্যয় সংকোচের নীতি অবশ্য বাংলা তথা ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলে মনে হয়।

সলিমুল্লাহ জানিয়েছেন মুর্শিদকুলি বাংলা দেশে জমি জরীপ করে বিস্তৃত হস্তবুদ (অতীত ও বর্তমান রাজস্বের বিস্তৃত হিসাব বা rent roll) তৈরি করিয়েছিলেন।[৪] বাংলার জমি তিনভাগে ভাগ করে—আবাদী, অনাবাদী ও বন্ধ্যা—তিনি প্রাক্তন ও বর্তমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসলের হিসাব এবং কৃষকের ক্ষমতা বিচার করে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করেছিলেন। সারা বাংলা দেশে অবশ্য জমি জরীপ করা সম্ভব হয়নি। বীরভূমে জরীপ হয়নি কারণ এখানকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান জমিদার আসাদুল্লাহ্ খান ধর্মীয় কাজকর্মে জমি দান করেছিলেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চল দুর্গম বলে জরীপ করা সম্ভব হয়নি। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন কলকাতায় জমি জরীপ হয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে (revenue settlement) বাংলার মোট ভূমি-রাজস্ব হল এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টাশি হাজার একশ ছিয়াশি টাকা। শাহ্ সুজার সময়কার বন্দোবস্তের (১৬৫৮) উপর রাজস্ব বাড়ানো হল এগারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার দু'শ উনআশি টাকা। অর্থাৎ ৬৪ বছরে (১৬৫৮-১৭২২)[৫] ১৩$\frac{১}{২}$ শতাংশ রাজস্ব বাড়ল। মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় চাষআবাদ, ফসলের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বাড়লে ভূমি-রাজস্ব বাড়ানোর রীতি দেখা যায়। ১৬৫৮ থেকে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে চাষ-আবাদ, লোকসংখ্যা, রাজ্যের আয়তন, বাণিজ্য ইত্যাদি বেড়েছিল। সুতরাং ১৭২২ সনে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এর মধ্যে ছিল দু'লক্ষ আটান্ন হাজার আটশো সাতান্ন টাকার সুবাদারি আবওয়াব বা ভূমি-রাজস্বের উপর বাড়তি কর। মুর্শিদকুলির সময় খালসা খাতে আসল জমা (original assessed rent)[৬] ৮৭,৬৭,০১৫ (১২৫৬ পরগনা) টাকা, বাড়তি রাজস্ব ১১,৭২,২৭৯ টাকা ও জাগির অধিগ্রহণের ফলে বর্ধিত আয় ১০,২১,৪১৫ টাকা মিলিয়ে মোট দাঁড়ালো

৪। সলিমুল্লাহ্, তারিখ-ই-বাঙ্গালা, পৃঃ ৩১-৩৭। আবদুল করিম, 'মুর্শিদকুলি এ্যাণ্ড হিজ টাইমস্', পৃঃ ৭৬ ৭৮।

৫। মুর্শিদকুলির আগে শাহ্ সুজার সময়ে (১৬৩৯-১৬৫৮) ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ভূমি-রাজস্বের শেষ বন্দোবস্ত হয়েছিল।

৬। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভূমি-রাজস্বের প্রথম বন্দোবস্ত করেন। তাঁর বন্দোবস্ত আসল জমা বা তুমার জমা নামে পরিচিত। ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগনায় বিভক্ত বাংলায় তিনি খালসা (৬৩,৪৪,২৬০) এবং জাগির (৪৩, ৪৮, ৮৯২) এই দুই খাতে মোট ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকার রাজস্ব ধার্য করেছিলেন। শাহ্ সুজা ১৬৫৮ খ্রীঃ খালসা (৮৭,৬৭,০১৫) ও জাগির (৪৩,৪৮,৮৯২) মিলিয়ে রাজস্ব ধার্য করেন ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা।

১,০৯,৬০,৭০৯ টাকা। জাগির খাতে আয় কমে (শাহ্ সুজার সময়কার ৪৩,৪৮,৮৯২ থেকে) হল ৩৩,২৭,৪৭৭ (৪০৪ পরগনা) টাকা।

সলিমুল্লাহ আরো জানিয়েছেন মুর্শিদকুলি আমিল বা কালেক্টরদের অনাবাদী-জমি চাষে আনার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের কৃষি-ঋণ (তাকাবি) দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষকরা বীজ শস্য এবং চাষের বলদ কেনার জন্য এ ঋণ পেত। মুর্শিদকুলির ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় জমির জন্য কৃষকের দেয় রাজস্বের হার কত সঠিক বলা যায় না। আবদুল করিম তাঁর গ্রন্থে এ দিকটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মুর্শিদকুলির সময় বিঘা বা কানি প্রতি ভূমি-রাজস্বের হার ছিল আট থেকে দশ আনা।[৭] অর্থাৎ তৎকালীন বাজার দাম অনুযায়ী দুই থেকে আড়াই মণ চাল। এর অর্থ হল রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ ভূমিকর হিসাবে গ্রহণ করত। এ হার কোনমতেই বেশী বলা যায় না কারণ আওরঙ্গজেবের সময় ভারতে ভূমি-রাজস্বের হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ।[৮] মুর্শিদকুলির সময়ে ধার্য রাজস্ব বাংলার রাজস্বের হিসাব (valuation or aggregate) না প্রকৃত আদায় যোগ্য রাজস্ব (demand) এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে বেশ মতভেদ আছে। জেমস্ গ্রান্টের মতে ধার্য রাজস্ব আদায় করা হত অর্থাৎ demand, আর মোরল্যাণ্ডের মতে নির্ধারিত রাজস্ব valuation or aggregate; রাজস্বের মোট হিসাব। এর পুরোটা কখনো আদায় করা সম্ভব হত না। আবদুল করিম এ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মুর্শিদকুলির সময় ধার্য রাজস্ব পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব হত না।[৯]

মুর্শিদকুলি দক্ষতা ও ব্যয় সংকোচের দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমি রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রশাসনিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। শাহ্ সুজার ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্তে বাংলাকে ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি পরগনায় ভাগ করা হয়েছিল। মুর্শিদকুলি সারা বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলা এবং ১৬৬০টি পরগনা বা মহালে ভাগ করেছিলেন। তাঁর সময়কার তেরোটি চাকলা হলঃ (১) বন্দর বালাশোর বা বালেশ্বর, (২) হিজলি, (৩) মুর্শিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) হুগলী বা সপ্তগ্রাম, (৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) আকবরনগর (রাজমহল), (৯) ঘোড়াঘাট (রংপুর), (১০) কুরিবাড়ি (কুচবিহার এবং আসামের কতকাংশ), (১১) জাহাঙ্গীর-নগর (ঢাকা), (১২) শ্রীহট্ট, (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। গ্রান্টের মতে মুর্শিদ-কুলির 'চাকলাগুলি আয়তনে দরকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত, সীমানা চিহ্নিত,

৭। আবদুল করিম, ঐ, পৃঃ ৮৫ ৮৮।
৮। ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইণ্ডিয়া' পৃঃ ১৩৫।
৯। আবদুল করিম, ঐ, পৃঃ ৮৫ ও মোরল্যাণ্ড, ঐ, পৃঃ ১৯৬ ৯৭।

সুগঠিত এবং রাজস্ব সুনির্দিষ্ট'। প্রত্যেক চাকলায় একজন ফৌজদার ও একজন আমিলদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এরা দু'জনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন স্বাধীন। বৃহৎ জমিদাররা যাতে অধিক ক্ষমতাশালী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন মুঘল ব্যবস্থা অনুযায়ী মুর্শিদকুলি এদেরকে একাধিক চাকলার অধীনে স্থাপন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজশাহী জমিদারি আটটি চাকলার মধ্যে ছিল। সমস্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত মুর্শিদাবাদে হত ঠিকই তবে প্রতি চাকলা ও পরগনার রাজস্ব আলাদা-ভাবে চিহ্নিত থাকত যাতে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়।[১০]

মুর্শিদকুলির রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়ে ইতিহাসবিদ্ মহলে জোর বিতর্ক দেখা যায়। যদুনাথ সরকারের মতে মুর্শিদকুলি বাংলার প্রাচীন জমিদারদের সরিয়ে ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছিলেন।[১১] তাঁর মতে মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত ব্যবস্থাটি হল কন্ট্রাক্ট সিস্টেম বা মালজামিনী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ইজারা-দাররা রাজস্ব (মাল) আদায়ের অধিকার পাওয়ার জন্য, ফরাসীদেশের ফারমিয়ের জেনারেলদের মত, জামিন বা খত দিত এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে তাদের পারি-শ্রমিক হিসাবে একটা নির্দিষ্ট অংশ পেত। বাংলার জমিদারদের উপর ইজারা-দারদের স্থাপন করা হল। এদের চাপে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জমিদাররা ধ্বংস হয়ে গেলেন এবং দুই বা তিন পুরুষ পরে কর্ণওয়ালিশের সময় এরা জমিদার বা রাজা উপাধি পেলেন। এভাবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বংশানুক্রমিক জমিদার পরিবারগুলি মুর্শিদকুলি ও কর্ণওয়ালিশ ব্যবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আবদুল করিম যদুনাথ সরকারের এ বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পারেননি।[১২] প্রথমত, ইনায়েতুল্লাহ্ খানের 'আহকামে' ইজারা ব্যবস্থার উল্লেখ আছে ঠিকই, তবে মুর্শিদকুলির সময়ে এ ব্যবস্থা আদৌ বাংলাদেশে চালু ছিল কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অনেক পরে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-দেশে মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়েছিল। সুতরাং ঐ সময় ইজারা ব্যবস্থা চালু ছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়াও হয় যে মুর্শিদকুলির সময় ইজারা ব্যবস্থা ছিল তাহলে বলা যায় ইজারাদার-দের অবস্থা (status) অনেকখানি সরকারি কর্মচারীদের মত ছিল।' মুর্শিদকুলির হস্তবুদে নির্ধারিত রাজস্ব অনুযায়ী তাদের রাজস্ব আদায় করতে হত এবং সেজন্য পারিশ্রমিক পেত। কিভাবে তারা পারিশ্রমিক পেত তা সঠিক জানা যায় না। যদি জাগির দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তারা ছিল আমিলদের মত সরকারি কর্মচারী আর নানকর বা জীবনধারণের ভাতা পেলে তারা জমিদার ছাড়া আর কিছু নয়।

১০। জেমস্ গ্রান্ট, ঐ, ফিফ্থ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১১।
১১। যদুনাথ সরকার সম্পাঃ, ঐ, অধ্যায় ২১।
১২। আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন আবদুল করিম, ঐ, পৃঃ ৯১-৯২।

তৃতীয়ত, মুর্শিদকুলি পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত (১৭৬৫-১৭৮৯) জমি নিলামে উঠিয়ে সর্বোচ্চ করদাতার সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত (farming system) করেননি। এটা সম্ভব যে মুর্শিদকুলির সময়কার ইজারাদাররা কেউ কেউ পরবর্তীকালে বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারির ইজারা নিতে থাকেন এবং অনেকে জমিদার হয়ে যান। চতুর্থত, মুর্শিদকুলি বাংলার জমিদারদের ধ্বংস করেননি। বাংলার ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারগুলি—বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, নদীয়া, প্রভৃতি তাঁর সময় টিকে ছিল। তিনি নিজে কয়েকটি নতুন জমিদারি গড়ে তুলেছিলেন। এগুলি হল নাটোর, দীঘাপাতিয়া, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি। মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হত না। জমিদারকে বন্দী করে তার জমিদারিতে সাজোয়াল দিয়ে বাকী রাজস্ব আদায় করা হত। শুধু বিদ্রোহ করলে জমিদারের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হত। ভূষণার সীতারাম এবং রাজশাহীর দর্পনারায়ণ তাঁর সময় একারণে জমিদারি হারিয়েছিলেন। পঞ্চমত, মুর্শিদকুলি জমিদারিকে স্থায়ী সম্পত্তি বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁয়ের জন্য চুণাখালিতে জমিদারি কিনেছিলেন। এর উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে যদি সরফরাজের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে তাহলে তার জীবিকার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ মুর্শিদকুলি জমিদারির স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ষষ্ঠত, সলিমুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে মুর্শিদকুলির সময়ে কর সংগ্রাহক হিসাবে একই সঙ্গে আমিল ও জমিদারদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রহে আমিল এবং পরোক্ষ সংগ্রহে ছিলেন বাংলার জমিদাররা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুর্শিদকুলি রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমিল ও জমিদারদের নিয়ে গঠিত মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

সলিমুল্লাহ্‌র বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি মুর্শিদকুলি প্রতি বছর ১লা বৈশাখ রাজস্ব বিভাগে পুন্যাহ্ অনুষ্ঠান করতেন। চৈত্র মাসের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের কাজ শেষ হত। ১লা বৈশাখ বকেয়া রাজস্বের হিসাব নিকাশ হত এবং জমিদারদের বাকী রাজস্বের জন্য জামিন দিতে হত। আগামী বছরের জন্য জমিদারি সনদ ঐ সময় থেকে দেওয়া শুরু হত। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য ফসলের ক্ষতি হলে ঐ সময় রাজস্বের একাংশ মকুব করার ব্যবস্থা ছিল। এই অনুষ্ঠানে দক্ষ ও নিয়মিত রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের অশ্ব ও খেলাত (জমকালো পোশাক) দিয়ে উৎসাহিত করা হত।

মুর্শিদকুলির প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি বা চরিত্র অনেকখানি রায়ত-ওয়ারি ধরনের। জমির প্রাক্তন ও বর্তমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসল, কৃষকের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে তিনি হস্তবুদ গড়ে তুলেছিলেন।

প্রায় সারা বাংলা দেশের জমি জরীপ করে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। সলিমুল্লাহ মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব বর্ণনায় এমন ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে তাঁর ব্যবস্থা ছিল মূলত রায়তওয়ারি। তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কর সংগ্রাহক হিসাবে জমিদাররা ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় মধ্যে থেকে তারা নির্দিষ্ট হারে কর সংগ্রহ করত। মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত সেদিক থেকে রায়ত, আমিল ও জমিদারদের নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।[১৩]

বাংলার কৃষি অর্থনীতির উপর মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা গভীর প্রভাব রেখেছিল। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন। এভাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য শেষ দামটি তিনি আদায় করে নিতেন। সলিমুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে মুর্শিদকুলির কঠোরতার বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন। রাজস্ব বাকী পড়লে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী—আমিল, কানুনগো, মুৎসুদ্দি এবং জমিদারদের বন্দী করে রাখা হত। দৈহিক নির্যাতন চলত। এ ব্যাপারে তিনি খানিকটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী নাজির আহমেদ ও রেজা খাঁ কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করত। উপর দিকে চাপ সৃষ্টি করার ফলে জমিদাররাও কঠোরভাবে তাদের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করতেন এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কর্তৃপক্ষ লিখছেনঃ 'টাকার জন্য মুর্শিদকুলি দেশটাকে ছিঁড়ে টুকরো করছে।'[১৪] দ্বিতীয়ত, মুর্শিদকুলি একখাতে ( ওয়াজাসাৎ খাসনোবিশী ) ২,৫৮,৮৫৭ টাকার বাড়তি ভূমি-রাজস্ব আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। এছাড়া সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাংলা থেকে সোনার মোহর যেত। এজন্যও তিনি রায়তদের কাছ থেকে কর নিতেন। সাধারণত খালসা জমিতে আবওয়াব ধার্য হত এবং মুর্শিদকুলির সময় ধার্য আবওয়াবের অংকটাও তেমন বিশাল নয়। তার বাড়তি ভূমিকরের দৃষ্টান্ত বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে শুভ হয়নি। মুর্শিদকুলির উত্তরসূরীরা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে অনেকদূর এগিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, মুর্শিদকুলি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ব্যয় সংকোচের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এতে কর সংগ্রাহকগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে একবার অভিযোগ গিয়েছিল 'ইজারাদাররা দরিদ্র প্রজা ও কৃষকদের উপর অত্যাচার করে। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে চাষ ক্ষতি-গ্রস্ত হবে এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের সর্বনাশ।' সম্রাটের জিজ্ঞাসার উত্তরে মুর্শিদকুলি

১৩। আবদুল করিম, ঐ, পৃঃ ৮৩।
১৪। আবদুল করিম, ঐ, পৃঃ ৮২।

জানিয়েছিলেন যে রাজস্বের জামিন হিসাবে তিনি কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে খত (security bonds) নিয়েছেন; কৃষকদের সুবিধার্থে এবং পূর্ববর্তী দেওয়ান কিফায়েত খানের (Kifayat Khan) ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি ইজারাদারদের দেয় রাজস্ব বিভিন্ন সময়ে আংশিক ভাবে (periodical instalments) জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সম্রাট তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর অত্যাচার হত না।. চতুর্থত, মুর্শিদকুলি শুধু নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করতেন। সমস্ত রকম বেআইনি কর রহিত করেছিলেন। আগের সুবাদারদের বেআইনি ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল। পঞ্চমত, রাজস্ব বিভাগে মুর্শিদকুলি শুধু বাঙ্গালী হিন্দুদের নিয়োগ করতেন। সলিমুল্লাহ্ লিখেছেন মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীরা সরকারি অর্থ তছরুপ করত এবং তাদের কাছ থেকে ঐ অর্থ উদ্ধার করা সহজ হত না। বাঙ্গালী হিন্দুরা শান্ত, নিরীহ ও ভীরু। তাদের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা অর্থ সহজেই উদ্ধার করা সম্ভব হত। মুর্শিদকুলির কর্তৃত্বের উপর এদের কাছ থেকে আঘাত আসার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁর সময় থেকে বাংলার রাজস্ব বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দুদের চাকরি একচেটিয়া হয়ে দাঁড়ায়।

সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক জীবনে মুর্শিদকুলির শাসনকালের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান হল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার অবসান এবং শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সাধারণভাবে সারাদেশের আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। চন্দননগরের ফরাসি বণিকরা আজিমুশশানের শাসনকালে (১৭০০-১৭০৬) আর্থিক সন্ত্রাস ও জবরদস্তি টাকা আদায় করার ঘটনা উল্লেখ করে লিখছেন: 'প্রদেশে জনবসতি কমছে, রুপো দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এবং বাণিজ্য চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।' মুর্শিদকুলির সময় থেকে আর্থিক সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার যুগের অবসান হল। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে বাংলার নবাবরা এ ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন। ইংরাজ শাসকরা এ ব্যবস্থা সামান্য পরিবর্তনসহ চালু রেখেছিল। তাঁর আসল জমা (original assessed rent), হস্তবুদ (rent roll) চাক্‌লা (পরবর্তীকালে জেলা সদর), পরগনা বা মহাল সবই টিকে ছিল। তৃতীয়ত, মুর্শিদকুলি কঠোরভাবে খালসা রাজস্ব আদায় করে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব (imperial tribute) এককোটি টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন। তাঁর সময় হুণ্ডির মাধ্যমে এ টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল না। সিক্কাটাকায় সম্রাটের রাজস্ব পাঠানোর ফলে বাংলার বাজারে টাকার যোগান কম হত; স্থানীয় বাজারে জিনিসপত্রের দাম খুব কম থাকত। সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ

বাজারে চালের দাম দেখেছিলেন টাকায় ৪-৫ মণ। সলিমুল্লাহ্ জানাচ্ছেন এর ঠিক নব্বই বছর পরে মুর্শিদকুলির সময় মুর্শিদাবাদে চালের দাম টাকায় ৪ মণ। বাণিজ্য ও উৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও বাজারে টাকার যোগান কম থাকায় জিনিসের দাম বাড়তে পারেনি। অন্তর্বর্তীকালে চাষ বেড়েছে অথচ কৃষকদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়নি; পুঁজি গড়ে ওঠেনি কারণ তাদের উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তারা টাকা যোগাড় করতে পারেনি। নবাব কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করেছেন। কৃষক ও কারিগরের উদ্বৃত্ত উৎপাদন রাজকোষে জমা হয়েছে। জেমস্ গ্রান্টের হিসাব অনুযায়ী মুর্শিদকুলি মোট এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। দিল্লীতে রাজস্ব হিসাবে পাঠিয়েছিলেন পঁচিশ কোটি টাকা। আর বাংলার মানুষ ক্ষেতে ও তাঁতে শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক সম্পদ গড়ে তুলতে পারেনি। যদুনাথ সরকারের মন্তব্য হল দুর্দিনে এরা সঞ্চয়ের অভাবে মেষপালের মত শুধু দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত। চতুর্থত, মুর্শিদকুলির শাসনকাল থেকে বাংলার আর্থিক জীবনে নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। প্রাদেশিক শাসন কাঠামোর দুই প্রধান সুবাদার ও দেওয়ান উভয়েই বাংলাকে শোষণ করতেন। যদুনাথ সরকার এদেরকে জনগণের রক্ত শোষক দু দল জোঁক বলে অভিহিত করেছেন। অস্থায়ী সুবাদার বাংলা ছাড়ার আগে দ্রুত টাকা জমানোর চেষ্টা করতেন।[১৫] অনুগত দেওয়ান তারপর সরকারের প্রাপ্য শেষ পয়সাটিও আদায় করে নিতেন। মুর্শিদকুলি প্রায়-স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করায় তাঁর সময় থেকে নবাব একাধারে সুবাদার ও দেওয়ান। এখন থেকে বাংলার কর্তা একজন যিনি বেআইনি কর সংগ্রহ বন্ধ করেছিলেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পূর্বর্তী সুবাদার-দের শাসনকালের সঙ্গে তুলনায় মুর্শিদকুলির শাসনকাল অবশ্যই 'an illustrious era of financc' হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। তাঁর সময় থেকে বাংলার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির সূচনা হয়েছিল। পঞ্চমত, মুর্শিদকুলির সময় ত্রিপুরা, কুচবিহার, জয়ন্তিয়া ও কাছাড় বাংলার করদ রাজ্য। বাংলার অনুন্নত, বিশেষত বন্য, জঙ্গলাকীর্ণ (যেমন ময়মনসিংহ), অঞ্চলে তিনি জমিদারি বন্দোবস্ত দিয়ে বসতি স্থাপন এবং চাষবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ময়মনসিংহের শ্রীকৃষ্ণ হালদার এবং মুক্তাগাছার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী ঐ অঞ্চলে চাষ, রাস্তাঘাট, বাজার ও লোক বসতি-স্থাপন করে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। ষষ্ঠত, মুর্শিদকুলি স্থানীয় বাজারের উপর নজর রাখতেন। বাজারের ওজন ও জিনিসপত্রের দামের ক্ষেত্রে তিনি সরকারি কর্মচারী মারফৎ তদারকি ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। ওজন কম দিলে, ক্রেতাদের

১৫। যদুনাথ সরকার সম্পাঃ, ঐ, অধ্যায় একুশ। শায়েস্তা খাঁ ১৮ বছরে ৯ কোটি, খানজাহান বাহাদুর ১ বছরে দু'কোটি, এবং আজিমুশ্শানের ৯ বছরে ৮ কোটি টাকা জমানোর হিসাব আছে।

ঠকালে বা বেশি দাম নিলে তিনি ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি দিতেন। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে একবার অল্পকালের জন্য খাদ্য শস্যের কিছুটা ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। মুর্শিদকুলি খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করে এবং মজুদ শস্য উদ্ধার করে কঠোরভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করেছিলেন। ফলে খাদ্যাভাব স্থায়ী হতে পারেনি।

২

সুজাউদ্দিন থেকে (১৭২৭-৩৯) ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫) পর্যন্ত বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে যা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তার উৎস হল গোলাম হোসেনের 'সিয়ার মুতাক্ষরীণ' (১৭৮২), জেমস্ গ্রান্টের 'এ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল' (১৭৮৬) এবং জন শোরের 'মিনিটস-গুলি' (১৭৮৯)।[১৬] এ পর্বের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ ভূমি রাজস্বের বিভাজন—এ পর্বের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকে চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। (১) মূল ভূমি-রাজস্ব—আসল জমা বা আসল জমা তুমার (২) বাড়তি ভূমি-রাজস্ব বা সুবাদারি আবওয়াব, (৩) ভূমি-রাজস্ব আদায় পদ্ধতি বা রাষ্ট্র-জমিদার সম্পর্ক এবং (৪) জমিদার-রায়ত সম্পর্ক। রাজা টোডরমলের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত (১৫৮২) থেকে বাংলার ভূমি-রাজস্বের মূল কাঠামোটি ঠিক হয়ে যায়। মূল ভূমি-রাজস্ব আসল জমা দু'ভাগে বিভক্ত—খালসা ও জাগির। খালসা জমির রাজস্ব সম্রাটের প্রাপ্য আর জাগির জমির রাজস্ব উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, প্রশাসন, সামরিক বিভাগ এবং জনহিতকর কাজের জন্য নির্দিষ্ট হত। সুজাউদ্দিনের শাসনকালে বাংলার মূল ভূমি-রাজস্ব বাড়ানো হয়নি। তাঁর সময় ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে যে ভূমি বন্দোবস্ত হয় তাতে বাংলার মোট ভূমি-রাজস্ব ধার্য হয়েছিল এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকা। এর মধ্যে এক কোটি নয় লক্ষ আঠার হাজার চুরাশি টাকা খালসা খাতে ধার্য রাজস্ব এবং তেত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশো সাতাত্তর টাকা জাগির জমির উপর ধার্য রাজস্ব। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার জাগির জমি তের ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পণ্ডিতদের ধারণা এ বিভাগ মুর্শিদকুলির সময়েই চালু হয়েছিল।[১৭] এ তেরটি বিভাগ হলঃ (১) জাগির-ই-সরকার-ই-আলা (নিজামতের অর্থাৎ নবাবের খরচ নির্বাহ করার জাগির)

১৬। জে. গ্রান্ট, 'এ্যান হিস্টোরিক্যাল এ্যাণ্ড কম্পারেটিভ এ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল', ফিফথ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৪। অব জন শোর, মিনিট, ১৮জুন ১৭৮৯, ফিফথ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১ ; ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৮৯, ঐ, পৃঃ ৪৭৮ ; ২১ ডিসেম্বর, ১৭৮৯, ঐ, পৃঃ ৫১৮।

১৭। এ. সি. ব্যানার্জী, দি এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব বেঙ্গল, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৪।

এখাতে রাজস্বের পরিমাণ হল ১০,৭০,৪৬৫ টাকা; (২) জাগির-ই-বান্দা-ই-আলি দারগাহ্ (দেওয়ানের জাগির), রাজস্বের পরিমাণ ১,৪৬,২৫০ টাকা; (৩) জাগির-ই-আমীর-উল উমরা, বক্সী (সামরিক বাহিনীর জাগির), রাজস্বের পরিমাণ ২,২৫,০০০ টাকা; (৪) উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমে সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ফৌজদারদের জাগির—জাগির ফৌজদারান, রাজস্বের পরিমাণ ৪,৯২,৮০০ টাকা; (৫) জাগির মনসবদারান বা ছোট মনসবদারদের (শ্রীহট্ট, ঢাকা, হিজলী, রাজমহল) জন্য জাগির, রাজস্বের পরিমাণ ১,১০,৮৫২ টাকা; (৬) উত্তর পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে জমিদারদের জাগির—জাগির জমিনদারান (ত্রিপুরা, মুচবা, সুসাং, তেলিয়াগাড়ি), রাজস্বের পরিমাণ ৪৯,৭৫০ টাকা; (৭) জাগির মাদাদিমাস (ধর্মজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য নিষ্কর ভূমি), রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৬৬৫ টাকা; (৮) জাগির সালিয়ানাদারান (জমিদারদের দেয় বার্ষিক সাহায্য), রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৯২৭ টাকা; (৯) জাগির আলটুমঘা (কৃতীরাজপুরুষ ও পণ্ডিতদের জন্য জাগির), রাজস্বের পরিমাণ ২,১২৭ টাকা; (১০) জাগির রুজিনাদারান (একজন মোল্লার জন্য বার্ষিক আর্থিক সাহায্য), রাজস্বের পরিমাণ ৩৩৭ টাকা; (১১) জাগির নবারা (নৌবহরের জাগির), রাজস্বের পরিমাণ ৭,৭৮,৯৫৪ টাকা; (১২) জাগির আমলা-ই আসম (পূর্ব সীমান্তরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর জাগির), রাজস্বের পরিমাণ ৩,৫৯,১৮০ টাকা; (১৩) জাগির খেদা আফিয়াল (ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে হাতি ধরার খরচ), রাজস্বের পরিমাণ ৪০,১০১ টাকা। এই জাগিরগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) ফৌজদারি ও দেওয়ানি প্রশাসনের জন্য জাগির (১,২,৮,১৩), (২) নৌবহর ও সামরিক বাহিনীর জন্য জাগির (৩,৪,৫,৬,১১,১২) এবং (৩) জনহিতকর কাজের জন্য জাগির (৭, ৯, ১০)। জেমস্ গ্রান্ট এই জাগিরগুলিকে অন্যভাবে ভাগ করেছেনঃ (১) নিজামত (১০,৭০,৪৬৫ টাকা), (২) দেওয়ানি (১০,৭৮,৭৭৭ টাকা) এবং (৩) নৌবহর ও সামরিক বাহিনী (১১,৭৮,২৩৫ টাকা)। মোট তিনখাতে জাগির রাজস্বের পরিমাণ হল ৩৩,২৭.৪৭৭ টাকা।[১৮]

আলিবর্দি থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণ পর্যন্ত আসল জমা খাতে ভূমি-রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি। মীরজাফর থেকে মীরকাশিমের (১৭৫৭-১৭৬৩) সময়কালে বাংলার ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল। মীরজাফর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগনার জমিদারি দান করলেন। ১৭৬০-এ মীরকাশিম কোম্পানিকে দিলেন আরো তিনটি

১৮। জে. গ্রান্ট, ঐ, ফিফ্থ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

জেলা—বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম।[১৯] অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলার *ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় পাশাপাশি দুটি ধারা চালু হল*—বাংলার নবাবদের অধীনে দেওয়ানি অঞ্চল (dewani lands) এবং কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থায় সমর্পিত অঞ্চল (ceded lands)। আলিবর্দি থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত বাংলাদেশে সুজাউদ্দিন প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্ত এবং ধার্য রাজস্ব চালু ছিল। তবে চারটি জেলা কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ায় মীরকাশিমের সময় আসল জমা খাতে মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ালো ১,৩৮,৩২,৩৭০ টাকা। সুজাউদ্দিন দিল্লীতে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাতেন। তিনি বারো বছরে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা[২০] এ খাতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সময় জগৎশেঠদের দিল্লী শাখার উপর হুণ্ডির মাধ্যমে এ টাকা পাঠানো হত; সে জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রাসরবরাহের উপর দিল্লীর রাজস্ব কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি। আলিবর্দি সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌কে এককালীন কিছু টাকা ও উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সময় থেকে দেওয়ানি পর্যন্ত বাংলা থেকে দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্ব—এ পর্বের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাড়তি ভূমিকর স্থাপন। এই বাড়তি ভূমি-রাজস্ব সুবাদারি আবওয়াব (abwab) নামে পরিচিত। মুর্শিদকুলি থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত বাংলার সুবাদাররা সম্রাটের বিনাঅনুমতিতে ভূমি-রাজস্বের উপর আনুপাতিক হারে নতুন কর ধার্য করেছিলেন। এ কর প্রথমে এবং সাধারণভাবে খালসা জমিতে ধার্য করা হত। তবে মীরকাশিম জাগির জমির কতকাংশে এ কর ধার্য করেছিলেন। এ খাতে সংগৃহীত রাজস্ব সুবাদাররা ভোগ করতেন—সম্রাটরা পেতেন না। মুর্শিদকুলি মাত্র একখাতে (ওয়াজাসাৎ খাসনোবিশী) ২,৫৮,৮৫৭ টাকার আবওয়াব বসিয়েছিলেন। সুজাউদ্দিন অনেকগুলি প্রাসাদ, সরকারি অফিস, বাগানবাড়ি, মস্‌জিদ ইত্যাদি বানিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর সময়ে প্রতিরক্ষা খরচ অনেকগুণ বেড়েছিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় পঁচিশ হাজারে, যার অর্ধেক পদাতিক আর অর্ধেক অশ্বারোহী। সুজাউদ্দিনের ধারণা হয়েছিল প্রজারা করভারে পীড়িত নয় এবং তার শাসনাধীনে প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। তাই তিনি মোট চার খাতে ১৯,১৪,০৯৫ টাকার আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। এ চারটি খাত হল: (১) নজ-

১৯। এন. কে. সিংহ, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪-২৫। কোম্পানির পাওনা টাকা, সেনাবাহিনী ও যুদ্ধের খরচ বাবদ এ জেলাগুলি হস্তান্তরিত হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার আজিমুশশানের কাছ থেকে কোম্পানি কলকাতার জমিদারি লাভ করেছিল।

২০। জে. গ্রান্টের হিসাব মত ১৯,৩১,৪০,৩৩৮-১৪-৮ পয়সা। ফিফ্‌থ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।

রানা মোকরারি (আসলে জমিদাররা নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করতেন, যেমন কিছু খাজনা মকুব, আমিলদের তদারকি বন্ধ ইত্যাদি, তার বিনিময়ে দেয় কর; অবশ্য প্রকাশ্যে দিল্লীতে সম্রাটের রাজস্ব পাঠানোর খরচ)—এ খাতে মোট আয় ৬,৪৮,০৪০ টাকা; (২) জার মাথোট [নজর পুনিয়া, বাহা-ই-খিল (খেলাতের খরচ), পুস্তাবন্দি (মুর্শিদাবাদের কাছে বাঁধের খরচ) এবং রসুম নাজারাত (মফঃস্বল থেকে রাজস্ব আনার জন্য (হেড পিওনের খরচ)]—মোট আয় ১,৫২,৭৮৬ টাকা; (৩) মাথোট ফিলখানা (নাজিম ও দেওয়ানের হাতির খরচ)—মোট আয় ৩,২২,৬৩১ টাকা; (৪) ফৌজদারি আবওয়াব (সীমান্তের ফৌজদারি জেলাগুলির উপর ধার্য কর)—মোট আয় ৭,৯০,৬৩৮ টাকা।

আলিবর্দি ক্ষমতা দখলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এগারো বছর ধরে (১৭৪২-১৭৫১) মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ এবং মাঝখানে আফগান বিদ্রোহ দমনের জন্য (১৭৪৫ ও ১৭৪৮) তাঁকে আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। মারাঠা আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তিনি রাজস্ব পেতেন না। আসল জমা খাতে আদায়ও কম হত। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে বাড়তি রাজস্বের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মোট চার খাতে আলিবর্দি ২২,২৫,৫৫৪ টাকার সুবাদারি আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। ঐ চারটি খাত হল: (১) চৌথ মারাঠা—১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে নাগপুরের মারাঠা অধিপতি রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে চুক্তিমত আলিবর্দি বাংলার রাজস্ব থেকে তাঁকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।[২১] তাছাড়া উড়িষ্যা তাঁর হাতছাড়া হওয়াতে আর্থিক ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি এ কর ধার্য করেন। এখাতে রাজস্বের পরিমাণ হল ১৫,৩১,৮১৭ টাকা; (২) আহুক ইত্যাদি—শ্রীহট্ট থেকে সরকারি প্রয়োজনে চুণ কেনা এবং আনার খরচ; রাজস্বের পরিমাণ ১,৮৪,১৪০ টাকা; (৩) কিমত খেস্ত গৌড়—গৌড় থেকে ইট, পাথর ইত্যাদি আনার খরচ; রাজস্বের পরিমাণ ৮০০০ টাকা; (৪) নজরানা মনসুরগঞ্জ—সিরাজের প্রাসাদ হীরাঝিলের কাছে মনসুরগঞ্জ বাজারের উপর স্থাপিত কর; রাজস্বের পরিমাণ ৫,০১,৫৯৭ টাকা।

মীরকাশিম চারখাতে মোট ৭৪,৮১,৩৪০ টাকার আবওয়াব বসিয়েছিলেন। (১) কৈফিয়ৎ হস্তবুদ—বীরভূম ও দিনাজপুরে রাজস্ব বিভাগ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে হস্তবুদ নতুন করে তৈরি করে বাড়তি রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল। এখাতে মোট আবওয়াবের পরিমাণ ১৪,৭২,৫৯৯ টাকা। (২) বিভিন্ন মদ্রায় সরকারি রাজস্ব জমা দেওয়া চলত; তবে তাদের সিক্কায় রূপান্তরিত করার জন্য বাট্টা দিতে

২১। কে. কে. দত্ত, আলিবর্দি এ্যাণ্ড হিজ টাইমস্, পৃঃ ৯১।

হত। প্রতি টাকায় দেড় আনা বাট্টা নেওয়া হত বলে এ করের নাম 'সার্ফ সিক্কা ওয়ান হাফ আনা'। এখাতে মোট আয় ৪,৫৩,৪৪৮ টাকা। (৩) কৈফিয়ৎ ফৌজদারান--ফৌজদারদের শাসনাধীন পূর্ণিয়া, রংপুর, রাজমহল অঞ্চলে গোপন ও বেআইনিভাবে বর্ধিত রাজস্বের উপর আবওয়াব ; মোট আয় ৩৬,৭৪,২৩৯ টাকা। (৪) তৌফির জাগিরদারান—বাংলার প্রধান প্রধান জাগিরের উপর ( নিজামাত, দেওয়ান, বক্‌সী এবং পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর জাগির ) ধার্য আবওয়াব, মোট আয় ১৮,৮১,০১৪ টাকা। মুর্শিদকুলি থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত বাংলার মোট ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকার আবওয়াব ধার্য করা হয়েছিল।[২২]

প্রাক্‌ দেওয়ানি পর্বে বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল জমিদারদের উপর (agency of collection)। সরকারের পক্ষে জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত আমিল শ্রেণীর কর্মচারী এবং খালসা বিভাগের মুৎসুদ্দিরা (agency for supervision)। কানুনগো দপ্তর ছিল ভূসম্পত্তির হিসাবরক্ষক। দু'জন সদর কানুনগো, নায়েব কানুনগো এবং তাদের অধীনস্থ কানুনগোরা বাংলার সমস্ত জমি, উৎপন্ন ফসল, জমির মালিকানা, রাজস্ব, ভূমি হস্তান্তর প্রভৃতি যাবতীয় তথ্যের হিসাব রাখত। রাজস্ব নির্ধারণে, নতুন বন্দোবস্তে বা অন্যান্য প্রয়োজনে কানুনগো 'রেজিস্ট্রার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্' হিসাবে কাজ করত।[২৩]

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ রাষ্ট্র-জমিদার সম্পর্ক—এসময়কার বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল রাষ্ট্রের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক। 'জমিদার হল পরগনা বা চাকলার অধিকারী বংশানুক্রমিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাজস্ব প্রদানকারী। আর কানুনগো অফিসে এমন নথিবদ্ধ অঞ্চলই জমিদারি'[২৪] বলে চিহ্নিত। 'একজন জমিদার বা তালুকদারের কাজ হল তার অধীনস্থ রায়তকে রক্ষা করা, পালন করা এবং কৃষি কাজে উৎসাহ দেওয়া। প্রয়োজনে তাকাবি ঋণ দেওয়া, অভিযোগ দূর করা, বিপন্ন হলে কর মকুব করা বা অন্যভাবে সাহায্য করা; সামগ্রিকভাবে রায়তের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকা। জমিদার বা তালুকদারের প্রতি রায়তের কর্তব্য হল তার জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা, নিয়মিতভাবে রাজস্ব দেওয়া এবং জমিদার যদি আর্থিক বা অন্য কোনোভাবে বিপন্ন হন তাহলে তাকে উদ্ধার করা।'[২৫] এ যুগে গ্রাম বাংলার শান্তি রক্ষার দায়িত্বও

২২। জে. গ্রান্ট, ঐ, ফিফ্‌থ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১।
২৩। আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম, স্টাডিজ ইন দি ল্যান্ড রেভেন্যু হিস্ট্রি অব বেংগল, ১৭৬৯-১৭৮৭, পৃঃ ১৬২।
২৪। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।
২৫। ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

জমিদারদের। জমিদাররা রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে আদায়ীকৃত অর্থের এক দশমাংশ ভোগ করতেন; সায়ের বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের অধিকার তাদের ছিল। তদুপরি কিছু নিষ্কর সম্পত্তি নানকর, বনকর, জলকর ইত্যাদি তাদের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নির্দিষ্ট থাকত।

হুগলীর দেওয়ান কৃপারাম সিংহের সাক্ষ্য (১৭৭৬) থেকে জানা যায় বাংলার নবাবরা বাকী খাজনার দায়ে জমিদারদের উৎখাত করতেন না।[২৬] খাজনা বাকী পড়লে প্রথমে দৈহিক নির্যাতন করে আদায় করার চেষ্টা হত। এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে নবাবরা অফিসার পাঠিয়ে জমিদারির রাজস্বের হিসাব পরীক্ষা করতেন এবং পরীক্ষায় যদি দেখা যেত যে সত্যিই কম রাজস্ব আদায় হয়েছে সেক্ষেত্রে জমিদারদের দেয় রাজস্বের খানিকটা সাময়িকভাবে মকুব করা হত। পরে আস্তে আস্তে পূর্ব হারে রাজস্ব ধার্য করা হত। স্থায়ীভাবে রাজস্ব মকুব করা হত না। অনেক সময় সরকারি অফিসাররা বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি ক্রোক (attachment) করে নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করে নিতেন। সরকারি রাজস্ব শোধ হলে জমিদার জমিদারি ফিরে পেতেন। বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি বিক্রি করে সরকারি প্রাপ্য মেটানোর নিয়ম ছিল না। মাত্র দুটি কারণে জমিদাররা জমিদারি হারাতেন —চোর ডাকাতদের আশ্রয়দান এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

'সিয়ার' রচয়িতা জানিয়েছেন সুজাউদ্দিন জমিদারদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করেছিলেন।[২৭] তিনি মুর্শিদকুলির সময়কার বন্দী জমিদারদের বিনাশর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর যেসব জমিদারের কাছে সরকারের টাকা পাওনা ছিল তাদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুজাউদ্দিন জমিদারদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন। জন শোরও তাঁর মিনিটে সুজাউদ্দিন কর্তৃক জমিদারদের জমিদারি ফেরত দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যে সমস্ত জমিদারিতে খাজনা বাকী পড়েছিল সেখানে আমিলদের পাঠিয়ে তিনি গত দশ বছরের রাজস্বের হিসাব নিকাশ করে নতুন হস্তবুদ তৈরী করেছিলেন।

জন শোরের মতে আলিবর্দির সময়ে বাংলার জমিদারদের অবস্থা সাধারণভাবে স্বচ্ছল ছিল বলা চলে।[২৮] এর দুটি কারণ হল রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্বের হার ছিল সহনীয় ও মাঝারি (moderate) ধরনের; আর জমিদাররা যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করতেন। জমিদাররা কৃষিকাজে উৎসাহ দিতেন এবং দুর্দশাক্লিষ্ট রায়তরা সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারলে অনাবশ্যক চাপ দিতেন

২৬। ঐ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪।
২৭। গোলাম হোসেন, সিয়ার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-৮০।

না। বরং নিজেরা মহাজন ও ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে টাকা ধার করে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব জমা দিতেন। আলিবর্দ্দিকে দীর্ঘকাল মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হয়েছিল এবং ঐ সময় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল। ফলে সরকারের প্রাপ্য ধার্য রাজস্ব আদায় হয়নি। গঙ্গার পশ্চিম পারের জমিদাররা ঐ সময় অনেকে খাজনা দিতে পারেননি। গ্রান্টের হিসাব মত আলিবর্দ্দি সব খাত মিলিয়ে বার্ষিক আশি লক্ষ টাকার বেশী রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না। ফলে তাঁকে গঙ্গার পূর্বতীরের রাজশাহী, দিনাজপুর, নদীয়ার জমিদারদের উপর অস্থায়ী জবরদস্তি কর ( temporary exactions ) বসাতে হয়। এর সঠিক পরিমাণ জানা যায় না। তবে গ্রান্টের মতে এটা বেশ মোটা টাকা ( a large sum )। গোলাম হোসেন লিখেছেন 'আলিবর্দ্দির সময়ে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে ন্যায্য কর আদায় করতেন এবং জমিদারিগুলিতে ভাল চাষবাস বজায় রেখেছিলেন। সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব জমা দিয়ে তাঁরা বেশ মর্যাদার সঙ্গে জীবন কাটাতেন।'[২৯]

মীরকাশিম দ্রুত যথাসম্ভব বেশী রাজস্ব আদায়ের দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাঁর আর্থিক দাবীর চাপে বাংলার জমিদাররা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই নন, তাঁদের অনেকেই লোপ পান। তাঁর ধারণা রায়তদের দেওয়া ভূমি-রাজস্বের সবটাই সরকারের প্রাপ্য; জমিদারদের এতে কোনো অংশ নেই। গোলাম হোসেন ও জন শোর উভয়েই একমত যে তাঁর সময়ে জমিদাররা চরম অসুবিধায় পড়েন এবং মীরকাশিম রায়তদের শেষ কর্পদকটুকুও আত্মসাৎ করতে তৎপর হন। তাঁর বড়ো রকমের চাহিদা মেটাতে জমিদাররা রায়তদের কাঁধে করের বোঝা ( rack-renting ) চাপাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমিল, জমিদার ও রায়তরাও গোপনতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল। ফলে মীরকাশিমের তৎপরতা সত্ত্বেও ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯,৯৪,০৬৫ টাকার ভূমি রাজস্ব বাকী পড়েছিল।[৩০]

নবাবী যুগের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা বাংলার রায়তদের উপর অবশ্যই বাড়তি করের চাপ সৃষ্টি করেছিল। মুর্শিদকুলি থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত বাংলার নবাবরা মোট ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকার বাড়তি ভূমি-রাজস্ব বা সুবাদারি আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। এ টাকার সবটাই নবাবরা ভোগ করতেন। আসল জমার সঙ্গে আনুপাতিক হারে এ কর ধার্য হয়। জমিদাররা আবার ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে আনুপাতিক হারে রায়তদের কাঁধে এ কর চাপিয়েছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবওয়াব রাজস্ব বেড়েছিল ( ১৬৫৮ খ্রীঃ বন্দোবস্তের উপর ) ৩৩ শতাংশ; আর রায়তদের দেয়

২৯। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪।
৩০। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২

রাজস্ব বেড়েছিল ৫০ শতাংশ হারে। মীরকাশিমের ধার্য আবওয়াব রায়তদের দেয় রাজস্ব বাড়িয়েছিল ৮০ শতাংশ। জন শোরের মিনিটসে এ বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাঁর মতে আলিবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা, চাষ আবাদ ও বাণিজ্য বেড়েছিল এবং 'the resources of the country were, at that period, adequate to the measure of exaction'। সুবাদারি আবওয়াব রায়তদের কাছে বোঝাস্বরূপ (burthensome) মনে হয়নি। কিন্তু মীরকাশিমের এ ধরনের ভূমিকর প্রথা কাঠামোগতভাবে জমিদার ও রায়ত উভয়ের কাছেই ক্ষতিকর। 'এ রকম করের প্রত্যক্ষ প্রবণতা জমিদারকে বল প্রয়োগে অধিকতর রাজস্ব আদায়ের দিকে ঠেলে দেওয়া এবং সকলের জন্যে প্রবঞ্চনা, গোপনতা ও দুর্দশার সৃষ্টি করা'।[৩১] গোলাম হোসেনের মতে মীরকাশিম শুধু জমিদারদের নয় রায়তদের সম্পদও লুঠ করেছিলেন। জন শোরের মতে মীরকাশিম কোনো কোনো ক্ষেত্রে রায়তদেরকে প্রাণধারণের জন্য সামান্যতম সম্পদ এবং পারিশ্রমিক পর্যন্ত রাখতে দেননি।[৩২] জমির উৎপাদনের সবটাই তিনি গ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। এজন্যই ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর শাসনকালকে নিয়মিত শাসন না বলে লুঠের ব্যবস্থা (a regular pillage (rather) than a system of government) বলে অভিহিত করেছেন।[৩৩]

## সারণী

### মুর্শিদকুলি থেকে দেওয়ানি পর্যন্ত বাংলার ভূমি-রাজস্ব (১৭০০-১৭৬৫)

| বৎসর | রাজস্বের পরিমাণ সিক্কা টাকায় | বৎসর | রাজস্বের পরিমাণ সিক্কা টাকায় |
|---|---|---|---|
| ১৭০০ | ১,১৭,২৮,৫৪১ | ১৭০৮ | ১,২৬,৭৬,৮৫৩ |
| ১৭০১ | ১,২০,৪৯,৯৮৯ | ১৭০৯ | ১,২৬,৭৯,৫৭১ |
| ১৭০২ | ১,২৪,৭৯,২৫১ | ১৭১০ | ১.২৬,৭৮,৭২৪ |
| ১৭০৩ | ১,২৫,৪১,০১৮ | ১৭১১ | ১,৩৪,০০,১৭৫ |
| ১৭০৪ | ১,২৬,৫৫,৫৬৯ | ১৭১২ | ১,৩৪,২৬,৯৩৮ |
| ১৭০৫ | ১,২৬,৬৯,০৬৯ | ১৭১৩ | ১,৩৫,৭০,০৮৭ |
| ১৭০৭ | ১,২৬,৭৬,৬৪৭ | ১৭১৪ | ১,৩৫,৭১,৫১৭ |

৩১। জন শোর, মিনিটস, ১৮ জুন ১৭৮৯, ফিফ্থ রিপোর্ট' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২।
৩২। জন শোর, ঐ, পৃঃ ১২।
৩৩। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯।

| বৎসর | রাজস্বের পরিমাণ সিক্কা টাকায় | বৎসর | রাজস্বের পরিমাণ সিক্কা টাকায় |
|---|---|---|---|
| ১৭১৫ | ১,৩৮,৭৯,৫৪৮ | ১৭২২ | ১,৪২,৮৮,১৮৬ |
| ১৭১৬ | ১,৩৯,৩৯,৪০১ | ১৭২৮ | ১,৪২,৪৫,৫৬১ |
| ১৭১৭ | ১,৪০,২৭,৭৯৫ | ১৭৪০-১৭৫৭ | ১,৪২,৪৫,৫৬১ |
| ১৭১৮ | ১,৪০,২৯,৮৬৯ | ১৭৬২-৬৩ | ২,৪১,১৮,৯১২ |
| ১৭১৯ | ১,৪০,৩০,৩৫৩ | ১৭৬৩-৬৪ | ১,৭৭,০৪,৭৬৬ |
| ১৭২০ | ১,৪০,৯১,৩২৬ | ১৭৬৪-৬৫ | ১,৭৬,৯৭,৬৭৮ |
| ১৭২১ | ১,৪১,০৯,১৯৪ | ১৭৬৫-৬৬ | ১,৬০,২৯,০১১ |

দ্রঃ—ক. এন. কে. সিংহ, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩। খ. ফারমিংগার সম্পাঃ, জন শোর-এর মিনিটস্ঃ ফিফ্‌থ রিপোর্ট, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৬ ; ঐ, ২য়, খন্ড, পৃঃ ১৮ ও ১২০।

# ২

# ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব

## দেওয়ানি থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৬৫-১৭৯৩)

### ১

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ থেকে (১৭৬৫)[১] দশ শালা বন্দোবস্ত পর্যন্ত (১৭৯০) বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত দ্বৈত শাসন পর্বে আমিলদারি ও সুপারভাইজরি ব্যবস্থা।

(২) ১৭৭২ থেকে ১৭৭৭ পর্যন্ত ইজারাদার ও জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্বের বন্দোবস্ত (five year farming system)।

(৩) ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত জমিদার ও ইজারাদারদের সঙ্গে বার্ষিক ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত (yearly farming system)।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ, কর সংগ্রহ পদ্ধতি, ভূমি-রাজস্বের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ১৭৯০এ পরীক্ষা পর্বের অবসান। কোম্পানি ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত। বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে এ পর্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিভিন্ন কারণে[২] দ্বৈতশাসন পর্বে কোম্পানি সরাসরি দেওয়ানি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারেনি। মুর্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট দেওয়ানি বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করার অধিকার পান। তাঁর অধীনে নায়েব দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁকে দেওয়ানি বিভাগের কাজকর্ম—রাজস্ব বন্দোবস্ত ও সংগ্রহ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়। বিহারে সীতাব রায় নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কোম্পানির রেসিডেন্ট রাজস্ব সম্পর্কে কলকাতার গভর্ণর ও সিলেক্ট কমিটির কাছে দায়ী রইলেন। রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগীদের হাতে থাকে তদারকি (supervision)। আর রেজা খাঁ ও তাঁর আমিলদের হাতে থাকে

১। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়েছিলেন (এলাহাবাদ চুক্তি, ১২ আগষ্ট ১৭৬৫)।

২। কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলার ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, কর্মচারীদের সংখ্যাল্পতা, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কে জটিলতার ভয় ইত্যাদি।

প্রশাসন (agency)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রেসিডেন্টের হাতে ছিল চব্বিশটি দেওয়ানি জেলা। ন্যস্ত জেলাগুলি (কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম) আগের মত সিলেক্ট কমিটির[৩] হাতে থেকে গেল। ১৭৬৫ খ্রীঃ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত মোহাম্মদ রেজা খাঁ ও তাঁর অধীনস্থ আমিলরা বাংলাদেশে যে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন তা মূলত আমিলদারি ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

দ্বৈত শাসন পর্বের আমিলদারি ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

(১) সমস্ত জেলাতে আমিলদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হত। প্রতি বছর রেজা খাঁ তাদের নিযুক্ত করতেন। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় তাদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থাও ছিল।

(২) রেজা খাঁ আমিলদের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে চুক্তি করতেন। কেননা নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের উপরই তাঁর ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল। আমিলরাও জেলাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জমিদারদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের বাৎসরিক চুক্তি করতেন। যে জমিদার বেশী রাজস্ব দিতে রাজী হত সেই জমিদারকে স্বাভাবিক কারণে তাঁরা অগ্রাধিকার দিতেন। অর্থাৎ আমিলদারি ব্যবস্থায় জমিদাররা প্রায় ইজারাদারে পরিণত হলেন। আমিলদারি ব্যবস্থার শেষদিকে সর্বোচ্চ রাজস্ব দাতাকে জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হত।

(৩) আমিলরা ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও অনেক প্রকার কর আদায় করতে শুরু করলেন।

(৪) আমিলদের জমি ও রায়ত জমির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে এঁরা দ্রুত অর্থ সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, আর এঁদের উপর কোনো প্রকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অবাধ লুন্ঠন এঁদের কাছে সহজ হয়েছিল। হ্যারি ভেরেলস্টের মতে পরিশ্রমী রায়তদের শোষণ করে এঁরা ধনী হয়েছিল। নিজেদের সহযোগী চৌধুরী ও গোমস্তাদের এঁরা নিজেরা নিয়োগ করত। বস্তুত মীরকাশিমের উচ্চ ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তকে সামনে রেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট ঐ পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করলেন। ফলে সমস্ত পরিকল্পনাটি ধ্বংসাত্মক এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক রূপ নিল।[৪]

বাংলার জনজীবনে ও অর্থনীতিতে আমিলদারি ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হল মারাত্মক। প্রথমত—ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে ও সংগ্রহে অভূতপূর্ব শঠতা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা

৩। অর্থ, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য গভর্ণর ও অন্য দু তিন জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি।

৪। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

দেখা দিল আর সেই সঙ্গে রায়তদের উপর চললো অকথ্য অত্যাচার। বাংলার প্রধান আয়ের উৎস কৃষি উৎপাদন শুকিয়ে যেতে শুরু করল। দ্বিতীয়ত—অযৌক্তিক ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের অন্যতম ফল হল অনাদায়। ধার্য রাজস্বের এক বড় অংশ অনাদায়ী থেকে গেল। বহু টাকার রাজস্বের অনাদায়ীর কথা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটিও স্বীকার করেছে। পরের বছর নভেম্বর মাসে ডিরেক্টর সভা জানালেন দিনাজপুর, হুগলী ও পূর্ণিয়া জেলার বহু অঞ্চলে বহু টাকার ভূমি-রাজস্ব বাকী পড়ে আছে। ১৭৬৯ সনে রাজশাহী, ঢাকা, বীরভূম ও রাজমহলে বেশ কিছু টাকার ভূমি-রাজস্ব মকুব করা হয়েছিল।[৫] তৃতীয়ত—আমিলদারি ব্যবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধিকল্পে নিষ্কর জমির কিছু অংশ খাসে আনায় দেশের মানুষের দুর্দশা বেড়ে গেল। এ রকম জমির মালিক বা রায়তরা জমিদার, আমিল ও সরকারের দাবী মেটাতে নিজেদের অস্থাবর সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু এবং পুত্র কন্যা এক কথায় যথাসর্বস্ব বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। অনেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। এই ঘটনার সত্যতা রেজা খাঁ ও সীতাব রায়ও স্বীকার করেছেন।[৬] মুর্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট রিচার্ড বীচারের অভিমত হল কোম্পানির শাসনে এ দেশের রায়তদের দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমিলদের ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে গভর্নর হ্যারি ভেরেল্স্ট (Verelst) কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীদের জেলায় জেলায় সুপারভাইজর (supervisor) হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা রেসিডেন্টের অধীনে জেলাতে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করবেন। সুপার-ভাইজরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পশ্চাতে কোম্পানির আরো একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। স্বদেশে ও এদেশে কোম্পানির পরিচালকের ধারণা জন্মেছিল এদেশীয় প্রশাসন (agency) কোম্পানিকে তার ন্যায্য পাওনা ভূমি-রাজস্ব থেকে কৌশলে বঞ্চিত করছে। তাঁদের ধারণা বাংলার সংগৃহীত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ আরো বেশি। এ অবস্থায় সিলেক্ট কমিটির সম্মতিতে প্রতি জেলায় সুপারভাইজর নিয়োগ শুরু হয় এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা ঐ পদে আসীন ছিলেন।

**সুপারভাইজরদের কাজ হল:** (ক) জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—প্রাক্তন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবরণী লিপিবদ্ধ করা। (খ) সরজমিনে তদন্ত করে জেলার অবস্থা, উৎপন্ন ফসল ও জমির সম্ভাব্য রাজস্ব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা বা একটি সঠিক ও সম্পূর্ণ হস্তবুদ তৈরি করা। (গ) রায়তদের সম্পর্কে বিস্তৃত খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাদের জমি ও দেয় রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করা।

৫। নন্দলাল চ্যাটার্জী, ভেরেলেস্টস রুল ইন ইণ্ডিয়া, পৃ: ২১২-২২৫।
৬। আবদুল মাজিদ খাঁ, দি ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল, ১৭৫৬-১৭৭৫, পৃ, ২১৮।

(ঘ) জেলার সমস্ত রকম কর, প্রতিটি করের প্রকৃতি ও বিবরণ এবং জমিদারদের সংগৃহীত রাজস্বের বিবরণ তৈরি করা। (ঙ) শুধু রিপোর্ট তৈরি করা নয়, যেখানে প্রয়োজন সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়। (চ) সুপারভাইজরদের অপর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল বেআইনি জমি উদ্ধার। (ছ) রায়তদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং চাষবাসে উৎসাহ দেওয়াও সুপারভাইজরদের কাজ। (জ) যদিও মূলত কোম্পানির রাজস্ব বাড়ানো এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সুপারভাইজরদের নিয়োগ করা হয়েছিল তবুও এ ব্যবস্থার অন্য উদ্দেশ্য হল আমিলদার, জমিদার ও তালুকদারদের গোপন, দুর্নীতিমূলক ও বেআইনি কাজ কর্ম বন্ধ করে রায়তদের রক্ষা করা। এই পরিকল্পনার স্রষ্টা গভর্ণর ভেরেলস্টের বিশ্বাস ছিল দুর্নীতির দমন এবং সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা ও চাষবাস বাড়লে কোম্পানির রাজস্ব বাড়বে। এবং বাড়তি ভূমি-রাজস্ব ধার্য করার প্রয়োজন হবে না।

ভেরেলস্ট ধরে নিয়েছিলেন কোম্পানির কর্মচারীরা সৎ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও পরিশ্রমী। তাঁর বিস্তৃত নির্দেশ অনুযায়ী কালেক্টরগণ কাজ করে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হল না। দুর্নীতি রোধকল্পে প্রতি দুবছর অন্তর তাঁদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসাও নিষিদ্ধ হল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁদের পদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল কালেক্টর। পরের বছর এপ্রিল মাসে ডিরেক্টর সভার নির্দেশে জেলা থেকে কালেক্টরদের প্রত্যাহার করা হল। সুপারভাইজরি ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং মন্বন্তর-পরবর্তী কালের অস্বাভাবিক অবস্থা তাঁদের ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। দুর্ভিক্ষের আগে ও পরে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল।

(খ) কোম্পানির নির্দেশমত প্রত্যেক কালেক্টরকে একাধারে কালেক্টর, বিচারক, তথ্য সংগ্রাহক, বণিকের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে এত বেশি কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করা সম্ভব ছিল না। হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং সেই সঙ্গে অনেক কাজ। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায় এঁরা হলেন জেলাগুলির সর্বময় কর্তা ( sovereigns of their districts )।

(গ) প্রয়োজনের তুলনায় সুপারভাইজরদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ফলে সর্বত্র তাঁদের পক্ষে নজর দেওয়া ও খবরদারি করা সম্ভব ছিল না। অনেক অঞ্চলই কোম্পানির অধঃস্তন কর্মচারীদের শোষণ ও পীড়নের শিকার হয়। সারা বাংলা ও বিহারের জন্যে মাত্র ষোলজন সুপারভাইজর ছিলেন। এঁদের বেশির

ভাগই কোম্পানির জুনিয়র কর্মচারী, অনভিজ্ঞ এবং বয়সে তরুণ।[৭]

(ঘ) এক বছর পর সুপারভাইজরদের প্রাপ্য ভাতা এক হাজার টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছিল দেড়শ টাকা। ফলে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ব্যবসায় (private trade) শুরু করেছিলেন। এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তারা তাঁদের এই কাজের মাধ্যম ছিল। সুপারভাইজররা নামেমাত্র প্রভু হলেন আর আসল প্রভু হলেন তাঁদের গোমস্তা ও বেনিয়ানরা (lords of supervisorships)। সুপারভাইজরদের নানারকম দুর্নীতি, অপকর্ম ও ব্যর্থতার জন্যে এঁরা অনেকখানি দায়ী।

(ঙ) জমিদার, ইজারাদার, আমিল, কানুনগো প্রভৃতি ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অসহযোগিতা সুপারভাইজরদের ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এঁদের মনে হয়েছিল সুপারভাইজরদের অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের ফলে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

ইংরাজ সুপারভাইজর নিয়োগের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হলেও এর ভাল দিকটা হল (ক) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে তাঁদের দ্বারা প্রথম ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ও মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ। এগুলি ছাড়া পরবর্তীকালে কোম্পানির পক্ষে ভূমি ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হত না। (খ) এঁদের কাজের ফলে বার্ষিক ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত বাঞ্ছনীয় নয় বলে কোম্পানির ধারণা হয়েছিল।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালানার জন্য মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় এবং ১৭৭১-এ কলকাতায় তিনটি পৃথক 'কন্ট্রোলিং কমিটি অব রেভেন্যু' স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট ও সিলেক্ট কমিটির অধীনে ভূমি ও রাজস্ব পরিচালনার দায়িত্ব এদের উপর অর্পিত হয়। ১৭৭১-এর ২৯শে আগষ্ট কোম্পানির ডিরেক্টর সভা দেওয়ানি বিভাগ পরিচালনার (to stand forth as Duan) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘোষিত হল। পরের বছর গভর্ণর ও কাউন্সিলের চার জন সদস্য নিয়ে 'কমিটি অব সার্কিট' (committee of circuit) গঠিত হল। এরা নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভার পেলেন। ১৭৭২-এ কলকাতায় গভর্ণর ও কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হল 'কন্ট্রোলিং কমিটি অব রেভেন্যু' বা রেভেন্যু বোর্ড। খালসা বা রাজস্ব বিভাগ কলকাতায় আনা হল। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে রেভেন্যু বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাংলা ও বিহারকে ছটি (কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও বর্ধমান) প্রাদেশিক কাউন্সিলে ভাগ করে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল।

৭। ওয়ারেন হেস্টিংস সুপারভাইজরদের 'বালক' বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁদের অনভিজ্ঞতা লক্ষ্য করেছিলেন। এদের কাজের গড় অভিজ্ঞতা হল পাঁচ থেকে দশ বছর। দ্রঃ আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম, ঐ, পৃঃ ১০।

এবং ইংরাজ কালেক্টরের পরিবর্তে এদেশীয় দেওয়ান ও আমিলরা রাজস্ব-বন্দোবস্ত ও সংগ্রহে নিযুক্ত হয়।

**পাঁচশালা বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৭৭)** ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার ভূমি-রাজস্বের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে ১৭৭২ খ্রীঃ মে মাসে পাঁচ বছরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ কর দাতাকে ইজারা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইজারাদারদের সঙ্গে সর্বোচ্চহারে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রথা কোম্পানির অধীনে ন্যস্ত জেলাগুলিতে আগেই চালু ছিল। তবে তার মেয়াদ এক থেকে তিন বছরের ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ও অন্য চারজন সদস্য[৮] নিয়ে গঠিত 'সার্কিট কমিটি' জেলায় জেলায় ঘুরে নিলামে সর্বোচ্চ করদাতার সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য নতুন ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত গড়ে তুললেন। কমিটি প্রথমে নদীয়াতে যে ব্যবস্থা করলেন সেটাকে 'মডেল' হিসাবে গণ্য করে সারা দেশে চালু করা হল। হেস্টিংস প্রবর্তিত পাঁচশালা ব্যবস্থার (১৭৭২-১৭৭৭) বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) সরকার জমিদার, ইজারাদার বা তালুকদার সকলকেই অস্থায়ী ইজারাদার হিসাবে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচ বছরের লিজ (আমিলনামা) দিলেন। এঁরা নিজ নিজ এলাকায় পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত হারে রাজস্ব দেওয়ার শর্তে খাজনা আদায়ের অধিকার পেলেন।

(২) সরকার নিলামের আগেই হস্তবুদ তৈরি করে রাজস্বের পরিমাণ, রায়তদের দেয় রাজস্ব, আবওয়াব ইত্যাদি নথিবদ্ধ করেছিল। ইজারাদাররা শুধু নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করার ভার পেল। সরকারি আমিলনামায় রায়তদের অধিকার স্বীকার করে তাদের পাট্টা দেওয়ার নির্দেশ ছিল।

(৩) কোনো রকম নতুন কর ধার্য করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। বর্তমান কোন কর আপত্তিকর ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে কালেক্টর তা বাতিল করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন।

৪। ইজারাদারদের কাছ থেকে রাজস্বের জামিন নিয়ে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাদের কৃষিঋণ দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ইজারাদার দেয় কাজকর্ম তদারকি করার জন্য মুহরার নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়।

৫। কালেক্টরদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, নজর ও সালামি নেওয়া এবং তাদের বেনিয়ানদের সুদের কারবার নিষিদ্ধ হয়েছিল।

৬। নতুন ভূমি বন্দোবস্তে জমিদারদের শুল্ক আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত হয়।

৮। এঁরা হলেন স্যামুয়েল মিডলটন, জেমস্ লরেন্স, জন গ্রাহাম ও ফিলিপ মিলনার ড্যাক্রিস।

সার্কিট কমিটির পাঁচশালা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

(১) প্রকৃত আয় নির্ধারণ : হেস্টিংসের ধারণা হয়েছিল জমিদার ও কানুনগোদের যোগসাজসের জন্যে কোম্পানির পক্ষে বাংলার ভূমি-রাজস্বের স্বরূপ ও সঠিক পরিমাণ কখনো জানা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় নিলামে চড়িয়ে জমির প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা সহজ। অন্যথায় কোম্পানিকে বিস্তৃতভাবে জমি জরীপ করে হস্তবুদ তৈরি করা কিন্তু তা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ।

(২) নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ও পরে বাংলার অনেক জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। কোম্পানির আর্থিক স্বার্থে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত আদায়ের জন্যে নতুন বানিয়া শ্রেণীকে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়া হেস্টিংসের কোন বিকল্প ছিল না।

(৩) ইংরাজ কালেক্টরদের বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ।

(৪) রায়তদের কাছ থেকে ন্যায্য কর আদায় এবং ভূস্বামীদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করা।

(৫) দুর্নীতির উৎসগুলি বন্ধ করা এবং সরকারি পর্যবেক্ষণে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।[৯]

পাঁচশালা বন্দোবস্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি : এ ব্যবস্থায় প্রধান অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) সরকারের রাজস্ব দাবী মাত্রাতিরিক্তভাবে ( over assessment ) ধার্য করা হয়েছিল। ১৭৭২ সনে পাঁচশালা বন্দোবস্তে নদীয়ার রাজস্ব ধার্য করা হল ১০,৬৪,৫৩০ টাকা অথচ আগের বছর ঐ জেলার রাজস্ব ছিল ৭,৩৬,৮৯৯ টাকা। রাজশাহীর রাজস্ব অনেকখানি বাড়িয়ে করা হল ২২,২৭,৮১৭ টাকা। অন্যান্য জেলা-তেও অনুরূপ ভাবে উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল।

(২) হেস্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্তে ইজারাদার, বেনিয়ান ও মহাজন অনেকেই জমিদারি ইজারা নিলেন। হুজুরি মল ও মদন দত্ত নামে কলকাতার দুজন বণিক পূর্ণিয়া জেলার ভূমি-রাজস্বের ইজারা নিয়েছিলেন। বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে এঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বণিক মনোবৃত্তি নিয়ে লাভের আশাতে এঁরা ভূমি-রাজস্বের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অনেকে জমিদারদের প্রতি বিরাগবশত জমিদারি ইজারা নিয়েছিল।[১০] কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেনিয়ানরা অনেকে বেনামে অনেক জমিদারি ইজারা নিয়েছিলেন। হেস্টিংসের

৯। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, পৃঃ ১৪৪।
১০। আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম, ঐ, পৃঃ ৩০।

বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী ১৩,৩৩,৬৬৪ টাকার ভূমি-রাজস্বের ইজারা নিয়েছিলেন। তাছাড়া ইজারা বন্দোবস্তের সময় সার্কিট কমিটির সদস্যরা দরবার খরচ নামে প্রচুর টাকার উৎকোচ নিয়েছিলেন।[১১]

(৩) এর ফল হল মারাত্মক। রায়তদের অধিকার ও দেয় রাজস্ব নির্ধারণ করে পাট্টা দেওয়া হল না। ইজারাদাররা জবরদস্তি করে রাজস্ব আদায় করলেন। টাকার অভাবে ইজারাদারদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মুহরার নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। আর যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মাসিক বেতন মাত্র কুড়ি টাকা হওয়াতে তারাও অসাধুতার আশ্রয় নিতে শুরু করেন।

(৪) পাঁচশালা বন্দোবস্তে সরকারের অনেক টাকার রাজস্ব অনাদায়ী রয়ে গেল। অনেক টাকার রাজস্ব শেষ পর্যন্ত মকুব করতে হল। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির কর্মচারীদের বেনিয়ানরা উপকৃত হলেন ; মকুব করা রাজস্বের অনেকখানি তারাই আত্মসাৎ করলেন। ইজারাদাররা উৎকোচ নিয়ে এবং নিজেদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে রায়তদের কম টাকায় ভূমি-রাজস্বের রসিদ দিলেন। ফলে রাজস্ব ব্যবস্থায় জটিলতা দেখা দিল। পরবর্তী কালে নতুন ইজারাদারদের এতে অসুবিধায় পড়তে হয় এবং কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয়।

(৫) বাংলার জমিদাররা বহুকাল ধরে গ্রাম বাংলায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন। ছোটখাট বিচার, শান্তিরক্ষা, চোর ডাকাত দমন করা তাঁদের কাজ ছিল। পাঁচশালা ব্যবস্থায় ইজারাদারদের এ ক্ষমতা না থাকায় গ্রাম বাংলায় চুরি, ডাকাতি ও অশান্তি অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।

(৬) কালেক্টরের বেনিয়ানরা যথারীতি সুদের ও মহাজনী কারবার চালিয়ে গেলেন। ইংরাজদের প্রাদেশিক কাউন্সিল এবং এদেশীয় দেওয়ানদের মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মনোভাব না থাকায় এ পরিকল্পনা সার্থক হতে পারল না।

(৭) ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন ইজারাদাররা রায়তদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে রাজস্ব আদায় করায় পরবর্তীকালে কোম্পানির রাজস্বের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: 'যে সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা সে সরকার অন্যের জবরদস্তিমূলক কর আদায় থেকে রায়তকে রক্ষা করতে পারে না।'[১২] বস্তুত পাঁচশালা বন্দোবস্তকে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা রূপে গণ্য করা যায়।

**হেস্টিংস-বারওয়েল পরিকল্পনা :** ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল গভর্ণর-

১১। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২।
১২। ফিলিপ ফ্রান্সিস, মিনিট, ৫ নভেম্বর ১৭৭৬।

জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধু বারওয়েল ডিরেক্টর সভার কাছে বাংলার ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কিত এক পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। হেস্টিংস-বারওয়েল পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হল ঃ

(১) দীর্ঘমেয়াদী ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত। এক বা দু পুরুষ যাবৎ ভূমি বন্দোবস্ত স্থায়ী করার প্রস্তাব ছিল। কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্মচারীরা দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন। পি. এম. ড্যাক্রিস ও জি. জি. ডুকারেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তুলেছিলেন।[১৩]

(২) এ পরিকল্পনার অপর বৈশিষ্ট্য করসংগ্রাহক রূপে জমিদারদের অগ্রাধিকার দান। হেস্টিংস ও বারওয়েল করসংগ্রাহক হিসাবে বড় বড় জমিদারদের পছন্দ করেননি। এঁরা সরকারের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি করেন। তাঁদের পছন্দ হল মাঝারি ও ছোট জমিদার। এঁদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহে অসুবিধা ও খরচ দুইই কম। তাঁরা যোগ্য, দক্ষ ও সৎ জমিদারকে জমি ইজারা দিতে চেয়েছিলেন।

(৩) জমিদারদের জমিদারি সরকারি রাজস্বের যথেষ্ট মূল্যবান জামিন। অন্য কোনো জামিনের প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি।

(৪) রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও জমিদার ও ইজারাদারদের ফৌজদারি কাজকর্ম বা শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব ছিল।

**ফ্রান্সিস পরিকল্পনা ঃ** হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) বাংলার ভূমি-রাজস্বের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের পরিবর্তে কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হওয়া উচিত। সরকারের প্রয়োজন জেনে নিয়ে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ চিরস্থায়ী করা হোক। (২) জমিদাররা জমির মালিক। তাদের সঙ্গেই সরকারের স্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্ত করা উচিত। (৩) বিস্তৃত হস্তবুদ তৈরির পরিবর্তে আগের তিন বছরের প্রদত্ত রাজস্বের গড় ভূমি-রাজস্বের হার হিসাবে মেনে নেওয়া। (৪) জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা এবং চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী এ সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ। (৫) প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিরোধিতা। এগুলি গ্রাম থেকে দূরে থাকায়

১৩। আর. বি. রামসবোথাম, ঐ, পৃঃ ৭১। এই দুজন অফিসার প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব দেন। লেখকের মতে ফিলিপ ফ্রান্সিস এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে প্রচার চালান।

রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। তিনি সুপারভাইজরদের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ কালেক্টররা আবার জেলায় ফিরে এসেছিলেন।

ফ্রান্সিস পরিকল্পনার দুটি প্রস্তাব বেশ আপত্তিকর। প্রথমতঃ ফ্রান্সিস সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও স্থায়ী করার প্রস্তাব দেন। সরকারের প্রয়োজন সব সময় ক্রমবর্ধমান এবং যুগে যুগে সরকারি প্রয়োজনের ধারণা পাল্টায়। সুতরাং সরকারি প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও স্থায়ীকরণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। দ্বিতীয়ত, জমিদার ও রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তিনি চেয়েছিলেন চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠুক। ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্বের ক্ষেত্রে এ প্রস্তাব গৃহীত হলে দুর্বল পক্ষ অর্থাৎ রায়তরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

**আমিনি কমিশন :** ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান কার্য চালানোর জন্য তিনজন সদস্যবিশিষ্ট আমিনি কমিশন[১৪] গঠন করেন। কমিশনকে নিম্নলিখিত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল :

(ক) বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ ; (খ) ইজারাদারদের হিসাব পরীক্ষা ; (গ) রায়তদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের স্বার্থরক্ষামূলক ব্যবস্থার সুপারিশ ; (ঘ) নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থার সুপারিশ।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ আমিনি কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। (১) বিভিন্ন ধরনের জমিদার ( জমিদার, চৌধুরী, তালুকদার ) এবং ভূমি-বন্দোবস্তের উল্লেখ ছিল (২) বংশানুক্রমিক ও অস্থায়ী করসংগ্রাহক এবং তাঁদের কর সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। (৩) উদাহরণ স্বরূপ একটি জেলার বিস্তৃত হিসাব-নিকাশ, কর্মপদ্ধতি এবং পরস্পর নির্ভরতা তুলে ধরা হয়েছিল। (৪) প্রশাসনিক দক্ষতার অবক্ষয়, রায়তদের উপর অত্যাচার এবং সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার ঘটনা প্রকাশ করা হয়। (৫) জমিদারদের নিষ্কর সম্পত্তির দিকে বিশেষ নজর রাখার সুপারিশ ছিল। (৬) দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থা তদারকি এবং রাজস্ব নির্ধারণে কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়েছিল।[১৫]

১৪। এই তিনজন সদস্য হলেন ডি. এ্যাণ্ডারসন, চার্লস্ ক্রফটস্ ও জর্জ বগল। দ্রঃ আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম, ঐ, পৃঃ ৯৯-১৩০।

১৫। আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম, ঐ, পৃঃ ৯৬-৯৭।

লণ্ডনের ডিরেক্টর সভা বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের পরিকল্পনা সমর্থন করলেন না। প্রথমত, তাঁরা জমিদারদের সঙ্গে সহনীয় ও মাঝারি ধরনের ( moderate assessment ) রাজস্ব বন্দোবস্তে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা বার্ষিক ভূমি-বন্দোবস্তের পক্ষে ( annual settlement ) রায় দিলেন। তৃতীয়ত, তাঁরা জমি নিলামে তুলে ইজারাদারদের ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়ার পদ্ধতি সমর্থন করেননি। ফলে ১৭৭৭-এ বাংলা দেশে বার্ষিক বন্দোবস্ত ( yearly farming system ) নামে এক নতুন ধরনের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা ( ১৭৭৭-১৭৮৯ ) চালু হল।

বার্ষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল : (ক) নতুন ভূমি-বন্দোবস্তে জমিদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হল, (খ) গত তিনবছরের রাজস্বের গড় নতুন বন্দোবস্তে আসল জমা ( standard assessment ) হিসাবে ধার্য করা হয়েছিল। (গ) জমিদার রায়তদের অধিকার ও রাজস্ব নিরূপণ করে পাট্টা দেবেন। (ঘ) কোনো ইউরোপীয় বা তাঁদের বেনিয়ান রাজস্বের ইজারা নিতে পারবেন না। (ঙ) জমিদাররা মুচলেকা (লিখিত প্রতিশ্রুতি) দেবেন যে তাঁরা শুধু নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করবেন। (চ) প্রতিবছর নতুন করে ভূমি-বন্দোবস্তের লিজ ( lease ) দেওয়া হবে। তবে জমিদাররা যদি নিয়মিত রাজস্ব দেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো অভিযোগ না থাকে তাহলে পরের বছর তাঁরাই আবার বন্দোবস্ত পাবেন। (ছ) সরকারি রাজস্বের জন্য জমিদারদের কোনো জামিন রাখার প্রয়োজন নেই। (জ) বাঁধ দেওয়া ও রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে জমিদার ও ইজারাদারদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। (ঝ) জমিদার বা ইজারাদার কোনো নিষ্কর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবেন না বা নতুন কোনো নিষ্কর ভূমিস্বত্ব দান করবেন না। (ঞ) আগের জমিদারদের মত তাঁরা চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবেন এবং পথঘাট নিরাপদ রাখবেন। (ট) জমিদার নিয়মিত রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর জমিদারির একাংশ বিক্রি করে সরকারের পাওনা পরিশোধ করা হবে; আর ইজারাদার ব্যর্থ হলে তাঁর ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সরকারি পাওনা মেটানো হবে।

বার্ষিক ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত এদেশের কৃষি-অর্থনীতির উপর কতকগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (১) সর্বোচ্চ হারে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ও আদায়ের কোম্পানি আমলের ধারা বার্ষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় অব্যাহত থাকে। (২) জমিদারদের পাশাপাশি ইজারাদাররা রইলেন। ইজারাদাররা মুনাফা-শিকারী, ফাটকাবাজ বণিকছাড়া আর কেউ নন সেহেতু রায়তদের উপর নানা অজুহাতে বাড়তি রাজস্ব চাপানোর মানসিক প্রবণতা তাঁদের থেকে গেল। (৩) বার্ষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল

বাংলার কৃষি। এর প্রসার ও উন্নতি সরকারি উৎসাহ ও আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে স্থিতিশীল (stagnant) অবস্থায় রয়ে গেল।[১৬] (৪) অস্থায়ী বার্ষিক ব্যবস্থায় কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত জমিদার পরিবারগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল। দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের জমিদার, ইজারাদার ও রায়তরা সম্মিলিত ভাবে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ করেছিল (১৭৮৩)। সরকারকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করতে হয়। (৫) ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুসরণ করে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি ভেঙে দিয়ে কলকাতায় একটি 'কমিটি অব রেভেন্যু' স্থাপন করলেন। কোম্পানির চারজন সিনিয়র কর্মচারী নিয়ে এ কমিটি গঠিত হল। ঠিক হল গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী এরা কাজ করবেন। জেলায় জেলায় আবার ইংরাজ কালেক্টর পাঠানো হল তবে তাঁদের কাজের পরিমাণ ও দায়িত্ব অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া হল। কলকাতায় কমিটি অব রেভেন্যু সারা বাংলা ও বিহারে ভূমি-বন্দোবস্ত ও রাজস্বের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করল। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে কমিটি অব রেভেন্যু তুলে দিয়ে বোর্ড অব রেভেন্যু স্থাপিত হল। ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে এই বোর্ড প্রশাসনিক অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের (sanction and control) অধিকারী হয়। তবে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুসৃত হওয়ায় সরকারের হাতে ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কে তথ্য অনেক কমে গেল।[১৭]

## ২

# চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

জেমস্ মিলের মতে ফিলিপ ফ্রান্সিসই বাংলা দেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রকৃত সংগঠক (Francis may with justice be described as the original promoter of the Permanent Settlement of Bengal)।[১৮] আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম এ মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে এ দেশে কোম্পানির বেশ কয়েকজন কর্মচারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে মত প্রকাশ

১৬। ডব্লিউ. কে. ফারমিংগার, 'হিস্টোরিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন', ফিফথ্ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮।

১৭। জন শোরের মন্তব্য। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭।

১৮। জেমস্ মিল, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২।

করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাও তাঁর 'হিস্ট্রি অব হিন্দুস্থান'-এ (১৭৭২) এবং হেনরি পাত্তুলো তাঁর 'এ্যান এসে অন দি কাল্টিভেশন অব দি ল্যাণ্ডস্ এ্যাণ্ড ইমপ্রুভমেন্টস্ অব দি রেভেন্যুস অব বেঙ্গল' (১৭৭২) গ্রন্থে বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ডাও মনে করেছিলেন রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কৃষির উন্নতি ঘটবে এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে। বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য মার্ক্যান্টাইলিস্ট (mercantilist) ডাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছিলেন। অপরদিকে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) পাত্তুলো প্রাকৃতিক সম্পদকে আয়ের প্রধান উৎস ধরে নিয়ে জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল এর ফলে বাংলার কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার ঘটবে। কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারীদের মধ্যে পি. এম. ড্যাক্রিস (P. M. Dacres), জি. জি. ডুকারেল (G. G. Ducarel) ও টমাস ল (Thomas Law) ভূমি-রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তুলেছিলেন। কর্ণওয়ালিশ টমাস ল-কে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেছেন।[১৯] তিনি বিহারে কালেক্টর থাকাকালীন কয়েকটি পরগনায় মোকরারি বা স্থায়ী রাজস্ব-বন্দোবস্ত গড়ে তুলেছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে জোর প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারের ফলেই ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠেছিল। ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত মিনিটের (২২শে জানুয়ারী, ১৭৭৬) প্রভাব ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনেতাদের ভূমি ও রাজস্ব বন্দোবস্ত চিন্তায় নিঃসন্দেহে ছাপ ফেলেছিল। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহলে জোর প্রচারকার্য চালিয়ে ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট এবং বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হেনরি ডান্ডাস তাঁর মিনিটে অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে আকারে বাংলাদেশে চালু করা হয় তাতে ফ্রান্সিস পরিকল্পনার অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।[২০] তাঁর পরিকল্পনায় দুটি অংশ—জমিদাররা জমির মালিক এবং তাদের সঙ্গেই স্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত হওয়া উচিত—গৃহীত হয়েছিল। আর সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

হিতবাদী দর্শনের প্রবক্তা জেমস্ মিল বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য

১৯। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৮। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাবক আলেকজান্ডার ডাও, হেনরি পাত্তুলো, টমাস ল, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও কর্ণওয়ালিশের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে রণজিৎ গুহর 'এ রুল অব প্রপার্টি ফর বেঙ্গল' গ্রন্থে।

২০। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশ দেখুন।

কর্ণওয়ালিশের অভিজাততান্ত্রিক সংস্কারকে ( aristocratic prejudices ) দায়ী করেছেন। উইলিয়ম উইলসন হান্টার অন্যমত পোষণ করেছেন। ১২ সেপ্টেম্বর ১৭৮৬-তে কর্ণওয়ালিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন। তার আগেই ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে পিটের ইণ্ডিয়া আইন (১৭৮৪) পাশ হয়েছে। ঐ আইনে মধ্যপন্থা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে ( principles of moderation and justice ) জমিদার বা ভূস্বামীদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়মরীতি ( permanent rules ) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এই সূত্র ধরে বিলাতের ডিরেক্টর সভা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তাদের ঐতিহাসিক ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত পাঠিয়েছিলেন। ওতে ইজারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফ্রান্সিসের যুক্তিগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে স্থায়ীভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের নির্দেশ ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষে পদার্পণের আগেই বিলাতের কর্তৃপক্ষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কর্ণওয়ালিশ ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন মাত্র।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের ডিরেক্টর সভা কর্তৃক গৃহীত বাংলার ঐতিহাসিক ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ (১) স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ভিত্তিতে ভূমি ও রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলা। (২) জমিদারদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত করা উচিত। কারণ তাঁদের জমিতে বংশানুক্রমিক অধিকার (hereditary rights) আছে। (৩) ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত সহনীয় রকমের ( moderate ) হওয়া দরকার যাতে জমিদারদের নিরাপত্তা ও কৃষকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয়। (৪) নিয়মিত ও সময়মত ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। আদায়ের মাধ্যম হিসাবে বাংলার জমিদার শ্রেণী সবচেয়ে উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত। তাঁদের আশ্বস্ত করার জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ (ক) ভবিষ্যতে তাঁদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো হবে না। (খ) তাঁদের জমিদারি ভোগ করার বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত। ডিরেক্টর সভার নির্দেশগুলিতে বাংলাদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' রূপরেখাটি পরিষ্কার পাওয়া যায়। কিন্তু তা কার্যকরী করা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়।

**বিতর্কঃ** ভারতে গভর্ণর জেনারেল রূপে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রথম তিন বছর ( ১৭৮৬-১৭৮৯ ) বাংলার ভূমি ও রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রশ্নে কোম্পানির প্রশাসনের উপর মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানির প্রধান সেরিস্তাদার জেমস্ গ্রান্ট, বোর্ড অব রেভেন্যুর প্রেসিডেন্ট জন শোর এবং গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং। দীর্ঘ মেয়াদী এই বিতর্কের চারটি অংশ হল ঃ

(ক) জমির মালিকানা নিয়ে (proprietory right) গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে বিতর্ক। (খ) গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ (assessment) এবং রাজস্ব নির্ধারণে ভিত্তি বছর (base year) নিয়ে বিতর্ক। (গ) ভূমি-বন্দোবস্তের মেয়াদ (duration) নিয়ে শোর ও কর্ণওয়ালিশের মধ্যে মত পার্থক্য। (ঘ) কর সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে জমিদারদের উপযুক্ততা নিয়ে (suitability of zamindars as the agency of colleetion) শোর ও কর্ণওয়ালিশের মধ্যে বিতর্ক।

(ক) বাংলাদেশে জমির মালিকানার প্রশ্নে গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে জোর মতপার্থক্য দেখা দেয়। শোরের মতে বাংলার জমিদাররা জমির মালিক; তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারি ভোগ দখল করেন, জমিদারি দান, বিক্রি ও বন্ধক রাখার তাঁরাই অধিকারী। সুতরাং জমিতে মালিকানা স্বত্ব (proprietory right) তাঁদের। জেমস গ্রান্ট শোরের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে মুঘল ভূমি ব্যবস্থায় জমির প্রকৃত মালিক রাষ্ট্র। জমিদার রাষ্ট্রের পক্ষে কর সংগ্রাহক মাত্র। এজন্য তাঁরা কমিশন পেয়ে থাকেন। ভূমির কর সংগ্রাহক ভূমির মালিক নয়। জমির মালিকানা বিতর্কে কর্ণওয়ালিশ জন শোরের অভিমতকে গ্রহণ করলেন। বাংলার জমিদারদের জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হল।[২১] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনের দিক থেকে এরকম সিদ্ধান্ত সুবিধাজনক বলে (policy fo administrative expediency) বিবেচিত হয়েছিল। হুইগ রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী কর্ণওয়ালিশ সহজ ও সরল প্রশাসনের স্বার্থে এবং সমাজে শৃঙ্খলারক্ষার জন্যে কোনো সামাজিক শ্রেণীকে জমির মালিকানা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ভূমি-রাজস্ব চিরতরে স্থিতিশীল হলে প্রশাসনিক দায়িত্ব কমে যাবে আর বর্ণ ও শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে সহজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন।[২২]

(খ) নতুন বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ও ভিত্তি বছর কি হবে তা নিয়ে গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে বিতর্ক চললো বেশ কিছু কাল। গ্রান্ট দেওয়ানি জেলাগুলির ক্ষেত্রে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের রাজস্বের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য হল নবাবী আমলে মীরকাশিমের সময় বাংলার ভূমি-রাজস্ব সর্বাধিক বাড়ানো হয়। সুতরাং ঐ ভিত্তিতে ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত করলে কোম্পানি লাভবান হবে। ন্যস্ত জেলাগুলির ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব ছিল অন্যরকম। ঐ অঞ্চলে স্থায়ী বন্দোবস্ত করার আগে, গ্রান্টের প্রস্তাব মত, রাজস্বের হস্তবুদ তৈরী করে রাজস্বের

২১। ১৭৯৩ সনের ১নং রেগুলেশনে জমিদার জমির মালিক বলে স্বীকৃতি পেলেন।
২২। এরিক স্টোকস্, ইংলিশ ইউটিলিটেরিয়ানস্ এ্যান্ড ইণ্ডিয়া, ১৯৮২ (ভারতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৫।

হার নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে মোট জমা বাড়ানো দরকার। কারণ এখানে দেওয়ানি *জেলাগুলির তুলনায় রাজস্বের হার কম ছিল* (under rated)। শোর গ্রান্টের মতের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর অভিমত হল মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ধার্য রাজস্ব ও আদায়ীকৃত রাজস্বের মধ্যে ব্যবধান থাকত।[২৩] মুঘলরা ধার্য রাজস্ব কখনো সম্পূর্ণ আদায় করত না। অনেকখানি রাজস্ব নানা কারণে অনাদায়ী থাকত বা মকুব হয়ে যেত। তাছাড়া মীরকাশিম আসল জমার উপর ৭৪ লক্ষ টাকার বাড়তি আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। ১৭৬৫-র জমার ভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলে জমিদার ও রায়তদের উপর অস্বাভাবিক আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে। জন শোর সেই সময়কার অর্থাৎ ১৭৮৭-এর আদায়ীকৃত রাজস্বের ভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এ প্রশ্নেও কর্ণওয়ালিশ জন শোরের অভিমতকে সমর্থন করলেন। ১৭৮৮-৮৯ এবং ১৭৮৯-৯০ এই দুই আর্থিক বছরের রাজস্বের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল।

(গ) বন্দোবস্তের মেয়াদ নিয়ে (duration) অপর বিতর্কটি হল জন শোর ও কর্ণওয়ালিশের মধ্যে। শোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চূড়ান্ত ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশে ও লণ্ডনে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য হল জমিদারদের সঙ্গে কিছু কালের জন্য (for a turn of years) ভূমি-বন্দোবস্ত করা যেতে পারে তবে স্থায়ী বন্দোবস্ত কিছুতেই নয়। তাঁর আপত্তির পেছনে প্রধান যুক্তিগুলি হলঃ (ক) স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে ভবিষ্যতে লোক সংখ্যা ও চাষ বাড়লেও সরকার জমির আয় থেকে বঞ্চিত হবে। (খ) ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থাকবে। (গ) রায়তদের অধিকার, জমিদারির সীমানা, নিষ্কর সম্পত্তি, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমির হিসাব অসম্পূর্ণ। এমতাবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় নানারকম জটিলতা দেখা দেবে। ঐ প্রশ্নে কর্ণওয়ালিশ জন শোরের সঙ্গে এক মত হতে পারেননি। তার মতে গত কুড়ি বছরে (১৭৬৯-১৭৮৯) কোম্পানি বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) পরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদের জন্যে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ঐ সব জমি চাষে আনার

২৩। মুঘলদের ভূমি-রাজস্ব আসলে জমির কর নেওয়ার ক্ষমতা নির্ধারণ (valuation) না ধার্য-রাজস্ব প্রকৃতই আদায় করা হত (demand) এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে। মোরল্যাণ্ড মুঘলদের রাজস্বের হিসাবকে valuation হিসাবে গ্রহণ করেছেন। Demand বলে স্বীকার করেননি। দ্রঃ মোরল্যাণ্ডের 'এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইণ্ডিয়া'।।

জন্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত এখনই প্রয়োজন। অন্যথায় সামগ্রিকভাবে লোকসানের সম্ভাবনা বেশী। কারণ কৃষির উন্নতির উপর বাংলার আর্থিক অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(ঘ) কর্ণওয়ালিশ ও শোরের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের সংগ্রাহক হিসেবে জমিদারদের উপযুক্ততা সম্পর্কে চতুর্থ বিতর্কটি দেখা দেয়। প্রস্তাবিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদারদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মিতব্যয়ী জমিদার সরকারি অর্থের বিচক্ষণ অছি (economical landlords and prudent trustees of public interest)। জমিতে স্থায়ী অধিকার আসার পর কৃষির পুনর্গঠনে এঁরা যত্নবান হবেন। এর ফলে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় রকমের রূপান্তর ঘটবে। জন শোর জমিদারদের দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন। ১৭৮৯-এর জুন মাসে তিনি লিখছেন: 'জমিদারদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি পরিচালনায় যথার্থরূপে যোগ্য। সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁরা একাজের জন্যে যথার্থ শিক্ষা পাননি। জমিদারি পরিচালনায় সাধারণ কাজের বিভিন্ন দিক এবং পদ্ধতি সম্পর্কে এঁরা অজ্ঞ ও কাজে অমনোযোগী; এমনকি যখন তাঁদের নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনো তাঁরা জমিদারি পরিচালনার মানসিকতা বা সাহস দেখাতে পারেন না।' জন শোর তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বাংলার জমিদারদের দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে এরকম কঠোর বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

**কর্ণওয়ালিশের বক্তব্য:** বাংলার জমিদারদের সম্পর্কে কর্ণওয়ালিশের ধারণা হয়েছিল অন্য রকম। ১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মন্তব্য করছেন 'জমিদারদের বর্তমান ত্রুটির জন্যে এদেশের প্রচলিত কর সংগ্রহ পদ্ধতিই দায়ী'। অর্থাৎ এদেশের প্রচলিত ইজারা ব্যবস্থার জন্যে (farming system) জমিদারদের অদক্ষতা ও অপদার্থতা দায়ী। প্রচলিত ব্যবস্থায় সরকারি তত্ত্বাবধানে জমিদারদের নাবালক করে রাখা হয়েছে। জমিতে স্থায়ী অধিকার না থাকায় তাঁরা ধার নিতে পারেন না বা সরকারের বিনা অনুমতিতে জমিদারি বিক্রি করার অধিকার তাঁরা পাননি। ফলে তাঁরা তাঁদের বিলাস, ব্যসন ও অপদার্থতার জন্য ফলভোগ করেননি। বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকলে জমিদারদের ত্রুটিগুলিও থেকে যাবে। কর্ণওয়ালিশের প্রতিকার প্রস্তাব হল আইন করে জমিদারদের পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ফলভোগ করতে দেওয়া। সেই সঙ্গে অমিতব্যয়িতা ও অলসতার ফলও তাদের ভোগ করা উচিত। সেক্ষেত্রে হয় তাঁরা যোগ্যতা ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করে টিঁকে থাকবেন অথবা অমিতব্যয়িতা ও অপদার্থতার প্রতিফল হিসেবে জমিদারি বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। জমিদারির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুন যাঁরা আসবেন তাঁরা

চাষ আবাদ বাড়িয়ে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ফলভোগ করবেন। অপদার্থতা ও অলসতায় বংশপরম্পরায় জমিদারি ভোগ দখল কর্ণওয়ালিশের অভিপ্রেত নয়। তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় জমিদারদের দায়িত্বও অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব, ও বিচার করার অধিকার ও সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শুল্ক সংগ্রহের অধিকারও প্রত্যাহার করা হয়। কর্ণওয়ালিশ ব্যবস্থায় 'যে ব্যক্তি চাষবাস বাড়াবে, রায়তদের রক্ষা করবে ও সময় মত সরকারি রাজস্ব জমা দেবে সেই জমিদার'। কে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি জমিদারির মালিক হলেন তাতে সরকারের কিছু যায় আসে না। কর্ণওয়ালিশ চেয়েছিলেন দক্ষ, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও বিবেচক জমিদার। জন শোর কর্ণওয়ালিশের মত নতুন পরিস্থিতিতে বাংলার জমিদারদের চরিত্রগত পরিবর্তনে আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন জমিদাররা নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে কাজ করবেন না এবং কর্ণওয়ালিশ কল্পিত 'মিতব্যয়ী জমিদার ও সরকারি অর্থের বিচক্ষণ অছিও হবেন না।' এক্ষেত্রে জন শোরের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে যথার্থ শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারেনি।

**অস্থায়ী ব্যবস্থা ঃ** ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিশ জেলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি জরুরি তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। কালেক্টরদের কাছে তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল তিনটি ঃ (ক) জেলার জমা বা রাজস্বের পরিমাণ, (খ) প্রকৃত জমিদার বা ইজারাদারদের নাম যাঁদের সঙ্গে সরকার ভূমি বন্দোবস্ত করবেন, (গ) রায়তদের স্বার্থরক্ষামূলক সুপারিশ ও সেই সঙ্গে রায়তদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে জমিদারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।

কালেক্টরদের সংগৃহীত তথ্য এবং বোর্ড অব রেভেন্যুর সুপারিশসহ ভূমি-বন্দোবস্ত সম্পর্কিত কাগজপত্র সপারিষদ গভর্ণরজেনারেল ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে পেলেন। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯) বিহার এবং ১৭৯০ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্ত (ten years settlement) চালু করলেন। বাংলার জমিদার, ইজারাদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হল (for a period of ten years certain with a view to permanency). দশশালা বন্দোবস্তের সময় জমিদারদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল ডিরেক্টর সভার অনুমোদন পাওয়া গেলে দশশালা বন্দোবস্ত স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হবে। বাংলার

মোট ভূমি-রাজস্ব ধার্য হল ২,১৮,২৯,৪৫৯ টাকা; বিহারের রাজস্বসহ এর মোট পরিমাণ দাঁড়ালো ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা। ঠিক হল এর দশ শতাংশ জমিদাররা তাঁদের পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন আর নব্বই শতাংশ সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে। ফিফথ্ রিপোর্ট রচয়িতাদের মতে নতুন ভূমি-বন্দোবস্তে রাষ্ট্র পেল মোট রাজস্বের এগারো ভাগের দশ ভাগ আর এক ভাগ রইল জমিদারদের জন্য। জন শোরের হিসাব মত জমির উৎপাদনের ৪৫ শতাশ পেল রাষ্ট্র, ১৫ শতাংশ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা আর ৪০ শতাংশ রইল কৃষকদের হাতে। নতুন ব্যবস্থায় জমিদারদের অভ্যন্তরীণ শুল্ক (সায়ের) আদায়ের অধিকার ছিল না।

**বাস্তবায়ন ঃ** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে কর্ণওয়ালিশের সুপারিশসহ দশশালা বন্দোবস্তের রিপোর্ট গেল বিলাতে ডিরেক্টর সভার কাছে। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট এবং বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হেনরী ডাণ্ডাস ভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ চার্লস গ্রান্ট এবং জন শোরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ মুহূর্তেও শোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ডিরেক্টর সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করার জন্য গভর্ণর জেনারেলকে নির্দেশ পাঠালেন। পরের বছর ২২শে মার্চ (২২শে মার্চ, ১৭৯৩) গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করলেন। ঘোষণার বিষয় নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলার জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও জমির অন্যান্য মালিকদের দশশালা বন্দোবস্তের রাজস্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে চিরকাল জমিদারি ভোগ করার অধিকার স্বীকৃত হল।

২) ভবিষ্যতে খরা, বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজস্ব মকুবের আবেদন অগ্রাহ্য হবে।

৩) নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারির সমস্তটাই বা একাংশ বিক্রি করে সরকারি পাওনা মেটানো হবে বলে ঘোষিত হল। বস্তুত জমিদারের জমিদারি সরকারি রাজস্বের জামিন।

৪) ভবিষ্যতে প্রয়োজন সরকার অধীনস্থ তালুকদার, রায়ত বা কৃষকের স্বার্থ-রক্ষামূলক ও মঙ্গলকর ব্যবস্থা নিতে পারবেন। অধীনস্থ তালুকদার ও রায়তদের স্বার্থরক্ষাকল্পে কর্ণওয়ালিশ নির্দেশ দিলেন (৮নং রেগুলেশন, ১৭৯৩) যে যারা বারো বছরের অধিককাল নির্দিষ্ট হারে ভূমি-রাজস্ব দিয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে কোনো ভাবে ভূমি-রাজস্ব বাড়ানো চলবে না। অন্যদের ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্ব হার পরগনা-হার

(pargana rate) অনুযায়ী ধার্য হবে। কর্ণওয়ালিশ মনে করেছিলেন জমিদার ও রায়তের মধ্যে ঘোষিত লিজের ব্যবস্থা (scheme of declaratory leases) সরকার ও জমিদারের মধ্যে অপরিবর্তনীয় ভূমিকরের রূপ নেবে এবং কৃষকের নিরাপত্তা এনে দেবে।

৫) জমিদাররা অভ্যন্তরীণ শুল্কের আদায়ের অধিকার পাবেন না। বিচার বা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো দায়িত্বও তাঁদের থাকবে না।

৬) জমিদাররা ইচ্ছামত জমিদারি বিক্রি, বন্ধক, দান বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে কর্ণওয়ালিশের উত্থাপিত যুক্তি ঃ

১) জমিতে স্থায়ী স্বার্থ তৈরি হলে জমি ও চাষের উন্নতি হবে। পতিত ও অনাবাদী জমি চাষে আসবে। জমির আয় থেকে জমিদাররা জমিতে বাঁধ দেওয়া ও জলসেচের জন্য রিজারর্ভার (reservoir) তৈরিতে এগিয়ে যাবেন। ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়বে এবং ১৭৭০ সনের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী প্রভাব থেকে দেশ ও জনগণ মুক্তি পাবে।

২) বাংলার কৃষি ও শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কৃষির উন্নতির উপর শিল্প এবং সেই সঙ্গে দেশের আর্থিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। যদি কৃষির উন্নতি ঘটানো সম্ভব না হয় তাহলে কৃষি ও শিল্প—বাংলার সম্পদের এই দুই প্রধান উৎস—ধ্বংস হয়ে যাবে। জমিদাররা জমির মালিক হিসেবে কৃষির উন্নতিতে মনোযোগী হবেন।

৩) জমিদারি স্থায়ী সম্পত্তির মর্যাদা পেলে অনেকে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবেন। কর্ণওয়ালিশ ১৭৯০ সনের এপ্রিল মাসে ডিরেক্টর সভাকে লিখেছিলেন যে শুধু ব্যবসা ও সুদের কারবারে রত কলকাতার ধনী বণিক ও মহাজনরা অজ্ঞাতপূর্ব এই স্থায়ী সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। লাভের অংকটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারলে তাঁরা জমির দিকে আকৃষ্ট হবেন।

৪) কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন জমিদার শ্রেণী সমাজে একটি স্থিতিশীল শক্তি (stabilising force) হিসেবে কাজ করবে। গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, উৎসব প্রভৃতির ব্যবস্থা করে জমিদাররা মৃতপ্রায় গ্রাম বাংলায় আবার প্রাণের সঞ্চার করতে সক্ষম হবেন।

৫) এ সময় কোম্পানির নিয়মিত প্রচুর টাকার প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক ব্যয়, রপ্তানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ[২৪] মাদ্রাজ ও বোম্বাই

২৪। বাংলাদেশ থেকে অগ্রিম দাদন দিয়ে পণ্য কিনে ইউরোপে পাঠানোর ব্যবস্থা।

প্রেসিডেন্সির ঘাটতি মেটানো এবং কোম্পানির চীনদেশে বাণিজ্যের জন্য, মূলধনের যোগান বাংলা দেশ থেকেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে জটিলতা ও অসুবিধা দূর করার জন্যেই নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

৬) নয়া জমিদারতন্ত্র কোম্পানির সাম্রাজ্যের শক্তিশালী স্তম্ভ অর্থাৎ কোম্পানির রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে (politicalally) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বৈদেশিক আক্রমণকালে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট বাংলার জমিদার শ্রেণী বৃটিশ শাসন রক্ষায় এগিয়ে আসবে। বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বের উপর জমিদারদের ভাগ্য নির্ভরশীল। মারাঠা আফগান, শিখ ও ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার তখনো অবসান হয়নি। একটি শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠীকে কোম্পানির শাসনের সহায়ক শ্রেনীরূপে পাওয়া কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে।

৭) কোম্পানির কর্মচারীরা ভমি-রাজস্ব নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় ক্রম-বর্ধমান প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করতে পারছিল না। ভূমি-রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কোম্পানির কর্মচারীরা অন্য বিভাগের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় মনঃসংযোগ করতে পারবে। এতে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের কাজকর্মে উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে।

৮) ভূমি-রাজস্ব চিরতরে স্থায়ী বলে ঘোষণা করলে রাষ্ট্রের যে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তা সাধারণ আর্থিক উন্নতি ও বাণিজ্যিক বিকাশের ফলে পুষিয়ে যাবে। ভূমি-রাজস্ব খাতে ক্ষতি বাণিজ্যিক শুল্ক ও অন্যান্য কর স্থাপন করে নেওয়া সম্ভব বলে কর্ণওয়ালিশ মনে করেছিলেন।

**ত্রুটি ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিম্নলিখিত ত্রুটি ধরা পড়ে।

প্রথমত, রাষ্ট্র জমির মালিকানা (proprietary right) ত্যাগ করল। জমি থেকে রাষ্ট্রের আয় চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও দেশী কুটির ও হস্ত শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হল। জমির উৎপাদন ও দাম কয়েকগুণ বাড়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র বর্ধিত আয়ের অংশ পেল না। জমিদাররা এই বর্ধিত ও অনর্জিত আয়ের (unearned income) সবটুকই ভোগ করার অধিকার পেল। জমি থেকে বর্ধিত আয় দেশের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে লাগলো না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ভূমি-রাজস্ব থেকে আয় চিরস্থায়ী হওয়াতে আর্থিক প্রয়োজনে পরবর্তীকালে নতুন কর বা শুল্ক বসিয়ে রাষ্ট্রকে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়।

জমিদাররা জমি থেকে অনর্জিত আয় ভোগ করতে থাকেন আর দেশের আপামর জনসাধারণ বাড়তি কর বহন করতে থাকে। উপরন্তু প্রশাসনের বর্ধিত ব্যয় মেটাতে রাষ্ট্রকে টাকা ধার নিতে হত (public debt) যার মোটা টাকার সুদ ভারতবাসীকে যোগাতে হত। এছাড়া আর্থিক অসুবিধার জন্যে সরকার ক্ষতিকর অভ্যন্তরীণ শুল্ক ও একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দিতে পারেনি।[২৫]

তৃতীয়ত, বহু প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব।[২৬] জমিদাররা জমিদারি খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে পত্তনি দিতে শুরু করলেন। পত্তনিদাররা আবার দূর পত্তনি দিতে লাগলেন এবং দূর পত্তনিদার আবার দূর দূর পত্তনি দিলেন। এভাবে জমিতে নানা ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হল। এ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চরম রূপ ধারণ করে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশজন মধ্যস্বত্বভোগীর (intermediaries) সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। জমিতে মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রকৃত কৃষকের উপর করের চাপ বৃদ্ধি। কালক্রমে বহুস্তর বিশিষ্ট (rack renting) নানা প্রকার করের বোঝা বাংলার রায়তদের কাঁধে চেপেছিল।

চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। জমিদার সরকারের কাছ থেকে রায়তের অধিকার ও ভূমি রাজস্ব নির্দিষ্ট করে লিখিত পত্র (pattah) দেওয়ার নির্দেশ পেয়েছিল। জমিদাররা এ নির্দেশ পালন করেন নি আর রায়তরাও পাট্টা নিতে উৎসাহ দেখায়নি।[২৭] ফলে জমিতে রায়তদের মালিকানা অস্বীকৃত থাকে। রায়তদের মত মাজকুরি তালুকদাররাও জমিতে তাঁদের মালিকানা হারালেন।[২৮] তৎকালীন ভূমি-ব্যবস্থায় তাঁরা জমিদারদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে সমমালিকানা (co-owners of the soil) ভোগ করতেন। 'জমিদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাদের অধীনস্থ প্রজা

২৫। অমলেশ ত্রিপাঠী, ট্রেড এ্যান্ড ফিনান্স ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৭৯৩-১৮৩৩, পৃঃ ২৫৯।

২৬। বর্ধমানের জমিদাররা প্রথম পত্তনি দিতে শুরু করেন।

২৭। রায়তদের পাট্টা নিতে অনীহার কারণগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২৮। বাংলার জমিদারদের তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) বৃহৎ জমিদার—রাজশাহী, বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া, (খ) মধ্যম জমিদার—বীরভূম, বিষ্ণুপুর, যশোর, রকনপুর, মামুদশাহী, ইদ্রাকপুর, আমিনপুর ইত্যাদি, (গ) অসংখ্য ছোট জমিদার ও তালুকদার। তালুকদাররা আবার দুভাগে বিভক্ত। যারা সরাসরি সরকারি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিত তারা হুজুরি তালুকদার। আর যারা বৃহৎ জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা দিত তারা মাজকুরি তালুকদার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর তালুকদাররা জমির মালিকানা হারাল। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ, ১২০-১৩১

করে দিয়ে ইংরাজরাই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমি ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের পত্তন করে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'রায়তের কথা'য় দুঃখ করে বলেছিলেন "যে সময়ে ফরাসী কৃষক সামন্ততন্ত্রের অবসান করে জমির মালিক হলো—সেই সময়ে বাংলার কৃষক তাদের দীর্ঘ দিনের অধিকার হারাল।"[২৯]

পঞ্চমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল অনুপস্থিত জমিদার (absentee landlordism) কর্ণওয়ালিশের আশামত জমিদাররা গ্রাম বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করলেন না। বরং নায়েব গোমস্তাদের উপর জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়ে তাঁরা কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন। গ্রামবাংলার সমাজ জীবনে স্থিতিশীল শক্তি হিসেবে জমিদারদের অনুপস্থিতির সুযোগে জমিদারদের আমলারা নানাপ্রকার অত্যাচার, জুলুম ও শোষণের সুযোগ পেল।

ষষ্ঠত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর প্রথম দুই দশকে বাংলার অনেক-গুলি ঐতিহ্যশালী জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। কঠোর সূর্যাস্ত আইন প্রয়োগ করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হত। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে সরকারি রাজস্ব জমা দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে বিক্রি করা হত। বাংলার জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রথম কয়েক বছর সময়মত এ রাজস্ব যোগাড় করতে পারেন নি। এসময় জমিদারির দাম ও সুদের হার অনেক বেশি। ফলে অনেককে প্রথম বছরে বন্দীশালায় থাকতে হয়েছিল এবং অনেকের জমিদারি নিলাম হয়েছিল। পরে রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়।[৩০] এতে জমিদারদের পক্ষে রাজস্ব আদায়ের খানিকটা সুবিধা হয়।

সপ্তমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশে অনেক নতুন জমিদার সৃষ্টি হয় যাদের ভূমি ও রাজস্বের সঙ্গে আগে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এঁরা হলেন কলকাতার নব্য ধনী, মহাজন ও বণিক মনোবৃত্তিধারী ফাটকাবাজ জমিদার। ঐতিহ্য বা প্রচলিত রীতিনীতি নয়, আইন ও চুক্তি বাংলার নয়া জমিদারতন্ত্র ও রায়তের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে গ্রামবাংলার জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা অনেক-খানি বেড়ে গেল।

জেমস্ মিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ছাড়া ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত আর সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে এরকম ভূমি

২৯। বিনয় চৌধুরী, বাংলার ভূমি ব্যবস্থার রূপরেখা, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১৫।

৩০। গভর্ণর জেনারেলের ১৭৯৩, সনের ১৭ (২) রেগুলেশন এবং ১৭৯৯ সনের ৭নং রেগুলেশন জমিদারদের রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার দেয়। ১৮১২ সনের ৫নং রেগুলেশনে জমিদারদের ক্রোক ক্ষমতার উপর বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।

ব্যবস্থায় আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। অপরদিকে রমেশ চন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ভারতে বৃটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় অবদান বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১] তাঁর মতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বৃটিশ প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্তের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। এর দুটি সুবিধাজনক দিক হল : (ক) সরকারি রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হওয়ায় সরকারের প্রয়োজনে ভূমি রাজস্ব বাড়ানোর কোনো সুযোগ ছিল না। (খ) তুলনামূলকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি-রাজস্বের হার কম ছিল। সে জন্য বাংলার সঞ্চয় বেশি, দুর্ভিক্ষ কম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে তুলনায় বাংলার কৃষকরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। রমেশ চন্দ্রের ধারণা হয়েছিল 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষির সঙ্গে যুক্ত সর্ব শ্রেণীর মানুষ (the whole agricultural community) উপকৃত হয়েছে'।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় (১৭৬৫-১৭৯৩) এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে উন্নত ধরনের ছিল। এতে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে খানিকটা স্থিতিশীলতা এসেছিল। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার সকল শ্রেণীর কৃষকের উপকার ও সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল—রমেশ চন্দ্রের এ মন্তব্য গ্রাহ্য নয়। জমিদার ও রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী আইনগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বয়ন শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার রায়তকে তার জমির নিরাপত্তা বা ন্যায্য রাজস্ব হার থেকে বঞ্চিত করেছিল। নতুন ব্যবস্থায় সরকারি রাজস্ব মকুবের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জমিদারও দুঃসময়ে রায়তের দেয় খাজনা মকুব করতে পারেনি। জমিদারির নিশ্চিত ও নিরাপদ আয় বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য থেকে মূলধন সরিয়ে নিয়ে এল। এ প্রসঙ্গে মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটালের' তৃতীয় খণ্ডে মন্তব্য করেছেন 'ভারতের ইংরাজ শাসনের ইতিহাসেই কেবলমাত্র দেখা যায় সে দেশের অর্থব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত অবাস্তব ও কুখ্যাত পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করেছে বিলাতী ধরনের বৃহদায়তন জমিদারীর অপকৃষ্ট নকল।'[৩২] এ ধরনের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর হাতে কিছু বাড়তি টাকার যোগান রেখেছিল যা বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলন, শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত ও

৩১। রমেশচন্দ্র দত্ত, ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪-৯৫।
৩২। বিনয় চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ১৫।

সংস্কৃতি চর্চায় সহায়ক হয়েছিল। বিদেশী শাসকের হাতে যদি এ উদ্বৃত্ত ভূমি রাজস্ব যেত তাহলে বাঙ্গালীদের এই প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।[৩৩]

### সারণী

### দেওয়ানি থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার ভূমি-রাজস্ব (১৭৬৫-১৭৯৯)

| বৎসর | রাজস্বের পরিমাণ (টাকায়) | বৎসর | রাজস্বের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১৭৬৫-৬৬ | ১,৬০,২৯,০১১ | ১৭৮০-৮১ | ২,৫৫,১২,০৮০ |
| ১৭৬৮-৬৯ | ১,৬৫,৯৯,০৬৫ | ১৭৮১-৮২ | ২,৭৯,০৫,৮৫০ |
| ১৭৬৯-৭০ | ২,৩৩,৪৪,৮৪৭ | ১৭৮২-৮৩ | ২,৮০,২৫,৪৬৫ |
| ১৭৭০-৭১ | ২,৪০,৮৪,৫৫৯ | ১৭৮৩-৮৪ | ২,৭২,৬৫,৪১৪ |
| ১৭৭১-৭২ | ২,৫৫,১২,০৬৯ | ১৭৯০-৯১ | ২,৬৮,০০,৯৮৯ |
| ১৭৭২-৭৩ | ২,২২,৭৮,৩৫৬ | ১৭৯৩ | ২,৬৮,০০,৯৮৯ |
| ১৭৭৩-৭৪ | ২,৩০,৭৬,৪১৫ | ১৭৯৩-৯৪ | ৩,১৭,৭০,২৮০ |
| ১৭৭৪-৭৫ | ২,৬৬,১৬,৯৮৩ | ১৭৯৪-৯৫ | ৩,২৩,৫২,৫৯০ |
| ১৭৭৫-৭৬ | ২,৬৭,৫৩,৩০১ | ১৭৯৫-৯৬ | ৩,১৩,০৬,৯৭০ |
| ১৭৭৬-৭৭ | ২,৬৯,০১,০৩৩ | ১৭৯৬-৯৭ | ৩,১১,৮৫,৫৬০ |
| ১৭৭৭-৭৮ | ২,৫৭,৬১,৭১৬ | ১৭৯৭-৯৮ | ৩,০৯,৭৪,৪৩০ |
| ১৭৭৮-৭৯ | ২,৫৩,৮২,৮৭৩ | ১৭৯৮-৯৯ | ৩,০৭,২৭,৪৩০ |
| ১৭৭৯-৮০ | ২,৫২,৬০,৬৬৪ | ১৭৯৯-১৮০০ | ৩,২১,৩২,৩০০ |

সূত্রঃ—(ক) ফারমিংগার সম্পাঃ ফিফথ্ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড., পৃঃ ১৮, (খ) এন. কে. সিংহ, ঐ. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৫ ও (গ) রমেশ চন্দ্র দত্ত, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯-৪০০। রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থে বাংলার ভূমি-রাজস্বের হিসাব দেওয়া আছে পাউন্ডে। এক পাউন্ড সমান দশ টাকা ধরে ভূমি-রাজস্বের হিসাব টাকায় আনা হয়েছে।

৩৩। ধীরেশ ভট্টাচার্য্য, এ কনসাইজ হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান ইকনমি, ১৭৫০-১৯৫০, নিউ দিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ৪০।

# ৩

# কৃষি ও কৃষক

বাংলার আর্থিক সম্পদের প্রধান দুটি উৎস কৃষি ও শিল্প। পলিমাটিতে গড়া বাংলার বিশাল সমতলভূমি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অসংখ্য শাখা নদ-নদীর জলধারা পুষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় অবস্থানকারী বহু বিদেশী পর্যবেক্ষক বাংলার সমতলভূমির বিস্তৃতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এমন বিশাল সমতলভূমি পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায় না। অনেকের মতে এমনকি নীল নদের অববাহিকায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমতলভূমির চেয়ে বাংলা বেশি উর্বর ও ঐশ্বর্যশালী। সুজন রায় ভাণ্ডারীর 'খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ' গ্রন্থে বাংলার বিশাল সমতলভূমির উল্লেখ আছে। এ সমতলভূমি পূর্ব-পশ্চিমে চট্টগ্রাম থেকে রাজমহলের তেলিয়া-গাড়ি পর্যন্ত চারশ ক্রোশ লম্বা; উত্তরের পর্বতপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে হুগলী জেলার মান্দারণ পর্যন্ত দুশ ক্রোশ চওড়া। জেমস্ রেনেল তাঁর সমকালীন (১৭৬৫-৭২) বাংলার নিম্নরূপ বর্ণনা রেখে গেছেনঃ '৫০,০০০ বর্গ মাইল নিয়ে গড়া বাংলার সমতলভূমিতে একটা পাহাড় বা পাথর চোখে পড়ে না। এদেশকে প্রাচ্যের শস্য-ভাণ্ডার বলা যেতে পারে। শ্যামল আস্তরণে ঢাকা এই বাংলা মিশরের মতই উর্বর'।[১]

সমসাময়িক রায় ছত্রমন তাঁর 'চাহার গুলসানে' বাংলার জরীপ করা জমির পরিমাণ দিয়েছেন ৩,৩৪,৭৭৫ বিঘা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে জেমস্ গ্রান্টের হিসেব মত বাংলার কৃষি জমির পরিমাণ হল ১৮,০০০ বর্গমাইল। কর্ণওয়ালিশের হিসেব মত বাংলার ৩৩ শতাংশ জমিতে চাষ হত। এ হিসেবের মধ্যে তিনি গো-চারণ বা পতিত জমি ধরেননি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসার এইচ টি কোলব্রুক ১৭৯০-তে বাংলা ও বিহারের চাষ জমির পরিমাণ ৯,৪৭,৯০,১০০ বিঘা বা ৩,১৩,৩৫,৫৭০ একর বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ১৭৭০-এর ভয়ংকর মন্বন্তর এবং ১৭৮৮-র দুর্ভিক্ষে বাংলার চাষ জমির একাংশ অনাবাদী বা পতিত হয়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে কিছু কিছু অনাবাদী ও পতিত

১। এন. কে. সিংহ. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮।

২। এইচ. টি. কোলব্রুক, রিমার্ক'স অন দি হাজবাণ্ডিং এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাল কমার্স অব বেঙ্গল, পৃঃ ১২।

জমি চাষে আনা শুরু হয়। শতাব্দীর শেষদিকে রেশম, আখ, তামাক, তুলো ও নীলের চাষ বাড়ানোর জন্যে বাড়তি জমি চাষে আনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের 'এ্যানুয়াল রেজিস্টারে' বাংলাকে উর্বর ও শস্যশালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রবার্ট ওরমে লিখেছেন 'পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার সমতলভূমি উর্বর ও ঐশর্যশালী। এই সমতলভূমি গঙ্গা ও তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা এবং পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদীর জলধারা পুষ্ট। মে থেকে আগস্টে এই তিনমাসের প্রবল বর্ষণে বাংলার মাটি উর্বর হয় এবং এ দেশের মানুষ অল্প আয়াসে শস্য পায়। এত অল্প আয়াসে পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে শস্য ফলে না।' আলেকজাণ্ডার ডাও লিখছেনঃ "প্রকৃতি যেন নিজহাতে বাংলাকে কৃষি ও কৃষি কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কৃষির উপযোগী সব কিছু বাংলায় আছে।' তিনি আরো লিখেছেন বাংলার দেড় কোটি মানুষ অতিশয় পরিশ্রমী। আরো দেড় কোটি মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তারা সহজেই উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা ভারতের বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য শস্য সরবরাহ করত।

বাংলার ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদীগুলির জলধারা, বাংলাব জলবায়ু—মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত নিয়মিত বৃষ্টি ও বাংলার পরিশ্রমী মানুষ বাংলাদেশে কৃষির সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরি করে-ছিল। কৃষির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি হল সারা বছর নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হত ঠিকই তবে পশ্চিমাঞ্চলে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে খরা বা অনাবৃষ্টি চলত। এ অঞ্চলে বৃষ্টির অভাব পূরণ করা হত জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে। বাংলার কৃষি জমিতে চার প্রকার জলসেচের ব্যবস্থা দেখা যায়—নদী ও শাখা নদীর জল, বাঁধের জল, পুষ্করিণীর জল এবং কূপের জল।

বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলের অসংখ্য নদ-নদী প্রাকৃতিক জলসেচ প্রণালীর কাজ করত। নিম্ন অঞ্চলে চাষের কাজ নদী ও খালের জলে সম্পন্ন হত। বর্ষাকালে অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে চাষের ব্যবস্থা করা হত। বীরভূমের মল্লরাজারা বড় বড় বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে দুরকমের সুবিধা হত। বড় বড় বাঁধগুলি এই সীমান্ত জেলায় পরিখার কাজ করত। দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে আর অনাবৃষ্টির সময় চাষীদের চাষের জল সরবরাহ করত। পারকার সাহেব তাঁর 'দি ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে রিজারভাঁর (reservoir) গড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ

রিজার্ভার থেকে চাষীরা চাষের জন্য জল পেত, বিনিময়ে রাষ্ট্রকে কর দিতে হত।[৩] এ ছাড়া গ্রামবাংলার অসংখ্য পুকুরে বর্ষাকালে জল ধরে রেখে সেই জলে শীতকালে শস্যের চাষ করার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র দেখা যেত। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কূপ থেকে জল তুলে চাষে ব্যবহার করা হত। এ ব্যবস্থা বেশ শ্রম ও ব্যয়সাধ্য বলে এ পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবহার খুব কম জমিতে দেখা যেত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষির উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায় না। এ সময়কার চাষের বড় বৈশিষ্ট্য হল বিস্তৃত চাষ পদ্ধতি ( extensive cultivation )। অধিক উৎপাদনের জন্য বেশি জমি চাষে আনা হত। নিবিড় চাষ পদ্ধতি ( intensive cultivation ) এ যুগে অনুসৃত হতে দেখা যায় না। অল্প জমিতে বেশি ফসল উৎপাদনের চেষ্টা কম। প্রাক্-পলাশী যুগে বছরে একই জমিতে একাধিক চায ( crop rotation ) বা নতুন নতুন শস্য চাষের ব্যবস্থা তেমন দেখা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কৃষি জমির অর্ধেকাংশে এক ফসল আর অর্ধাংশে দুই বা তিন ফসল হত। একই জমিতে এক বছরে দুই ফসল যেমন ধান ও পাট উৎপন্ন হত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ণ' কাব্যে মাঠের চাষ, শস্য লালন ও ঝাড়াইয়ের এবং ব্যবহৃত চাষবাসের যন্ত্রগুলির নিখুঁত বর্ণনা আছে। এগুলির নাম চাষাস্ত্র। আমাদের কালের চাষাস্ত্রের সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। চাষের জন্য চাষীরা চাষাস্ত্ররূপে সাধারণত কোদালী, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, আগাছা দূর করার জন্যে বিড়ে, এবং জমি সমান করার জন্য মই ব্যবহার করত। বলদ ও মহিষ দুইই চাষের জন্য ব্যবহার করা হত।[৪] গোবর জমিতে সারের কাজ করত। কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা উভয়েই চাষবাসে অংশ নিত।

**কৃষিজ পণ্য :** অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কৃষিজ পণ্য অসংখ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ (numerous and varied)। প্রধান প্রধান কৃষিপণ্য হল ধান, গম, যব, রবিশস্য, আখ, তামাক, তুলা, রেশমের জন্য তুঁতে গাছের চাষ ( mul berry plantations ), পাট, নীল, সুপারি, পান প্রভৃতি। এর মধ্যে পাট ও নীল

৩। কে. কে দত্ত, স্টাডিজ ইন দি হিস্ট্রি অব দি বেঙ্গল সুবা, ১৭৪০-৭০, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪৯।

৪। কে. কে. দত্ত, ঐ, পৃঃ ৪৪৮-৪৪৯।

আভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন হত, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট ও নীলের উৎপাদন ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতে ( রংপুর, কুচবিহার, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা ) প্রধান কৃষি পণ্য হল ধান, তুলা, পান, সুপারি, তামাক, রেশম, লংকা ও আফিম। ফলের মধ্যে আম, কলা ও কমলালেবু প্রধান। পশ্চিমাঞ্চলের মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলাতে ধান, গম, যব, তুলা. আখ, কলাই ও তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালিতে ধান, তুলা. আখ, পান, সুপারি, নারিকেল ও নানারকমের ফলের চাষ হত। ফলের মধ্যে কমলালেবু, আম, সাংতাড়া ( বাতাবিলেবু ) ও চীনামুল উল্লেখযোগ্য। বাংলার মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলিতে ( মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী ) প্রধান উৎপন্ন ফসল হল রেশম, ধান, আখ, তিল, পাট, নীল প্রভৃতি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ( চব্বিশ পরগণা, যশোর ও বরিশাল ) পাওয়া যেত ধান, পাট, নীল, তৈলবীজ, সুপারি, লম্বা লংকা ও কলাই মুগ, মুসুর, মটর, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি।[৫]

বাংলায় উৎপন্ন কৃষিজ পণ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবার্ট ওরমে লিখছেন: বাংলার সবচেয়ে বড় ফসল ধান। নিম্নবঙ্গে ধান এত প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে ফসল উঠানোর সময় মাত্র এক ফার্দিঙে দু পাউণ্ড ধান পাওয়া যায়। আরো অনেক প্রকারের শস্য, অনেক ফল ও সবজি, খাদ্যের প্রয়োজনীয় অনেক মশলা বাঙালীরা অল্পায়াসে উৎপাদন করে। আখ চাষের জন্য কিঞ্চিৎ বেশি পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন হয়।[৬] বাংলার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান নিঃসন্দেহে প্রধান। বাংলার ধান চাষ সম্পর্কে 'খুলাসাৎ' রচয়িতার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন বাংলায় বহুজাতের ধান উৎপন্ন হয়। প্রতিটি জাতের একটি করে শস্য কণা যদি একটি ভাণ্ডে রাখা হয় তাহলে সেটি পুর্ণ হয়ে যায়।[৭] অর্থাৎ এযুগে বাংলাদেশে বহুপ্রকার ধানের চাষ হত। ধান চাষে এরকম বৈচিত্র্য অন্য কোথাও দেখা যেত না বলে গ্রন্থকার এ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলায় আউস, আমন ও বোরো এই তিন ধরণের ধান চাষ ছিল। গ্রীষ্মে আউস, বর্ষায় আমন ও বসন্তে বোরো ধান চাষের রেওয়াজ

৫। ইরফান হাবিব, এ্যান এ্যাটলাস অব দি মুঘল এম্পায়ার, ম্যাপ ১১বি দ্রষ্টব্য। জেমস্ রেনেল, দি জার্নালস্, পৃ: ১০ ৭৫।

৬। রবার্ট ওরমে, মিলিটারি ট্রানজাকশনস্ ২য় খণ্ড, পৃ: ৩-৪।

৭। সুজন রায় ভাণ্ডারী, খুলাসাৎ, যদুনাথ সরকার, ইণ্ডিয়া অব আরংগজেব, পৃ: ৪০-৪১।

ছিল। ধান ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ভাল গমের চাষ হত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার গম ওলন্দাজদের উপনিবেশ বাটাভিয়াতে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) রপ্তানি করা হত বলে ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাস আমাদের জানিয়েছেন। পরে উত্তমাশা অন্তরীপের শস্য ব্যবসায়কে উৎসাহিত করার জন্য বাংলা থেকে গম রপ্তানি কমিয়ে দেওয়া হয়।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে রবিশস্যের মধ্যে মাসকলাই, মুগ, ছোলা, অড়হর, মুসুরি, বরবটী, মটর, মাড়ুয়া, ভুরা, যব ও খেসারির উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে' এ যুগের খাদ্যশস্য ও রবিশস্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' দিল্লীতে উৎপাত বর্ণনাকালে এ যুগের বাংলার সমস্ত রকম উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
দেধান মাড়ুয়া কোদা চিনাভুরা খর।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥[৮]

গঙ্গারাম তাঁর গ্রন্থে চাউল, কলাই, মুসুরি ও খেসারির কথা উল্লেখ করেছেন।

**রপ্তানি বাণিজ্যঃ**—প্রাক্-পলাশীযুগে বাংলার কৃষিজ পণ্য ইউরোপে রপ্তানি হত না। এর প্রধান কারণ দুটি প্রথমত, কৃষি পণ্য জাহাজে অনেক জায়গা দখল করে, সেজন্য কৃষি পণ্যের জাহাজ পরিবহন ভাড়াও বেশি। দ্বিতীয়ত, কৃষিপণ্য সহজে নষ্ট হয় বলে বাংলা থেকে সুদূর ইউরোপে কৃষিপণ্য নিয়ে যাওয়া সহজ হত না।[৯]

এ যুগে বাংলা থেকে নানাধরণের কৃষিপণ্য—চাল, চিনি, ডাল, তৈলবীজ, আফিম, নীল, লংকা, আদা, হলুদ প্রভৃতি—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার বিশেষ বিশেষ কৃষি পণ্যের নতুন করে চাহিদা সৃষ্টি হয়। এর প্রধান কারণ ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব। নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ, ইংল্যাণ্ডের শিল্পে, কাঁচামালের চাহিদা, কাঁচামাল বিনিময়ের সুবিধাজনক মাধ্যম (medium of exchange) প্রভৃতি এ নতুন চাহিদার আর্থিক পশ্চাদপট তৈরি করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জমিতে ব্যাপকভাবে নতুন

৯। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮।

বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। এ পণ্যগুলি হল তামাক, রেশম, আখ, সপারি, নীল, পাট, তৈলবীজ, তুলা ও আফিম। খাদ্যশস্যের চেয়ে এ পণ্যগুলি লাভজনক ছিল বলে বাংলার কৃষকরা বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হল। এ পণ্যগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে নগদমূল্যে এগুলি বিক্রি করা সহজ ছিল।

**কৃষির অবস্থা ঃ** (ক) টাকার লেনদেনের বাজার ( money economy), টাকার জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ( comerciali-zation of agriculture) শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। (খ) কৃষি জমির মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধি আর সেই সঙ্গে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি। শতকের শেষ দিক থেকে বাংলার হস্ত ও কুটির শিল্প নানাকারণে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্য জীবিকার অভাব জমির উপর চাপ সৃষ্টি করে। জমির খণ্ডীকরণ ( fragmentation ) এর অন্যতম ফলশ্রুতি। (গ) কৃষি উন্নতির পথে কৃষকের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল। জমির উৎপন্ন ফসলের ৩৩ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ কৃষককে কর হিসেবে দিতে হত এবং পুঁজির অভাবে চড়াসুদে ঋণ করতে হত। কৃষকদের চাষবাস সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লাভজনক উৎসাহের (incentive) অভাব এবং জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বত্ব না থাকায় কৃষিকাজে কৃষকের আন্তরিকতার অভাব ছিল। সামগ্রিকভাবে অষ্টাদশ শতকে বাংলার কৃষির অবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক বলা যায় না।

**রায়ত শ্রেণীবিন্যাস ঃ** আরবী ভাষায় রায়ত শব্দের অর্থ হল প্রজা।[১০] বহুবচনে রুয়ায়া (ruaya) মানে জনগণ বা প্রজাগণ—সমাজের সর্বনিম্নস্তরের লোক বা সামাজিক শ্রেণী। রায়তের অর্থ অবশ্য সবসময় কৃষক বোঝাত না। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এক সরকারি দলিলে রায়ত শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জমির প্রত্যক্ষ দখলদার, জমির মালিক বা প্রজা। বাংলাদেশের অসংখ্য চাষী যারা ছোট ছোট খণ্ড জমি চাষ করত তাদেরকে সাধারণভাবে রায়ত বলা হত। বেন্টিঙ্ক বাংলা দেশের সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে রায়ত বলে অভিহিত করেছেন। কৃষি মজুর অবশ্য রায়ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রায়তদের কর দেওয়ার পদ্ধতি অনুসারে আর তাদের বাসস্থান ও চাষ জমিতে অধিকারের ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা যায়। কর দেওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী রায়তদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়—হারি (harie), ফসলি (fasli) ও খামার khammar)।[১১] হারি হল সেই শ্রেণীর রায়ত যারা জমির জন্য বিঘাপ্রতি নির্দিষ্টহারে খাজনা দিত জমিতে চাষ হোক বা না হোক। ফসলি রায়তরা জমিতে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে খাজনা বা কর দিত। ঢাকা জেলার

১০। এ সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২। এ. সি. ব্যানার্জী ও বি. কে. ঘোষ সম্পাঃ সঞ্জীব চন্দ্র চাটোর্জী, দি বেঙ্গল রায়তস, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১-২।

১১। এ. সি ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩।

উত্তরাংশে এরকম ভূমি-কর প্রথা চালু ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তরা টাকায় তাদের ভূমি রাজস্ব দিত। তৃতীয় শ্রেণীর রায়ত বা খামার রায়তরা উৎপন্ন ফসলের একাংশ খাজনা হিসাবে দিত। সাধারণত তাদের দেয় রাজস্বের হার হত উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ।

জন শোর তাঁর সুবিখ্যাত ১৭৮৯ সনের ১৮ই জুনের মিনিটসে বাংলার রায়তদের দুভাগে ভাগ করেছেন—খোদকস্ত (khudkasht) ও পাইকস্ত (paikasht)। (ক) খোদকস্ত রায়ত যে গ্রামে বাস করে সেখানেই জমি চাষ করে। জমিদারি পাট্টায় জমিতে তার অধিকার স্বীকৃত এবং বছরের পর বছর সে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে জমি চাষে রাখে। তার দেয় রাজস্বের হারও কিছুটা বেশি। (খ) পাইকস্ত রায়ত যারা একগ্রামে বাস করে আর অন্যগ্রামে জমি চাষ করে। এদের জমিতে অধিকার বা স্বত্ব নেই। এরা হল উঠবন্দি প্রজা বা কৃষক (tenants at will)। জমিদার সীমিত সময়ের জন্য (with a limitation in point of time) পাইকস্ত রায়তকে পাট্টা দিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এইচ. টি. কোলব্রুক বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। (ক) জমির মালিক কৃষক যিনি নিজেই চাষাবাদকারী, (খ) জমির মালিক কৃষক উচ্চহারে মুনাফার ভিত্তিতে বা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক শর্তে অন্যকে জমি চাষ করতে দিত—আধিয়ার, বর্গাদার বা ভাগচাষী ব্যবস্থা। (গ) জমির মালিক কৃষি শ্রমিক রেখে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জমি চাষের ব্যবস্থা করত। জমির মালিক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু (কোলব্রুক এই শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের কথাও উল্লেখ করেছেন), উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বণিক ও মহাজন প্রভৃতি এভাবে তাদের জমি চাষ করাত। কোলব্রুক বাংলাদেশে ভাগচাষ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে জমির স্বত্বভোগী শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। বর্গাদার বা ভাগচাষীকে সর্বোচ্চহারে কর দিতে হত বলে তাদের দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা অন্যান্য কৃষকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।[১২]

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বৃটিশ কালেক্টররা বাংলার রায়তদের দুভাগে ভাগ করেছিলেন—সম্পন্ন রায়ত (superior ryots) ও সাধারণ রায়ত (lower ryots)। সম্পন্ন রায়তরা সাধারণত গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান। এরা বহুল পরিমাণ ভাগ জমির মালিক অথচ জমিদারদের আমলা, গোমস্তা ও পাটোয়ারিদের সঙ্গে যোগসাজসে কম খাজনা দিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই খাজনা দিত না। বহু জমি গোপন রেখে নিষ্কর ভোগ করত। জমিদার ও ইজারাদারদের সাধারণ রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করে এরা উক্ত সুবিধাগুলি ভোগ করত। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভূমিবন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যখন নিলামে ইজারা দেওয়া (farming) শুরু হয় তখন থেকে গ্রাম বাংলায় মণ্ডল ও প্রধান রায়তদের আধিপত্য বাড়তে

১২। এইচ. টি. কোলব্রুক, ঐ।

থাকে।[১৩] বীরভূম, বিষ্ণুপুর, রাজশাহী দিনাজপুর; নদীয়া প্রভৃতি জেলাতে এই বিশেষ সুবিধাভোগী রায়তদের প্রাধান্য ও আধিপত্য সাধারণ রায়তদের দুঃখ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরা ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করত সেজন্য সাধারণ রায়তকে বেশি হারে রাজস্ব দিতে হত। অবশ্য সাধারণ রায়তরাও অনেক সময় বেশি জমি রেখে কম রাজস্ব দিত; কমহারে রাজস্ব দেওয়ার চেষ্টা করত। জমিদার বা ইজারাদারের আমলাকে উৎকোচে বশীভূত করে আসল জমার রসিদ কম করে লিখিয়ে নিত। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলার ভূমি-রাজস্বের আসল চিত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আসল জমার ( Original rent ) ভিত্তিতে বাংলার জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব আদায় করতেন। আসল জমা ছাড়াও সুবাদারি আবওয়াব ও অন্যান্য খরচ বাবদ রাজস্ব আদায় করা হত। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসল জমা, আবওয়াব, মাথোট, রসুম, জমিদারি খরচাগণ্ডা, মাঙ্গন, বাট্টা প্রভৃতি খাতে জমিদাররা রাজস্ব আদায় করতেন। আসল কথা হল মূল ভমি-রাজস্ব, আবওয়াব বাড়তি কর, মাথোট মাথাপিছু কর, রসুম বাড়তি খরচের জন্য কর, মাঙ্গন জমিদারের আর্থিক অসুবিধায় প্রজার সাহায্য। সরকারি রাজস্ব শুধু সিক্কা টাকায় নেওয়া হত আর জমিদার বিভিন্ন মুদ্রায় ভূমি-রাজস্ব জমা নিতেন—এজন্য বিনিময় বাট্টা। এগুলি ছাড়াও জমিদার রাস্তা, সেতু প্রভৃতির জন্য পুলবন্দি, রাস্তাবন্দি, নজরানা, উৎসব বা পার্বনের খরচ হিসাবে কর নিতেন। এগুলির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট হার (standard rate) ছিল না। জন শোর হিসাব করে দেখিয়েছেন রায়তের আসলজমা ও আবওয়াবসহ মোট দেয় খাজনা হল টাঃ ১৪—০—৮ অথচ অন্যান্য জমিদারি করসহ তার মোট দেয় খাজনার পরিমাণ হল টাঃ ২৪—১৪—৮। শোরের মতে রায়তরা অস্থায়ী অনেক প্রকার কর দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ঠিকই তবে তা কেবল বল প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব ছিল না।[১৪] জমিদাররা বল প্রয়োগে যথেচ্ছ রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না। এক্ষেত্রে তাদের দুরকম বাধার সম্মুখীন হতে হত। প্রথমত, প্রতিটি জেলায় স্থানীয় রাজস্বের হার ছিল ( pargana rate ) যাকে স্থানীয় ভাষায় নিরিক বলা হত ( customary rent )। জমিদাররা স্থানীয় হারের অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করলে সমালোচনার সম্মুখীন হতেন এবং রায়তরা ক্ষুব্ধ হত। দ্বিতীয়ত, বেশিহারে রাজস্ব ধার্য করলে রায়তরা জমি ছেড়ে অন্য জেলায় পালিয়ে যেত। রায়তের পালিয়ে যাওয়ার ভয় জমিদারের যথেচ্ছহারে রাজস্ব ধার্যে বাধা হিসেবে কাজ করত।

জমিতে রায়তের অধিকার সম্পর্কে জন শোরের অভিমত হল এ অধিকারগুলি ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট ( their rights appear very uncertain and indefinite )। দীর্ঘকাল জমির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে জমিতে রায়তের

১৩। এন. কে. সিংহ, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩২।
১৪। ফারমিংগার সম্পাঃ ফিফথ্ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

দখলি স্বত্ব (occupancy right) এসে যেত ঠিকই তবে জমিতে রায়তের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হত না। রায়তরা সম্ভবত জমি বিক্রী করতে বা বন্ধক রাখতে পারত না। নবাবী আমলে জমিদারদের যথেচ্ছচারিতার উপর কানুনগো বিভাগ নিয়ন্ত্রণ হিসাবে (check) কাজ করত। যেহেতু কানুনগো বিভাগ ভূমি ও ভূমি-রাজস্বের সমস্ত রকম হিসাব রাখত সেহেতু জমিদাররা যথেচ্ছহারে রাজস্ব ধার্য করতে পারত না। কোম্পানি আমলে বিশেষ করে শতাব্দীর শেষ পাদে কানুনগো বিভাগ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় জমিদারদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা সম্ভব হয় এবং যথেচ্ছ খাজনা ও কর ধার্য (arbitrary cesses) সহজ হয়। জমিদারদের পক্ষে রায়তের অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করে পাট্টা দেওয়ার প্রথাটিও আস্তে আস্তে লুপ্ত হতে বসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়তদের পাট্টা দেওয়ার জন্য জমিদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। জমিদাররা রায়তকে পাট্টা দেওয়ার দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে যেতে থাকেন। রায়তের অধিকার আইনগত স্বীকৃতি পেলে জমিদারের পক্ষে খুশিমত রাজস্ব বাড়ানো বা রায়ত উচ্ছেদে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কোম্পানি আমলে কম হারে ধার্য রাজস্ব স্থায়ী হলে জমিদারের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বাংলার রায়তরাও জমিদারের কাছ থেকে পাট্টা নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাত না। এর কারণ রায়তরা (ক) অনেক জমি গোপন রেখে কম রাজস্ব দিত। (খ) কমহারে রাজস্ব দিত।[১৫] (গ) জমিদারের আমলাকে উৎকোচ দিয়ে কম টাকার রসিদ রাখার ব্যবস্থা করত, (ঘ) লিখিত পাট্টা নিলে তাদের ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত অধিকার (prescriptive rights) ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে মনে করত; বিস্তৃত জরীপ ও হস্তবুদ তৈরি না করে পাট্টা দিলে রায়তদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল।

বাংলার শান্ত, নিরীহ ও তুষ্ট রায়তরা জমিদার ও ইজারাদারদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের পথ ধরত। বাংলার রায়ত সম্বন্ধে বৃটিশ কালেক্টরদের ধারণা হল এরা বাইরে শান্ত ও নিরীহ কিন্তু ভিতরে বেশ শক্ত ও সাহসী। অনেকে বেশ কূট কৌশলী আর রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার কৌশলও এদের আয়ত্তাধীন। আঠারো শতকের শেষ পাদে বাংলার রায়তদের সংগঠিত ছোট খাট কয়েকটি বিদ্রোহের খবর সরকারি কাগজ পত্রে আছে। (ক) পূর্ণিয়া জেলার শ্রীপুরের রায়তরা ঘুন্নি নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে জমিদারের কাছারিতে গিয়ে সজোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ঘুন্নির সঙ্গে ছিল পনেরোশ থেকে দুহাজার রায়ত। ঘুন্নি কৃষকদের একটি দল নিয়ে কলকাতায় গভর্ণর জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনে রাজস্ব অনাদায়ের সম্ভাবনা দেখে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। (খ) ঘুন্নির পরে পাঁচুলা নামে অপর এক ব্যক্তি ঐ অঞ্চলে কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কৃষক-আন্দোলন বন্ধ করার জন্যে তাঁকেও

১৫। যশোরের কালেক্টর হেঙ্কেলের মন্তব্য হল রায়ত এক বিঘা জমির জন্য একটাকা খাজনা দেয় ঠিকই তবে এ বিঘা হল আসলে পনেরো বিঘার সমান। দ্রঃ এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।

বন্দী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। (গ) রংপুর জেলার কার্জিহাট পরগনায় জাংকু ও দেওমু খাজনা না দেওয়ার (no rent campaign) আন্দোলন চালিয়েছিলেন। (ঘ) বীরভূম জেলার বাগুি তালুকে রায়তদের নেতা কিষাণ মণ্ডল, এনামুদ্দিন বিশ্বাস, পরীক্ষিৎ হালদার ও রামজয় মল্লিক ইজারাদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন করেছিলেন।[১৬] (ঙ) এযুগে কৃষকবিদ্রোহের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল রংপুরে ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে ১৭৮৩তে অভ্যুত্থান। দেবীসিংহের শোষণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের জমিদার, ইজারাদার, তালুকদার ও রায়ত সকলেই সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় রায়তদের বেশিরভাগ এক বা দুই লাঙ্গলের মালিক। সাধারণত এক লাঙ্গলে দশ বিঘা পর্যন্ত ভূমি চাষ করা যায়। তিন, চার বা পাঁচ লাঙ্গলের মালিক চাষীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। শতাব্দীর শেষে কোলব্রুকের হিসেবে বাংলার একজন কৃষক সাধারণত এক একরের বেশি চাষযোগ্য জমি পেত না। এমনিতে একজন কৃষকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম ; তার উপর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এবং হস্ত ও কুটির শিল্পের অধঃপতনের শুরু থেকে জমির উপর আরো চাপ সৃষ্টি হল। বাংলার উত্তরাধিকার আইনেও (দায়ভাগ) ভূমি ক্রমশ খণ্ড খণ্ড (fragmentation) হতে থাকল। আঠারো শতকের শেষে বাংলাদেশে ভূমি-রাজস্বের হার কোনমতেই কম নয়। বরং উচ্চহারবিশিষ্ট। এই রাজস্ব হার, কোলব্রুকের হিসেব অনুযায়ী, জমির উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের একভাগ ($\frac{১}{৩}$) থেকে ষোল ভাগের নয়ভাগ ($\frac{৯}{১৬}$)। সুতরাং বাংলার কৃষক শতাব্দীর শেষ দিকে শুধু খাদ্য শস্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে ছিল না। এতে তার মুনাফা তেমন হত না আর জীবনযাপনও স্বাচ্ছন্দ্যে চলত না। বিকল্প ব্যবস্থা রূপে যেসমস্ত জেলায় পশুচারণ ভূমি বেশি সেখানে কৃষকরা দুগ্ধ উৎপাদন ও তৎ-সম্পর্কিত ব্যবসায়ে (dairy) যোগ দিত। অন্যান্য জেলাতে অর্থকরী কৃষিপণ্য যেমন তুঁতে গাছের চাষ (রেশমের জন্য), আখ, তামাক, আফিম, নীল, তুলা, পাট ও সিল্ক উৎপাদন করত। এগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য বলে বেশ চাহিদা ছিল। এছাড়া বাংলার কৃষকদের অঞ্চল বিশেষে নানারকম লাভজনক চাষাবাদ ছিল। আম, নারিকেল, সুপারি, বাঁশ, তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে কৃষকরা কিছু রোজগার করত। কোলব্রুকের মন্তব্য হল আমবাগান কৃষককে তার জমিতে বেঁধে রাখে। বিধবা ও শিশুরা সুতো কেটে কিছু আয় করত। এতে কৃষকের সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসত। কৃষকের গৃহবধূ কৃষিকাজে অংশ গ্রহণ করত। বীজ বপন থেকে শস্য ঝাড়াই পর্যন্ত কৃষির সমস্ত রকম কাজকর্মে বাংলার কৃষক রমণীদের অংশ নিতে দেখা যেত।

এযুগে কৃষিখাদ্য পণ্যের দাম কম থাকাতে কৃষকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। শতকের শেষে প্রতিমণ চাল, গম ও যবের দাম এক টাকা। এক সের ঘিয়ের

১৬। এন. কে. সিংহ, ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯।

দাম তিন আনা। একটি সাধারণ গরুর দাম পাঁচ টাকা। একজন ভাগচাষী উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পেয়েও একজন কৃষি মজুরের চেয়ে কম রোজগার করত। একজন কৃষি মজুর দৈনিক এক আনা রোজগার করত। সাধারণভাবে পাঁচজনের এক কৃষক পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন হল আড়াই আউন্স লবণ, দু পাউণ্ড ডাল আর আট পাউণ্ড চাল। অন্য এক হিসেবে ছয়জনের এক কৃষক পরিবারের (দুজন পুরুষ, দুজন মহিলা ও দুজন শিশু) মাসিক প্রয়োজন চারমণ চাল, একমণ ডাল আর সাড়ে তিন সের লবণ।[১৭] প্রয়োজনের তুলনায় কৃষকের আয় কম হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কৃষক সম্পর্কে অনেক সমকালীন পর্যবেক্ষক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এরা অলস, উদাসীন ও বেহিসাবী। বাংলার কৃষিজমির উর্বরা-শক্তি, নরম আদ্র জলবায়ু, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কম দাম, সরল, সাদাসিধা জীবনযাপন এবং অবিরত বিরামহীন পরিশ্রম না করেও জীবিকার্জনের সুবিধা বাংলার কৃষককে কিছুটা পরিমাণে শ্রমবিমুখ করেছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমের কৃষকদের সঙ্গে তুলনায় বাংলার কৃষক শ্রমবিমুখ বা অলস বলে ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকরা মন্তব্য করেছেন। বাংলার বেশিরভাগ জমি এক ফসলী অর্থাৎ আমন চাষের জমি। এ চাষের জন্য বর্ষাকালে তিনমাস আর শস্য সংগ্রহের সময় দুমাস কৃষকের কাজ থাকে। এসময় বাংলার কৃষক রোদ বা বৃষ্টিতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে অভ্যস্ত।[১৮] অল্পজমিতে আউস এবং পূর্ব বঙ্গের অল্প কিছু জমিতে বোরো চাষ হত। চাষের সময়টুকুতে শুধু কৃষকের কাজ থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষ দিকে পাট, তামাক, তুলা, রেশম ইত্যাদির চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তার আগে কৃষকের চাষের কাজ সারা বছর ধরে চলত না। বাংলার কৃষক বছরের ছমাস শুধু গল্পগুজব করে; মাছ ধরে বা দাওয়ায় বসে হুক্কা টেনে কাটিয়ে দিত। বিকল্প কর্মের ব্যবস্থা না থাকায় এই শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে কৃষক উৎখাত (depeasantisation) বা কৃষকের বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা দেখা যায় না।

১৭। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩০।
১৮। এন কে সিংহ, ঐ. ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৭-১৮।

# ৪

# ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা সন ১১৭৬ ইং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ)। আগের দেড়শ বছরে বাংলার ইতিহাসে এমন ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে স্বল্পকালস্থায়ী খাদ্যাভাব দেখা দিত ঠিকই তবে কোনোমতেই সেগুলিকে দুর্ভিক্ষ আখ্যা দেওয়া যায় না। ইংরাজ, ফরাসি বা ওলন্দাজদের কাগজপত্রে বাংলাদেশে এর আগে বড়রকমের দুর্ভিক্ষের কোনো উল্লেখ নেই। অনাবৃষ্টি তথা খরা থেকেই সাধারণত বাংলা তথা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়। এর আনুষঙ্গিক দিকটি হল সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য। যদি জনগণের আর্থিক সামর্থ্য থাকে তাহলে অনাবৃষ্টি ও খরাজনিত পরিস্থিতিতে তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা বিদেশ থেকে আমদানীকরা খাদ্যশস্য কিনে দুর্ভিক্ষের সময় জীবন ধারণ করতে পারে। এরকম অবস্থায় জীবনহানি কম হয়। কিন্তু জনগণের হাতে যদি যথেষ্ট সম্পদ না থাকে তাহলে অনাবৃষ্টি ও খরাজনিত পরিস্থিতিতে তারা খাদ্যশস্য কিনে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।[১] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ঠিক এরকম পরিস্থিতি বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল।

**কারণ ঃ** (ক) অনাবৃষ্টি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল অনাবৃষ্টি। ১৭৬৮ সনের আগষ্ট মাস থেকে ১৭৬৯ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টি, খরা ও শস্যহানি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকা রচনা করেছিল। একালের সাহিত্যেও তার উল্লেখ আছে ঃ

নদ নদী খাল বিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল ॥[২]

বাংলায় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৬৮র আউস এবং পরের বছরের আমন ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ১৭৬৯ সনের জানয়ুারী মাসের অল্প কয়েক ঘন্টার বৃষ্টির জল কোনো কাজেই লাগেনি। পরের ছমাসেও এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। ফলে চৈত্র বৈশাখ মাসে সংগ্রহযোগ্য চৈতালি ফসলও নষ্ট হয়। বাংলাদেশে পর পর তিনটি ফসল নষ্ট হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ সঙ্কটজনক হতে থাকে। ১৭৬৯-এর ডিসেম্বর মাসের ফসলটিও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল।[৩] বাংলার শস্য ক্ষেত্রগুলি শুকনো খড়

১। রমেশচন্দ্র দত্ত, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১।
২। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃঃ ৮৬।
৩। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।

বুকে নিয়ে মৃতদেহের মত পড়ে রইল। এরকম অবিশ্বাস্য অনাবৃষ্টি, খরা ও শস্যহানি স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে ঘটেনি। অতিবৃদ্ধরাও এরকম ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি ও খরা দেখেননি বলে সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

(খ) রোগ—সারা ছিয়াত্তর সন ধরে (ইং ১৭৭০) এই দুর্ভিক্ষ চলেছিল। এটা মূলত একবছরের দুর্ভিক্ষ। তবে ব্যাপকতা ও ভয়ঙ্কর পরিণতিতে এ দুর্ভিক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব দুর্ভিক্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন বিভিন্ন রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। বাংলার সর্বত্র মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। মুর্শিদাবাদ শহরে দেখা দিয়েছিল মারাত্মক গুটি বসন্ত রোগ। 'সিয়ার মুতাক্ষরীণ' রচয়িতা গোলাম হোসেন লিখছেন ঃ '১৭৭০ এর মহরম মাসে (মে, ১৭৭০) দুর্ভিক্ষ ও গুটি বসন্ত রোগ একসঙ্গে দেখা দিল। তারা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে পুরো তিন মাস তাণ্ডব চালালো। এই দুই অভিশাপের কবলে পড়ে বহুলোক প্রাণ হারালো......বহু গ্রাম ও শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হল। হঠাৎ করে (সম্ভবত বৃষ্টি শুরু হওয়ায়) এরা আবার পৃথিবী থেকে মিলিয়ে গেল।'[৪] গ্রামে খাল-বিল, পুকুর, জলাশয় সবই শুকিয়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে আগুন ধরে যেত এবং তাতে বিশাল অগ্নিকাণ্ড হত। এরকম অগ্নিকাণ্ডে বহু লোক পুড়ে মারা যায় এবং বহু শস্য গোলা আগুনের শিকার হয়। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে শস্যগোলা পুড়েছিল।

(গ) খাদ্যাভাব—স্বয়ং মোহাম্মদ রেজা খাঁ জানিয়েছেন ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়েছিল ঠিকই, তবে কষ্টকর হলেও খাদ্যশস্য জোগাড় করা সম্ভব ছিল। ১৭৭০-এ এসে সাধারণ মানুষ একেবারেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হল না। ১৭৬৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর কলকাতার গভর্ণর ও কাউন্সিল লণ্ডনে ডিরেক্টর সভাতে জানিয়েছিল যে বাংলা ও বিহারের অস্বাভাবিক খাদ্যাভাবের দরুন চলতি বছর ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কম হতে পারে। ঐ বছর ২৩শে নভেম্বর কলকাতা কাউন্সিল ডিরেক্টর সভাকে আরো জানাল 'আমাদের সামনে শুধু খাদ্যাভাবের দুঃখজনক সম্ভাবনা এবং আগামী ছমাসে দুঃখদুর্দশা আরো বেড়ে চলবে; কোনোমতেই এর প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।'[৫] বাংলার তৎকালীন গভর্ণর জন কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২) ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের মতে এ দুর্ভিক্ষে মানুষের যে দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছিল কোনো বর্ণনাই তা অতিরঞ্জিত করতে পারে না।[৬]

সর্বকালে সমস্ত দুর্ভিক্ষের মত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মূল কারণটি খাদ্যাভাব। মুর্শিদাবাদ দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্টের প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৭৭০-এর জুন মাসে মুর্শিদাবাদে চালের দাম বেড়ে দাঁড়ায় টাকায় ছয় বা সাত সের, পরের মাসে টাকায় তিন সের। সাধারণত ঐসময় বাংলার বাজারে চালের স্বাভাবিক দাম টাকায় ২৮ সের,

৪। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬।
৫। ফার্মিংগার সম্পা ঃ ফিফথ্ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, হিস্টোরিক্যাল ইণ্ট্রোডাকশন, পৃঃ ১৯৭।
৬। এন. কে. সিংহ. ঐ. ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯।

মোটা চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য টাকায় ৪৫ থেকে ৪২ সের।[৭] এ সময়কার খাদ্যাভাবের অপর দিকটি হল মাঝে মাঝে খাদ্যশস্য বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যাওয়া। ১৭৭০-এর জুন মাসে দরবারের বৃটিশ রেসিডেন্ট (রিচার্ড বীচার) জানিয়েছিলেন যে রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের তিরিশ মাইলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়নি। অনুরূপ অবস্থায় বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলের কথা সহজেই অনুমেয়।

**পরিণাম ঃ**—কাজের অভাব এবং আয়ের অন্য কোনো পথ না থাকায় সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। খাদ্যাভাবে বাংলার মানুষ শাকপাতা, ফলমূল ও নানারকম অখাদ্য খেতে শুরু করে দেয়। 'মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে' সমকালীন কবিতার প্রতিবেদন। পূর্বোক্ত বৃটিশ রেসিডেন্টের ভাষায় কোনো কোনো স্থানে জীবন্ত মানুষ মৃত মানুষের মাংসও খেয়েছে। জেমস্ মিল ও ওয়ারেন হেস্টিংসের হিসেবে সেই সময় বাংলা ও বিহারের তিনকোটি লোকের মধ্যে এককোটি অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। সামগ্রিকভাবে প্রাণহানির পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হলেও অঞ্চল বিশেষে এর পরিমাণ অর্ধাংশ। বাংলার কৃষক সমাজের অর্ধাংশই এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। উইলিয়ম হান্টারের হিসেবে বাংলা ও বিহারের প্রতি ষোলজন লোকের মধ্যে ছজন প্রাণ হারিয়েছিল।[৮] জন শোর ১৭৬৯-এ কোম্পানির চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর জন শোরের রচিত কবিতাটিতে তাঁর চোখে দেখা দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue,
Still hear the mothers' shrieks and infants' moans,
Cries of despair and agonizing groans.
In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, amidst the glare of day
They riot unmolested on their prey :
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface.[৯]

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের 'জেন্টলম্যান'স ম্যাগাজিন' ও 'এ্যানুয়াল রেজিস্টারে' এবং চার্লস গ্রান্টের 'অবজারভেশনস অন দি স্টেট অব সোসাইটি এমঙ দি এশিয়াটিক সাবজেক্টস অব গ্রেট ব্রিটেন' (১৭৯৭) গ্রন্থে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমকালীন বর্ণনা আছে। ১৭৭০ সনের নভেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিলে কলকাতা কাউন্সিল ডিরেক্টর সভাকে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের অবসানের কথা জানায়।

৭। ধীরেশ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ৫২।
৮। উইলিয়ম উইলসন হান্টার, এ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল, পৃঃ ২২, ৩৭—৪০।
৯। ফিফথ্ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৮।

(ঘ) বাণিজ্যিক স্বার্থ ঃ সমকালীন ব্যক্তিদের অনেকে কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগতব্যবসা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও অবৈধ কাজকর্মকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য অনেকাংশে দায়ী করেছেন। মুর্শিদাবাদ দরবারের বৃটিশ রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইকস্ (Francis Sykes) ও রিচার্ড বীচারকে (Richard Becher) দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থে ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'সোসাইটি ফর ট্রেড' (১৭৬৫)-কে অনেকে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেছিল। ডিরেক্টর সভার আদেশে পরের বছর আনুষ্ঠানিকভাবে 'সোসাইটি' তুলে দেওয়া হলেও নানা অছিলায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর কাজকর্ম চলেছিল এবং ১৭৬৮র পরেও কোম্পানির কর্মচারীরা এ দেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে বাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে (লবণ, সুপারি, তামাক) নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বজায় রাখে। কোম্পানির ডিরেক্টর সভার মতে কোম্পানির উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারীরা দুর্ভিক্ষের বছরে সমস্ত খাদ্যশস্যের কেনা বেচার উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁদের অবৈধ কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি।[১০] মানুষের অবর্ণনীয় দুরবস্থার সুযোগে এসব কর্মচারীরা নিজেদের অর্থলিপ্সা পূরণ করেন। ফলে, ডিরেক্টর সভার মতে, এদেশের দুর্গত জনগণের প্রতি তাঁদের কোম্পানির সদয় মনোভাব (benevolence) এবং সমবেদনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ডিরেক্টর সভা (১৭৭১-এর ২৯শে আগস্টের চিঠি) রেজা খাঁকে এ দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল দুর্ভিক্ষের বছরে রেজা খাঁ বলপ্রয়োগে মুর্শিদাবাদগামী শস্য বোঝাই নৌকাগুলি আটক করে কম দামে শস্য ক্রয় ও মজুদ করেন এবং টাকায় ৩০ থেকে ২৫ সের চাল কিনে তিনি ঐ চাল টাকায় তিন বা চার সের দরে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করেন। তাঁর এ অবৈধ ব্যবসা এবং লবণে একচেটিয়া ব্যবসার জন্যে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।[১১] সমকালীন সাহিত্য এর সাক্ষ্য বহন করছে।

"দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হ'ল রেজা খাঁর তরে।।
একচেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর।[১২]

১৭৭২ সনে ডিরেক্টর সভার নির্দেশে পাঁচটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রেজা খাঁর বিচার হয়, মন্বন্তরের সময় অবৈধভাবে খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা এবং মুনাফাবাজী অন্যতম অভিযোগ ছিল। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা জড়িত থাকায় রেজা খাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি।

ইয়ংহাজবাণ্ড (Younghusband) নামে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একজন

১০। ঐ, পৃঃ ১৯৯।
১১। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃঃ ৮৬।
১২। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃঃ ৮৬।

প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ ভদ্রলোক এই দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরাজ বণিকদের দায়ী করেছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ট্রানসাকশনস ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখছেন : 'তাহাদের মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিলো যে জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মুল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে।...চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত-করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুত হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা একচেটিয়া (ইংরাজ বণিকদের) দখলে চলিয়া গেল।......খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী, দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভুত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভমাত্র'। ইয়ংহাজবাণ্ড আরো লিখেছেন 'এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোনো অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল তাহা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনও চোখে দেখে নাই বা শুনে নাই। চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সকল আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেইখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান, চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।[১৩]

**পরোক্ষ কারণ :** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পশ্চাতের কারণগুলি নিম্নরূপ : প্রথমত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (masked system) : হেস্টিংস সমস্যার মূলে গিয়ে এর আসল চরিত্রটি উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রশাসনিক দুর্বলতা—রাজস্বের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা অথচ শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব না নেওয়া—এ দুর্ভিক্ষের প্রাথমিক কারণ বলে ধরা যেতে পারে। হেস্টিংসের ভাষায় 'want of a principle of government adequate to the substance of responsibility" বাংলার এই বিপর্যয়ের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। গভর্ণর হ্যারি ভেরেলস্ট (Harey Verelst) এদেশ থেকে বিদায় নেবার সময় যে নোট রেখে যান তাতেও এ প্রশাসনিক দুর্বলতার উল্লেখ আছে। বণিক মনোবৃত্তি নিয়ে শুধু রাজস্ব আদায় করা অথচ রাজস্ব যারা দেয় তাদের রক্ষার দায়িত্ব না নেওয়া তিনি পরস্পর বিরোধী, জাতীয় চরিত্রের ক্ষতিকর, এদেশে প্রশাসনিক উন্নতির প্রতিবন্ধক

১৩। ইয়ংহাজবান্ড ট্রানসাকশনস ইন ইণ্ডিয়া, ১৭৮৬, পৃঃ ১২৩-২৪ ; উদ্ধৃত হয়েছে—সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, ১৯৬৬ পৃঃ ১৩-১৪।

এবং প্রায় অমানবিক বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪] কলকাতায় কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটির মধ্যে বিরোধ এবং গভর্ণর জন কার্টিয়ারের (John Cartier) অপদার্থতা দুর্ভিক্ষের সময় জনগণের দুর্দশা লাঘবের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। গভর্ণর সম্পর্কে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার টি. ডি. পিয়ার্স (Pearse) লিখছেনঃ 'কার্টিয়ার মানুষ ভাল, খুব মিশুকে তবে তার চেয়ে অনুপযুক্ত। কম কর্মক্ষমতাসম্পন্ন বা দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষ আগে কেউ গভর্ণর হননি।'[১৫]

দ্বিতীয়ত, দুর্ভিক্ষের বছরে খাদ্যাভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুদ্রাভাব। বাংলার বাজারে রৌপ্য মুদ্রা সিক্কার অভাব স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রায় অচল করে তুলেছিল। মুদ্রা সংকটের সমাধান করার জন্য ক্লাইভ ও ভেরেলস্ট সোনার মোহর বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে কুড়ি ক্যারাটের সোনার মোহর (১৬ আনা ওজন) ১৪ সিক্কা টাকা দাম ধার্য হওয়ায় বাজারে সোনা রুপোর দামে আনুপাতিক হারের চেয়ে সোনার মোহরের দাম বেশি হয়েছিল। ফলে মুদ্রাসংকট কাটেনি।[১৬]

তৃতীয়ত, দ্বৈত শাসন পর্বে (১৭৬৫—৭২) বাংলার রাস্তাঘাট ও নদীপথগুলি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ভাল পথ ও পরিবহনের অভাবে দুর্ভিক্ষের সময় বাংলায় একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দ্রুত খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

চতুর্থত, প্রশাসনিক আদেশ জারি করে বাংলা ও বিহারকে পৃথক খাদ্যাঞ্চল হিসাবে গঠন করা হয়। বাংলা থেকে বিহার বা বিহার থেকে বাংলার খাদ্যশস্য আনা নেওয়া করা নিষিদ্ধ হয়। বাংলা দেশের জেলাগুলির মধ্যে খাদ্যশস্য চলাচলের উপর অনুরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। একজেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্যশস্য বহন করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। শুধু রাজধানী মুর্শিদাবাদে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। এরকম বাধা নিষেধ চালু থাকায় কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের এদেশী বেনিয়ানদের পক্ষে খাদ্যশস্যের বাজার কুক্ষিগত করা সহজ হয়েছিল।[১৭] অ্যাডাম স্মিথ তাঁর 'ওয়েলথ অব নেশনস্' (Wealth of Nations) গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে লিখছেন; 'কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে যে খরা গেল তার ফলে বড় রকমের খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার কথা: কোম্পানির কর্মচারীরা খাদ্য ব্যবসায়ীদের উপর কতকগুলি অন্যায় নিয়মরীতি এবং অবিবেচনাপ্রসূত বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে ঐ খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষে পরিণত হল।[১৮]

১৪। ফিফথ্ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ: ২১০।

১৫। ঐ, পৃ: ২০০। ('a man of good character, and amiable in the extreme but there never was a governor less capable, less active, less resolute.'

১৬। এ সময়কার মুদ্রাসংকট ও তার প্রতিকার ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনার জন্য অধ্যায় এগারো দেখুন।

১৭। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

১৮। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

পঞ্চমত, ইংরাজ সরকার দুর্ভিক্ষের শুরুতেই চাল মজুদ করতে শুরু করে দেন। চার্লস গ্রান্টের হিসাব অনুযায়ী সরকার শুধু কলকাতার সেনাবাহিনীর জন্য ৬০,০০০ মণ চাল মজুদ করেছিল। ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্যদের জন্যও কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। দুর্ভিক্ষের বছরে কলকাতায় খাদ্যশস্যের বিশেষ কোনো অভাব ছিল না।[১৯] অথচ এ খাদ্যশস্য সরবরাহ করার জন্য বাংলার মফঃস্বল অঞ্চল একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। বাংলার রাজমহল ও ভাগলপুর জেলার সমস্ত শস্য মুঙ্গেরে সেনানিবাসের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ষষ্ঠত, মুর্শিদাবাদ দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্ট স্বীকার করেছিলেন যে দুর্ভিক্ষের সময় রাজস্ব বড় বেশি কড়াকড়ি করে আদায় করা হয়েছে; এর আগে রাজস্ব আদায়ে এত বেশি কড়াকড়ি আর কখনো করা হয়নি।[২০] বাংলার নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও তাঁর অধীনস্থ আমিলরা এবং ইংরাজ সুপারভাইজররা নিজ নিজ প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বলপ্রয়োগ করে রাজস্ব আদায় করেছিলেন; দুর্ভিক্ষের সময় লোকসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়ার কথা। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এর বিপরীত ঘটনা ঘটল। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়ল। ওয়ারেন হেস্টিংস এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সরকারি প্রশাসন ও কর সংগ্রাহকরা বল প্রয়োগে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ আগের মত বজায় রেখেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় চার বছরের আদায়ীকৃত রাজস্বের হিসাব থেকে এরকম সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।[২১]

সারণী

| বাংলা বৎসর | ইংরাজী বৎসর | সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ( টাকায় ) |
|---|---|---|
| ১১৭৫ | ১৭৬৮—৬৯ | ১,৫২,৫৪,৮৫৬ |
| ১১৭৬ | ১৭৬৯—৭০ | ১,৩১.৪৯ ১৪৮ |
| ১১৭৭ | ১৭৭০—৭১ | ১.৪০,০৬,০৩০ |
| ১১৭৮ | ১৭৭১—৭২ | ১ ৫৩ ৩৩.৬৬০ |

**ফলশ্রুতি :** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপ, তীব্রতা বা ব্যাপকতা বাংলাদেশের সব জেলায় সমানভাবে অনুভূত হয়নি। এই দুর্ভিক্ষে যে জেলাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলি হল পূর্ণিয়া,[২২] নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, পাচেট ( রাণীগঞ্জ ), বর্ধমান জেলার উত্তর ও পশ্চিমভাগ, ভাগলপুর, রাজমহল, হুগলী, যশোর, মালদা ও

১৯। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরে বাংলার মফঃস্বল অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে কলকাতার সেনাবাহিনী ও অন্যান্যদের জন্য মজুদ করা হয়েছিল।
২০। রমেশ চন্দ্র দত্ত, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫১।
২১। ফিফথ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ২১০।
২২। পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও রাজমহল এসময় বাংলার মধ্যে ছিল।

চব্বিশ পরগনা। বাংলাদেশের পূর্ণিয়া জেলা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমনিতে স্বাভাবিক সময়ে এ জেলা শুষ্ক থাকত ; জলসেচের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এর উপর পর পর তিনবছর বৃষ্টি না হওয়াতে এ জেলার কৃষকরা একেবারেই শস্য পায়নি। পূর্ণিয়ার সুপারভাইজার ডুকারেলের ( G. G. Ducarel ) হিসেবে দুর্ভিক্ষের বছরে এ জেলার মোট লোক সংখ্যার অর্ধেক দুলক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল এবং পুরো একবছর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ স্থায়ী হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের বছরে নদীয়ার কৃষিকাজ বড় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ আর্থিক দুরবস্থার জন্য জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষকদের কৃষিঋণ (তাকাবি) দিতে পারেননি। অপর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হল রাজশাহী। এখানকার প্রাণহানি, চাষের ক্ষতি এবং বাণিজ্যের অবনতি সমকালীন ব্যক্তিদের নজরে পড়েছিল। বীরভূম, পাচেট ও বর্ধমানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল এমনিতে শুষ্ক। অনাবৃষ্টিতে এ অঞ্চলে হাহাকার পড়ে যায় এবং বহু প্রাণহানি ঘটে। বীরভূমে মৃত্যু ও গৃহত্যাগের ফলে বহুগ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। এই জেলার শহরগুলিতে বহুবাড়ি জনশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষে ভাগলপুর জেলার অর্ধেক লোক মারা যায় এবং তিন চতুর্থাংশ জমি জঙ্গল বা অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে। ভাগলপুর ও রাজমহলের প্রায় সব জমি সরকারের খাসে চলে আসে। কোনো ইজারাদার ভূমি-রাজস্বের ইজারা নিতে রাজী হয়নি। হুগলী, মালদা, যশোর ও চব্বিশ পরগনার শস্যহানি ও মৃত্যুর হার এত বেশি হয়েছিল যে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলিতে কৃষি ও লবণ তৈরির কাজে শ্রমিকের সরবরাহ কম হয়ে যায়। দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ, ঢাকা জেলার কিছু অংশ, মেদিনীপুর ও রংপুর জেলার কতকাংশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।[২৩] ঢাকার উত্তরাঞ্চলের কিছু নীচু এলাকা জলমগ্ন হওয়ার ফলে শস্যহানি ঘটেছিল, তবে দুভিক্ষের বছরে ঢাকা মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছিল। মেদিনীপুরে খরার সঙ্গে ছিল পঙ্গপাল বা অন্যান্য শস্যহানিকর পোকামাকড়ের উপদ্রব। মেদিনীপুরে প্রাণহানি এত বেশি হয়েছিল যে পরবর্তীকালে লবণ উৎপাদন ও অন্যান্য উৎপাদন-মূলক কাজকর্মে শ্রমি ও মজুর পাওয়া বেশ দুঃসাধ্য হত। বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কুচবিহার, ত্রিপুরা ও ঢাকার দক্ষিণাঞ্চল এই ভয়াবহ দুভিক্ষ থেকে মুক্ত ছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে দুভিক্ষের কবলে না পড়লেও সারা বাংলাদেশে ব্যাপক খাদ্যাভাব থাকায় এ সমস্ত জেলা থেকে ক্রমাগত খাদ্যশস্য রপ্তানির ফলে এ অঞ্চলের লোকজন কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলা চলে।

**প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সরকারি কর্তৃপক্ষ বাংলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষকে রক্ষার জন্যে গৃহীত সব ব্যবস্থা সমকালীন ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজদের চোখে অমানবিকভাবে অপ্রতুল (inhumanly inadequate)[২৪] ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ দুর্ভিক্ষের

২৩। এন. কে. সিংহ সম্পা ঃ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮।
২৪। এন. কে. সিংহ সম্পা ঃ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮ ।

মোকাবিলার জন্যে সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি; কিন্তু কাউন্সিলের মতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিয়েছিল।[২৫] ১৭৬৯ সনের ২৩শে নভেম্বর কলকাতা কাউন্সিল ডিরেক্টর সভাকে লিখছেন; 'এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে বিপন্ন বাংলার মানুষের ত্রাণের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আমাদের সাধ্যমত ব্যবস্থা নেব। ( We have taken and shall pursue every means in our power to relieve the miserable situation the poor inhabitants must be involved in from this dreadful calamity )। ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ত্রাণের জন্য বাংলার নবাব সরকার ও ইংরাজ কোম্পানি যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছিল সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) দুর্ভিক্ষ ত্রাণে সাহায্য ও খাদ্য বিতরণ, (খ) ভূমিরাজস্ব আদায় স্থগিত ও মকুব, (গ) কৃষি ঋণ ( তাকাবি ) দেওয়ার ব্যবস্থা।[২৬]

(ক) উইলিয়ম হান্টারের হিসেব অনুযায়ী সারা বাংলা ও বিহারের তিনকোটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ত্রাণের জন্যে সরকার মাত্র নব্বই হাজার টাকা খরচ করেছিল। নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁয়ের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য মুর্শিদাবাদে যে তহবিল গঠন করা হয়েছিল তাতে কোম্পানি ৪০,০০০, নবাব মুবারক-উদদৌলা ২৬,৮৯৩, রেজা খাঁ স্বয়ং ১৯,৬০৭, রায় দুর্লভ ৬,০০০ এবং জগৎশেঠ ৬,৩৭৫ টাকা দান করেছিলেন। এ টাকা অপ্রতুল মনে হওয়ায় আরো ৬৫,১৯৩ টাকা দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ব্যয় করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এর পরিমাণ হল ১,৫২,৪৪৩ টাকা। তিনকোটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ত্রাণের জন্য এ টাকা কোনমতেই যথেষ্ট বলা যায় না। রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে বুভুক্ষু মানুষকে খাওয়ানোর জন্যে এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য সাতটি কেন্দ্র খুলেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে মাথাপিছু একসের চাল বিতরণ করা হত। মুর্শিদাবাদ শহরে দৈনিক সাত হাজার লোক সরকারি লঙ্গরখানায় আহার পেত।[২৭] ঠিক একই ভাবে ত্রাণ বিতরণ ও ক্ষুধার্তদের বাচানোর জন পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজমহল, বীরভূম ও হুগলীতে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। বাংলার ধনীদের অনেকে এবং জমিদারদের কেউ কেউ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের সাহায্য করেছিলেন। গোপীমণ্ডল নামে দিনাজপুরের এক ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের সময় গরীবদের খাওয়ানোর জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করেছিলেন।[২৮] দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্ট বাংলার অভিজাতদের দাতব্য কাজকর্মের প্রশংসা করেছিলেন। বিহার অঞ্চলে নায়েব দেওয়ান সীতাব রায় দুর্গত মানুষদের খাওয়ানোর ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। বেনারস থেকে সস্তায় চাল আনিয়ে ৩০,০০০ টাকার চাল তিনি ক্ষুধার্ত মানুষদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।

২৫। লেটার টু কোর্ট, ২৩ নভেম্বর ১৭৬৯।
২৬। এ. সি. ব্যানার্জী, ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।
২৭। এন. জি. চৌধুরী, কার্টিয়ার, পৃঃ ৬১।
২৮। এন. কে. সিংহ, ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬।

বিহারে খাদ্য বিতরণ ও ত্রাণব্যবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল হয়েছিল।[২৯] দুর্ভিক্ষের বছরে ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকরাও ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয় মানুষদের অনেককে খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিহারে তারা সীতাব রায়ের ত্রাণ ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিলেন।

(খ) দুর্ভিক্ষের বছরে (১৭৬৯—৭০) কোম্পানি ৮,০৩, ৩২১ টাকার ভূমিরাজস্ব মকুব করেছিল। এ টাকা ঐ বছর মোট সংগৃহীত ভূমিরাজস্বের ৬ শতাংশ। ১৭৭০—৭১ সনে ১৫, ০৮, ০৩২ টাকার ভূমিরাজস্ব বা মোট রাজস্বের প্রায় ১১ শতাংশ মকুব করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে মকুব করা রাজস্বের পরিমাণ আরো বেশি। বীরভূম জেলায় যে ভূমিরাজস্ব মকুব করা হয়েছিল তাঁর পরিমাণ হল ঐ জেলার মোট ভূমিরাজস্বের প্রায় ৪৫ শতাংশ। পূর্ণিয়া জেলায় ৬½ শতাংশ এবং রাজমহলে ২৮ শতাংশ রাজস্ব মকুব করা হয়েছিল।[৩০] হান্টার সাহেবের হিসাবমত দুর্ভিক্ষের বছরে মাত্র ৫ শতাংশ ভূমিরাজস্ব মকুব করা হয়েছিল ; পরের বছর ভূমিরাজস্ব ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া হয়।[৩১] হান্টার সাহেব আরো লিখছেন 'বস্তুতপক্ষে এক লক্ষেরও কম টাকা বা ৮২১৮ পাউন্ড মকুব করা হয়েছিল। পরের বছরের শুরুতে তাও শোধ দিতে হয়।' সুতরাং একথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে কোম্পানির ভূমিরাজস্ব মকুব করার ফলে বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক বা কৃষির কোন রকম সুবিধা হয়নি। মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষের বছরে রাজস্ব মকুব করার প্রথা ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সে প্রথা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

(গ) কোম্পানি দুর্ভিক্ষের বছরে (১৭৬৯-৭০) চাষের ব্যবস্থা করার জন্য টাকায় দু আনা বা ১২½ % শতাংশ কৃষকদের অগ্রিম কৃষিঋণ (তাকাবি) দিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে বাংলার এগারোটি জেলার জন্য মোট ২,৭৬,৫৪৭ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছয়টি জেলা নিম্নলিখিত হারে তাকাবি পেয়েছিল। বীরভূম ২০,০০০, রাজশাহী ৫০,০০০, নদীয়া ৩০,০০০, দিনাজপুর ৪৫,০০০, পূর্ণিয়া ৬৯,০৪৭ এবং রংপুর ৩৫,০০০ টাকা। বিহারে মোট ১,০৬,৪৮৯ টাকার কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল। বাংলার বিপর্যস্ত কৃষি ও কৃষকের প্রয়োজনের অনুপাতে এ টাকার পরিমাণ যে খুবই সামান্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সময়ে বাংলার জমিদারদের অনেকের আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। সেজন্য তাঁরা কৃষকদের তাকাবি দিতে পারেনি। আর সরকারের দেওয়া কৃষিঋণের সবটাই কৃষকদের হাতে পৌঁছেছিল বলে মনে হয় না। নদীয়ার সুপারভাইজার জে, রাইডার (J. Rider) মুর্শিদাবাদ কাউন্সিলকে জানিয়েছিলেন যে নদীয়ার জমিদার তাকাবির টাকা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেননি। রাজশাহীর কৃষকরাও তাকাবির পুরোটাকা পায়নি বলে বাফটন রাউস (Boughton Rous) কাউন্সিলকে

২৯। গোলাম হোসেন, সিয়ার ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬-৫৭।
৩০। এন. কি চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ৬৪—৬৫।
৩১। উ. উ. হান্টার, দি এ্যানালস..., পৃঃ ৩৭—৪০।

জানিয়েছিলেন।[৩২]

**ফলশ্রুতিঃ** ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতির উপর গভীর ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার এক কোটি লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারানোর ফলে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল বা অনাবাদী হয়ে যায়। ফলে কৃষিউৎপাদন হ্রাস ও খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

(ক) **বিপর্যস্ত সামন্ততন্ত্রঃ** হান্টার সাহেবের মতে বাংলার অভিজাতদের দুই-তৃতীয়াংশের অবক্ষয় বা ধ্বংস ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু হয়। ১৭৭৫ সনে হেস্টিংস বাংলার জমিদারদের সম্পর্কে লিখছেনঃ 'বাংলার জমিদারদের কেউই অবস্থাপন্ন নন। তাদের জমিদারি বিক্রি ছাড়া আর কোনোভাবেই তাদের কাছে পাওনা বকেয়া টাকা আদায় করার পথ নেই।'[৩৩] নাটোরের রানী ভবানী নিয়মিত রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁর জমিদারি কেড়ে নেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হয়। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খাজনা দিতে না পারায় তাঁর জমিদারি কেড়ে নিয়ে তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা সময়মত সরকারি রাজস্ব জমা দিতে না পারায় কারারুদ্ধ হন। অনেক ইজারাদার সময়মত রাজস্ব দিতে না পারায় ইজারা পান নি। বর্ধমানের রাজা সোনারুপোর তৈজসপত্র বিক্রি করে এবং সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন।[৩৪] কোম্পানি ঠিক এরকম সময়ে বর্ধিত রাজস্বের ভিত্তিতে (রসদ) নিলামে চড়িয়ে উচ্চহারে পাঁচবছরের জন্য ভূমি-রাজস্বের নতুন বন্দোবস্ত করল (১৭৭২)। ১৭৭০-৭১ সনে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ও খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য দেখে জমিদার ইজারাদাররা উচ্চহারে জমির বন্দোবস্ত নিলেন। অল্পকাল পরেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন।

(খ) **কৃষিঃ** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ায় জমি ও কৃষকের আনুপাতিক হারে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে যায়। এ সময় বাংলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেশি আর চাষ করার লোকের সংখ্যা কম। এর ফলে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্বল্পকালস্থায়ী পরিবর্তন আসে। লোকের অভাবে দুর্ভিক্ষের পরেও অনেকজমি ক্রমাগত অনাবাদী বা জঙ্গলে পরিণত হতে থাকে। ১৭৭৬ সনেও বাংলার মোট কৃষিজমির অর্ধেকেরও বেশি অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে। জমির চাহিদা কমে আসায় ভূমি রাজস্বের হারও কমতে থাকে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাইকস্ত রায়তরা (অস্থায়ী রায়ত) সুবিধালাভ করে। জমিদাররা সুবিধাজনক শর্তে কম রাজস্বহারে এদের জমি চাষ করতে দেয়। অপরদিকে খোদকস্ত রায়তদের অধিকার ও দায়িত্ব স্থায়ী হওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্বের হার তৎকালীন বাজার অনুযায়ী বেশি দাঁড়ায়। তারা অনেকে নিজেদের জোত ছেড়ে

৩২। এন. জি. চৌধরী ঐ, পৃঃ ৬৭।
৩৩। ফিফথ্ রিপোর্ট ১ম খণ্ড. ভূমিকা পৃঃ ২১৯।
৩৪। হাণ্টার, ঐ, পৃঃ ৫৭।

অন্যত্র অল্পহারে ভূমি বন্দোবস্ত নিতে শুরু করে। খোদকস্ত রায়তদের পাইকস্ত হওয়ার পেছনে আরো একটি আর্থিক কারণ ছিল। সরকার মন্বন্তরের পরে নাজাই (najai) কর ধার্য করে যারা মারা গেল বা পালিয়ে গেল তাদের দেয় রাজস্ব জীবিতদের উপর চাপিয়েছিল। এ করের চাপটাও পড়ল খোদকস্ত রায়তদের উপর। এভাবে অনেক খোদকস্ত রায়ত স্বেচ্ছায় পাইকস্ত রায়তে পরিণত হল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর পাইকস্ত রায়তদের প্রাধান্য বাংলার কৃষি অর্থনীতির নতুন বৈশিষ্ট্য। আর প্রকৃতি যতদিন না শূন্যতা পূরণ করেছিল ততদিন পর্যন্ত জমির জন্য কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়নি।

(গ) **শিল্পে বিপর্যয়ঃ**—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার শিল্প পণ্য উৎপাদকদের একাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এরা হল বাংলার তাঁতি, রেশম শিল্পী, গুটি পোকার পালক, সোনা প্রস্তুতকারক, নুণের মজুর, লবণ উৎপাদক মালঙ্গি প্রভৃতি। নৌকামাঝি, গাড়ির চালক ও অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদের অনেকে প্রাণ হারায়। ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্প উৎপাদন অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলিতে রেশম ও বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে এসবের দামও বৃদ্ধি পায়। বাংলার খাদ্যশস্য ও শ্রমের দাম বাড়ে। এর ফলে বাংলাদেশে উৎপন্ন অন্যান্য ভোগ্য পণ্যেরও (চিনি, লবণ, চাল, তেল, সুপারি, পান, তামাক ইত্যাদি) দাম বেড়ে যায়। বিশাল সংখ্যক কুশলী কারিগরের মৃত্যু হওয়ার জন্যে বাংলার শিল্প পণ্যের গুণগতমানে অবনমন লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী কোম্পানির কাগজপত্রে এ যুগে বাংলায় উৎপন্ন পণ্যের গুণগতমানের ক্রমশ নিম্নগামী হওয়ার কথা আছে।

**সামাজিকঃ**—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সবচেয়ে বড় সামাজিক কুফল হল বাংলায় প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থা এসময় ভেঙ্গে পড়ে। বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে দস্যুবৃত্তি ও দলবদ্ধভাবে লুঠের ঘটনা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। কোচবিহার, ত্রিহুত ও মোরাং অঞ্চল থেকে দলবদ্ধ সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুরা বাংলার উত্তরাঞ্চলে নতুন গজিয়ে ওঠা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে দস্যুবৃত্তি করতে থাকে। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতেও এরা হানা দিয়েছিল।[৩৫] উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা অনেকে এই দস্যুদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুঠতরাজ করে বেড়াত। কোনো কোনো অঞ্চলে ডাকাতি ও লুঠতরাজ কৃষকবিদ্রোহের রূপ নেয়। দিনাজপুর, পুর্ণিয়া, বর্ধমান, হুগলী ও যশোর জেলায় লুঠতরাজের প্রকোপ বেশি ছিল। গ্রামের পাইক ও থানাদাররা এদের বাধা দিতে পারেনি। ওয়ারেন হেস্টিংসকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এ সমস্ত দস্যুদল দমন করতে হয়।

মন্বন্তর বাংলার সমাজ জীবনধারাকেই শুধু আঘাত করেনি, বিভিন্ন অঞ্চলে

৩৫। এ সময়কার বীরভূম অঞ্চলের সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ কাহিনী নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচিত হয়।

প্রচলিত ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা ও সংহতি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ভাগলপুর ও রাজমহলের লোকেরা উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্যান্বেষণে পালিলে যায়। দুর্ভিক্ষ-অন্তে যখন তারা স্বগ্রামে ফিরে আসে তখন পাহাড়ীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটানোর জন্য তাদের জাত যায়।[৩৬] এরা তখন দস্যুবৃত্তি পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৭৭১ সনে রাজসাহীর সুপারভাইজর লিখছেন: 'অনেক কৃষক যারা এতদিন প্রতিবেশীদের কাছে সৎ বলে পরিচিত ছিল তারাও জীবনধারণের জন্যে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছে।' দুর্ভিক্ষ বাংলার সৎ ও ভদ্র মানুষদের অসৎ ও অন্যায় পথে জীবনধারণে প্ররোচিত করেছিল। বাংলার পারিবারিক জীবনেও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার পারিবারিক জীবন দ্রুত ভাঙতে শুরু করে। পুত্রকন্যা বিক্রয়, পত্নীত্যাগ ও আত্মবিক্রয়ের ঘটনা দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে অনেক বেড়ে যায়। দাস বিক্রি এমন পর্যায়ে গেল যে বাজারে শুধু বিক্রেতাদের ভিড় ক্রেতা বা খরিদ্দার পাওয়া গেল না। 'পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে'—সমকালীন বিপর্যস্ত পারিবারিক তথা মানবিক সম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছে।

**ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি:**—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোম্পানির শাসনের উপর দু রকমের প্রভাব রেখেছিল —(১) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ও (২) ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রথমত. ১৭৭১ সনের ২৯শে আগস্টের চিঠিতে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁর কার্যাবলীর নিন্দা করে তাঁর শাসনের অবসান ঘটায় এবং কোম্পানির হাতে ভূমিরাজস্বসহ সমস্ত শাসন ক্ষমতা নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে (to stand forth as Duan, and, by the agency of the Company's servants, to take upon themselves the entire care and management of revenues)। দ্বিতীয়ত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার কৃষি অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার জন্য, বিশেষকরে অনাবাদী জমি চাষে আনা এবং বাংলার নব্য ধনীদের জমিতে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন।

৩৬। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৩।

# ৫

# শিল্প

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সম্পদ ও সমৃদ্ধি শুধু কৃষিনির্ভর ছিল না। এর পাশাপাশি বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্প ও শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিল্প বাঙ্গালীর দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা এবং বিভিন্ন শিল্পে উৎপন্ন পণ্য এযুগে বাংলার জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

আলোচনার সুবিধার জন্যে এ যুগের বাংলার শিল্পগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) বয়ন শিল্প—সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চট, কার্পেট, গালিচা, দুলিচা, শীতলপাটি, মাদুর ইত্যাদি ; (খ) রেশম শিল্প, (গ) লবণ, (ঘ) চিনি, (ঙ) কাগজ, লোহা, নীল ও সোরা, (চ) অন্যান্য শিল্প—নৌকা নির্মাণ, শাঁখা ও পিতল কাঁসার কাজ, সোনা রূপো, হাতির দাঁত, কাঠের কাজ ইত্যাদি।

বাংলার শিল্পোৎপাদনে এ সময়ে তিন ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল। (ক) হস্তশিল্পী নিজের মূলধনে স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদন করত এবং উৎপন্ন পণ্য নিজের পছন্দ মত দামে বাজারে বিক্রি করত। এ ব্যবস্থাকে অর্থনীতিবিদ্‌রা হস্তশিল্প ব্যবস্থায় উৎপাদন (handicraft system of production) বলে অভিহিত করেছেন। (খ) কুটির শিল্প ব্যবস্থায় উৎপাদন (domestic system of production)। এ ব্যবস্থায় কারিগর বণিক, মহাজন বা দালালদের কাছ থেকে মূলধন আগাম নিত এবং নির্দিষ্ট দামে ও নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য যোগান দিত। এ ব্যবস্থা দাদ্‌নি ব্যবস্থা (dadni system) নামেও পরিচিত। (গ) ইউরোপীয় বা এদেশীয় বণিক বা মহাজনের বাড়িতে বা ফ্যাক্টরিতে দলবদ্ধভাবে পণ্যোৎপাদন করা (factory system of production)। এ ব্যবস্থায় মূলধন, কাঁচামাল ও উৎপাদনের সাজ সরঞ্জাম বণিক, মহাজন বা ফ্যাক্টরি মালিক সরবরাহ করত। এ ব্যবস্থায় উৎপাদকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হত এবং পারিশ্রমিকও কম পেত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার শিল্প জগতে বয়ন শিল্প নিঃসন্দেহে সম্মানের স্থানটির অধিকারী ছিল। বয়ন শিল্পের আবার তিনটি বিভাগ—সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চট ও অন্যান্য। বয়ন শিল্পের এই তিন বিভাগের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মোটা বস্ত্র উৎপাদন প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছাড়া নানাধরনের রেশমবস্ত্র ও রুমাল, চটের কাপড়, নানাপ্রকার গালিচা, শতরঞ্চি, মাদুর ও শীতলপাটি বাংলাদেশে বয়ন করা হত।

**বস্ত্র শিল্প ঃ**—অবশ্য বস্ত্র শিল্পই আঠারো শতকে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে প্রধান স্থানাধিকারী। এর উৎপাদনের পরিমাণ বিশাল যদিও মূলত এটি একটি কুটির শিল্প। এ যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বস্ত্রশিল্পের প্রভাব অসামান্য। বাংলা যে

পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করত তাতে তার জনগণের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর উদ্বৃত্ত হত। উদ্বৃত্ত বস্ত্রের সমস্তটাই বিদেশে রপ্তানি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশে বাংলার বস্ত্রের চাহিদা এ দেশে বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতির কারণ। রবার্ট ওরমে লিখেছেন বাংলার প্রতিটি গ্রামের পুরুষ, নারী ও শিশুরা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকত। এযুগের পর্যটকদের বিবরণেও দেখা যায় বাংলাদেশে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়ালেই চোখে পড়ত গ্রামের লোক—পুরুষ, নারী, শিশু নির্বিশেষে—সুতো কাটা বা বয়নে নিযুক্ত।

বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পে ঢাকার স্থান সর্বাগ্রে। বিভিন্ন ধরনের সুতী ও সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র তৈরিতে ঢাকা এ সময়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল।[১] এ যুগে ঢাকায় মস্‌লিনের বিশাল ব্যবসা। উইলিয়ম বোল্টস্ লিখেছেন নবাবী আমলে বাংলার তাঁতীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মূলধনে বস্ত্র তৈরি করত এবং প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে নিজেদের পছন্দমত দামে পণ্য বিক্রি করত। ইংরাজ বণিকরা নিজেদের কুঠিতে বসে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনত। ঢাকাতে একদিনে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ৮০০ মস্‌লিন কিনেছিলেন।[২] ঢাকা মস্‌লিনের বেশিরভাগ ইউরোপে রপ্তানি করা হত। ঢাকার উৎকৃষ্ট মস্‌লিনের দামও পড়ত বেশ বেশি। মোহাম্মদ রেজা খাঁয়ের সময়ে (১৭৬৫-৭২) ঢাকার একখানি উৎকৃষ্ট মস্‌লিনের দাম পড়ত সাড়ে চারশ টাকা। 'রিয়াজে'র গ্রন্থকার গোলাম হোসেন সলিম জানিয়েছেন ঢাকায় সাদা মস্‌লিন সবচেয়ে ভাল তৈরি হত। ঢাকা জেলার প্রায় সব গ্রামেই বস্ত্র বয়ন শিল্প চালু ছিল। এরমধ্যে ঢাকাশহর, সোনার গাঁ, দুমরা, তিতবাড়ি, জঙ্গলবাড়ি ও বাজেদপুরে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বানানো হত। ঢাকার কালোকোপা, জালালপুর, নারায়ণপুর ও ত্রিপুরার শ্রীরামপুরে মোটাকাপড় উৎপন্ন হত। ঢাকায় তাঁতে সব ধরনের বস্ত্রই তৈরি হত। মিহি গোসামীর মস্‌লিন থেকে রাজকন্যাদের পরিধেয় অতিমিহি মস্‌লিন এখানে পাওয়া যেত। ঢাকার তাঁতে শুধু মস্‌লিন নয় গরীব কৃষকদের পরিধেয় মোটাবস্ত্রও অঢেল পরিমাণে তৈরি করা হত। ঢাকার মস্‌লিনের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাসের মন্তব্যটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ: 'এখানে যে সুন্দর মস্‌লিন উৎপন্ন হয় তাঁর কুড়ি গজ বা তার বেশি পরিমাণ সহজেই একটি সাধারণ পকেট তামাক কৌটায় ভরা যায়।' সামান্য, অসম্পূর্ণ দেশী হাতিয়ার নিয়ে ঢাকার তাঁতীরা অতিমিহি মস্‌লিন তৈরি করত যা দেখে ইউরোপীয়রা অবাক হতেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকা থেকে সরবতী, মলমল, অলবলি, তাঞ্জীব, তোরন্দাম, নয়নসুখ, দুরিয়া, জামদানী প্রভৃতি মস্‌লিন সংগ্রহ করেছিল। চট্টগ্রাম থেকে কোম্পানি মোটা সুতীবস্ত্র সংগ্রহ করত; এখানে মিহি বস্ত্র পাওয়া যেত না।

১। আবদুল করিম, ঢাকাই মস্‌লিন।
২। এন. কে. সিংহ, দি ইকনমিক হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।

সুতো অনুযায়ী মস্‌লিনকে চারভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ (ordinary), সূক্ষ্ম (fine), অতিসূক্ষ্ম (superfine) এবং অতিমিহি (fine superfine)। এগুলি সাদা; দাগটানা, নানারকম কাজ, ছাপ ও রঙের হত। বস্ত্রের উপর নানারকম কাজের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা খ্যাতিলাভ করেছিল। ঢাকাতে নানারকম বস্ত্রে ফুলের কাজ ও এম্ব্রয়ডারি কাজ হত। বস্ত্রের উপর সোনারুপো ও রেশমের এম্ব্রয়ডারি কাজও হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এজন্য বহু নারী শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। হাতের কাজের জন্য কোম্পানির অন্যান্য ফ্যাক্টরি থেকে ঢাকায় বস্ত্র পাঠানো হত। রুমাল ও মস্‌লিনের উপর হাতের কাজ বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলার হাতের কাজের কদর বাড়িয়েছিল।[৩]

বাংলার মহিলারা বাংলার বস্ত্র বয়ন শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। হাতের কাজ ছাড়াও বাংলার তাঁতের প্রয়োজনীয় সুতোর বেশিরভাগ মহিলারাই সরবরাহ করত। চরকা ও লাট্টুতে গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুতো কাটা চলত। এজন্য তাঁতীরা অগ্রিম টাকা দিত বা তুলো সরবরাহ করত। একজন দক্ষ ও পরিশ্রমী মহিলা একমাসে মিহি সুতো কেটে তিনটাকা পর্যন্ত রোজগার করত। সাধারণত বারো আনা-চোদ্দ আনা থেকে দুটাকা তাদের মাসিক আয় দাঁড়াত।[৪] অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ আয়টাও নেহাত কম নয়। ঐ সময়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জীবনধারণের মাসিক খরচ ছিল একটাকা।

বাংলাদেশ সমস্ত ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করত—মোটা সুতীবস্ত্র থেকে সূক্ষ্ম মস্‌লিন ও রেশম বস্ত্র। এশিয়া ও ইউরোপে বাংলা বস্ত্রের চাহিদাও ছিল ক্রমবর্ধমান। এর প্রধান কারণ হল বাংলার বস্ত্র গুণগতমানে উন্নত আর দামে সস্তা। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হেনরি পাত্‌লো মন্তব্য করেছিলেন যে বস্ত্রশিল্পে 'পৃথিবীর আর কোনো দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে না বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাকে হারাতে পারবে না।' এ বস্ত্র বয়ন শিল্প এযুগে সারা দেশ জুড়ে ছিল। এক এক জেলায় বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপন্ন হত। নাটোরের জমিদারির মধ্যে মালদা হরিয়াল, শেরপুর, বালিকুশি ও কগমারিতে তাঁতিরা বিভিন্ন উন্নত ধরনের বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। ইউরোপীয় বাজারের জন্যে এখান থেকে পাওয়া যেত খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতালি, সুসিজ ও শির সূচী শ্রেণীর সূক্ষ্ম বস্ত্র। বসরা (ইরাক), মোখা (ইয়েমেন), জেদ্দা (আরব), পেগু (বার্মা), অচিন (সুমাত্রা) ও মালাক্কার (মালয়েশিয়া) জন্য এখান থেকে সংগৃহীত হত কোসা বা

৩। কে. কে. দত্ত, স্টাডিজ ইন দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল সুবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৭ i

৪। এন. কে. সিংহ, ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৪। "চরকা মোর ভাতার পুত চরকা মোর নাতি। চরকার কল্যাণে মোর দ্বারে বাঁধা হাতি॥" সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃঃ ৮৭।

খাসা, বাফতা; সনুজ, মলমল, তাঞ্জীব ও কেঞ্চিম প্রভৃতি জাতের উন্নত বস্ত্র।[৫]

ঘোড়াঘাট ও রংপুরের আড়ঙগুলি সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র সানোজ, মলমল ও তাঞ্জীব সরবরাহ করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানি এ অঞ্চল থেকে এ ধরনের বস্ত্র সংগ্রহ করত। বর্ধমানের রাজার অধীনে খিরপাই, রাধানগর ও দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল। গ্রোস লিখেছেন 'রাধানগর সুতীবস্ত্র, রেশমী রুমাল ও উড়ুনীর জন্য বিখ্যাত'। এ অঞ্চলে প্রধানত তৈরি হত বিভিন্ন ধরনের সুতীবস্ত্র। এগুলির মধ্যে বিশেষকরে উল্লেখযোগ্য হল দুরিয়া, তেরেন্দাম, কুট্টানি, সুসি, সুতী রুমাল, গুরা, সেস্টার সয়িস, সান্টন কুপিস, চুড়িদারি, কুন্টা ও দুসুতা। এ জেলার অপেক্ষাকৃত কমনামী অনেকগুলি জায়গায় নীচুমানের অনেক মোটা বস্ত্র উৎপন্ন হত। এগুলি শিরবান্দ (পাগড়ীর বস্ত্র), গুলাবান্দ (গলাবন্ধ) প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় প্রচুর পরিমাণে সুতী ও রেশমী বস্ত্র কিনত। বীরভূমের ইলামবাজার থেকে কেম্পানির জন্য গুরা জাতীয় বস্ত্র কেনা হত। মেদিনীপুরে বিভিন্ন ধরনের মস্‌লিন ও সুতীবস্ত্র পাওয়া যেত। রেশম ও সুতীর মিশ্র বস্ত্রও এখানে উৎপন্ন হত। কলকাতার কাছে ওলন্দাজ কুঠি বরানগরে মোটা নীল রুমাল তৈরি হত। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন ধরনের সুতী ও রেশমীবস্ত্রের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির মধ্যে শান্তিপুর, বরণ প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানির জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপন্ন হত।[৬]

**অন্যান্য বয়ন শিল্প :**—এ যুগে বাংলায় কার্পেট, শতরঞ্চি, দুলিচা, গালিচা, মাদুর, শীতলপাটি প্রভৃতি বানানো হত বলে সমসাময়িক সাহিত্যে উল্লেখ আছে। বিজয় রাম 'তীর্থমঙ্গলে' বাংলার বিভিন্ন স্থানে শতরঞ্চি, দুলিচা, গালিচা তৈরি হত, বলে জানিয়েছেন। 'আইন-ই-আকবরীতে' বাংলা চটের উল্লেখ আছে! বাংলায় তাঁতে চট বোনা হত। চট থেকে ব্যাগ ও কার্পেট হত। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি পণ্য তালিকায় গানির উল্লেখ আছে। 'হাদিকাৎ-উল-আকালিম' গ্রন্থের লেখক ঘোড়াঘাট (রংপুর) অঞ্চলে চটের কার্পেট বোনা হত বলে জানিয়েছেন। সুজনরায়ের 'খুলসাতে' বাংলার শীতলপাটির কথা আছে। এ পণ্যগুলির বেশির ভাগ বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। বাংলার বাইরে চট ও চটজাত দ্রব্যের তেমন বাজার ছিল না ; সেজন্য রপ্তানি কম হত।

মোহাম্মদ রেজা খাঁ ও উইলিয়ম বোল্টস্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে নবাবী আমলে বাংলার 'শিল্পী ও কারিগর তাদের খুশীমত পণ্য উৎপাদন করত এবং নিজেদের পছন্দমত দামে, উৎপন্ন পণ্য বিক্রি করত। বাংলা সরকার তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও বাজারে স্বাধীনতা ছিল। শিল্পী ও কারিগর স্বাধীনভাবে উৎপাদন করত ও উৎপন্ন পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে বিক্রিও করতে পারত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার নবাবরা শিল্পোৎপাদনে ও অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাধীনতা

৫। জে. জেড. হলওয়েল, ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস্, ১ম অংশ, পৃ: ১৯৪।
৬। জে. গ্রোস, ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।

বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এরকম স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও এ যুগে বাংলার তাঁতীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন দেখা যায় না। বরং বলা যায় ওরা ছিল বেশ গরীব। রবার্ট ওরমেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহাজন, দালাল ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা ওরা নিগৃহীত ও শোষিত হত।

পলাশী-পরবর্তীকালে বাংলার তন্তুজ পণ্যের চাহিদা ও দাম বাড়ে আর সেই সঙ্গে তাঁতীদের আয়ও অনেকখানি বেড়ে যায়। এযুগে একজন অকুশলী তাঁতী মাসে তিনটাকা, একজন মাঝারি ধরনের দক্ষ তাঁতী পাঁচ টাকা ও একজন দক্ষ তাঁতী সাড়ে সাত টাকা পর্যন্ত রোজগার করত।[৭] তবুও বেশিরভাগ তাঁতী দুঃস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হয়ে জীবন কাটাত। বাংলার তাঁতীদের সম্পর্কে সমকালীন বিদেশীদের সাক্ষ্য হল এর পরিশ্রমী, দক্ষ, শান্ত ও নিরীহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী জন বেব ( J. Bebb ) বাংলার তাঁতীদের সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করেছেন ( I am astonished at their passiveness )। কোম্পানি আমলে বাংলার তাঁতীরা একচেটিয়া বাণিজ্যের শিকার হয়। ফলে বাংলার তাঁতীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও শোষণ চলত।

(ক) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে বস্ত্র কিনে তাঁতীদের বাজার দাম থেকে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ দাম কম দিত।[৮] কোম্পানি তার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করতে দেয়নি। নিজের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছিল।

(খ) কোম্পানির গোমস্তা, দালাল, পাইকার, জাচনদার ( কাপড়ের গুণগতমান নির্ণয়কারী ), তাগাদার তাঁতীদের কাছ থেকে দস্তুরি, দালালি, বাট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে কমিশন আদায় করত। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই এই কমিশনের ভাগ নিতেন ; সেজন্য এ অন্যায় প্রথা তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিশ তাঁতীদের স্বার্থরক্ষায় একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তবুও এ কুপ্রথা একেবারে বন্ধ হয়নি।

(গ) কোম্পানির কর্মচারীরা উঁচু মানের কাপড়ের নীচু মান ধার্য করে তাঁতীদের ফাঁকি দিত এবং নিজেরা লাভবান হত। কার্টিয়ার ঢাকায় থাকাকালীন ৩·৩ শতাংশ বাট্টা ও দালালি হিসাবে নিয়েছিলেন। কটরেল ( Cottrell ) ঢাকার তাঁতীদের কাছ থেকে ১৭৮১-৮২ সনে ৬৯,৮৩০ টাকা আদায় করেছিলেন।

(ঘ) ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁর তাঁতীরা এরকম আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত। ফলে এদের উপর দৈহিক নির্যাতন চলত ; মাঝে মাঝে তাদের কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থাও ছিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা প্রতিবাদ করায় তাদের নেতাদের বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল

৭। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১ ও ১৭৬।
৮। উইলিয়ম বোল্টস্, কনসিডারেশনস্ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স, পৃঃ ১৯৩।

হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিভিন্ন স্থানে তাঁতীদের সংখ্যা হ্রাস। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার তিতবাড়িতে ৯০০ ঘর তাঁতী বাস করত ; ১৭৮৮ সনে তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র ৫০০ ঘর।[১]

**রেশম শিল্প ঃ** গ্রোস লিখছেন কাশিমবাজারের চারপাশের জমি উর্বর ও লোকজন খুব পরিশ্রমী। এরা সারাবছর নানারকম শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। সাধারণত এখানকার লোকেরা বছরে ২২,০০০ বেল (এক বেল সমান একশ পাউণ্ড) রেশম উৎপাদন করে। স্ট্যাভোরিনাসও অনুরূপ বর্ণনা রেখে গেছেন। রেনেল সাহেবের মতে এসময়কার কাশিমবাজার বাংলার রেশমের সবচেয়ে বড় সাধারণ বাজার। এখানে আগত বিপুল পরিমাণ রেশম বাংলাদেশ সারা এশিয়াতে রপ্তানি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করত। গুজরাটের রেশম শিল্পীরা বাংলার রেশম সুতো ও কাঁচারেশমের উপর অনেকখানি নির্ভর করত। এ রেশমের তিন থেকে চারলক্ষ পাউণ্ড ইউরোপের বয়ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যে রপ্তানি করা হত। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণভারত, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর, নাগপুর, লাহোর ও মুলতান পত্তিতে বাংলার রেশম সরবরাহ করা হত।

বাংলার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, রাজশাহী, রংপুর, রাঙামাটি (বর্তমানে আসাম), বীরভূম ও মেদিনীপুরে রেশমের চাষ ছিল। তিনধরনের গুটি পোকা থেকে বাংলার রেশম সংগ্রহ করা হত। বড় পালু (Bombyx textor), দেশিপালু (Bombyx fortunatus) এবং নিস্তারি (Bombyx Craesi)। তুঁতে, শাল ও আসন প্রভৃতি গাছে গুটি পোকা পালন করা হত। অবশ্য বেশিরভাগ রেশম তুঁতে গাছ থেকে আসত। চাষীরা তুঁতে গাছের চাষ করার পর চসার (Chassar) নামক মজুররা গুটি পোকা লাগাত ও পালন করত। নাকদ (Nacaud) নামক কারিগর গুটি পোকা জলে সিদ্ধ করে সুতো বার করা ও সুতো তোলার কাজ করত। অনেক সময় চসাররা তুঁতে চাষ ও পোকা পালন দুকাজই করত। রেশম সুতো বানানোর এদেশীয় পদ্ধতি খুব উন্নত ধরনের ছিল না। সুতা কর্কশ ও অসমান হত এবং মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যেত। দুই, তিন বা চার পর্দার সুতোও উঠত। তার ফলে এ সুতো দিয়ে সুক্ষ্ম রেশমবস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হত না। পলাশী যুদ্ধের আগে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগে রেশম শিল্পের উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা দেখা যায় না। পলাশী-পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ওয়েস (Weiss) নামে এক দক্ষ কারিগরকে বাংলায় রেশম শিল্পে উন্নতি ঘটানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর চারজন ইতালীয় সহযোগী বাংলাদেশে নতুন ধরনের রেশম ও সুতো বানানোর পদ্ধতি (filature system) চালু করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে বাঙালী রেশম কারিগররা এ ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে

১। বাংলার তাঁতীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র, দি কটন উইভারস অব বেঙ্গল, কলকাতা ১৯৭৮।

পেরেছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস জানালেন বাংলাদেশে ইতালীয় প্রশিক্ষকদের আর প্রয়োজন নেই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতিবছর ৭,২০০ মণ রেশম কিনত যার গড় দাম ছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা।[১০] এ সময়ে বাংলাদেশে রেশমের গড় দাম প্রতিসের আটটাকা আর ইউরোপের বাজারে এর বিক্রয়মূল্য প্রতিসের তেইশ টাকা। খরচ খরচাবাদেও রেশম বাণিজ্যে কোম্পানির প্রচুর লাভ থাকত। বাংলার রেশম কারিগররা সে অনুপাতে ন্যায্য পারিশ্রমিক পেত না। একমণ রেশমের জন্য সমস্ত শ্রেণীর কারিগররা মোট পারিশ্রমিক পেত পঁয়ত্রিশ টাকা। এতে একজন নাকাদের দৈনিক আয় দাঁড়াত এক আনা তিন পয়সা। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাসিক আয় হত মাত্র বারো আনা তিন পয়সা। একজন তাবেকদার (রেশম কারিগর) ঐ একই রকম আয় করত। সরদার কারিগরদের আয় হত একটু বেশি—মাসে দুটাকা নয় আনা তিন পয়সা।[১১] কারিগরদের এত কম পারিশ্রমিক দেওয়া সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে বাংলা রেশমের দাম অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী করা রেশমের (ইতালী, স্পেন, চীন ও ইরাণ) বেশি হত। এজন্য কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি অনেকখানি দায়ী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রেশম চাষী ও কারিগরদের অবস্থা অনেকখানি তাঁতীদের মত। মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক বাজারে রেশমের চাহিদা কমে যেত, তখন রেশম কারিগরদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হত। ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রেশম শিল্পে এরকম মন্দা দেখা গিয়েছিল। এরকম সময়ে তুঁতে চাষীরা অন্য শস্য চাষ করত আর রেশম কারিগররা অন্য পেশার দিকে ঝুঁকত।

**লবণ শিল্প:** অষ্টাদশ শতাব্দীতে লবণ বাংলার তৃতীয় প্রধান শিল্প ছিল। বালেশ্বর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলার বিস্তৃত সমুদ্রোপকূলে—হিজলি, তমলুক, চব্বিশ পরগনা, সুন্দরবন, ঢাকা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম—লবণ তৈরি হত। সমুদ্রোপকূলের মাটি থেকে লবণাক্ত জল বার করে জঙ্গলের কাঠে ফুটিয়ে খুব সহজেই লবণ তৈরি করা হত। এ যুগে এ লবণের নাম পাঙ্গা (pungah)। শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে এ পদ্ধতিতে ১৭৯৫ ও ১৭৯৬-এ যথাক্রমে ৩০,২৮,৩৪২ ও ২৬,৯৯, ২৮৬ মণ লবণ উৎপন্ন হয়েছিল। বাংলাদেশে গড়ে প্রতিবছর আটাশ লক্ষ মণ লবণ তৈরি হত আর এর অর্ধেক আসত মেদিনীপুর জেলার হিজলি ও তমলুক থেকে। প্রাক্-পলাশী যুগে লবণের দাম পড়ত প্রতি একশ মণ চল্লিশ থেকে ষাট টাকা। শতাব্দীর শেষে ১৭৯৬-৯৭-এ একশ মণ লবণের দাম ৩০৮ টাকা দাঁড়াল।

সমুদ্রোপকূলে লবণ তৈরির জমিগুলি (জলপাই) খালারি বা খণ্ডে বিভক্ত। বাংলার নবাবরা এককালীন অর্থের বিনিময়ে বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি বা বণিককে লবণ

১০। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১।
১১। ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার দিতেন। তবে এ অধিকার তেমন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হত না। লবণ থেকে বাংলার নবাবরা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বার্ষিক রাজস্ব পেতেন। পলাশীযুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীরা নামমাত্র শুল্কে লবণব্যবসায়ে নামে। দেওয়ানি লাভের পর ক্লাইভ 'সোসাইটি ফর ট্রেডের' মাধ্যমে (১৭৬৬—৬৮) লবণ ব্যবসায় একচেটিয়া করে লভ্যাংশ কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা করে দেন। এ ব্যবস্থায় লবণের দাম শতকরা ১০০ ভাগ বেড়ে যায়। ডিরেক্টর সভা এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দেশীয় বণিকদের অবাধ ব্যবসায়ের সুযোগ (open and free system) দেওয়ার সুপারিশ করে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি লবণ ব্যবসায় ইজারা ব্যবস্থা চালু করে। এতে প্রথমদিকে কোম্পানির আয় বাড়লেও কয়েকবছর পর আয় কমতে শুরু করে। এক্ষতি কোম্পানির কর্মচারী ও এদেশীয় বণিকদের মধ্যে যোগসাজসের ফল। এ সময় উড়িষ্যা ও করমণ্ডল উপকূল থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ আসতে থাকে এবং বাংলাদেশে লবণের দাম ক্রমশ নামতে থাকে। হেস্টিংস বাংলায় লবণ আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে লবণ উৎপাদন ও পাইকারি বিক্রয় ব্যবসা কোম্পানির হাতে নিলেন। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির আয় বাড়লো ১৭৮৪-৮৫ সনে লবণ রাজস্ব থেকে কোম্পানির আয় হল ৬২,৫৭,৪৭০ টাকা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার লবণ কোম্পানির আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি লবণ বিভাগ তুলে দিয়ে 'বোর্ড অব ট্রেডের' হাতে লবণ সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে। লবণের রাজার দর ক্রমাগত বাড়তে থাকল।

জেমস্ গ্রান্টের হিসেব অনুযায়ী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার লবণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হল ৬০,০০০।[১২] লবণ শ্রমিকরা দুভাগে বিভক্ত—আজুরা মালঙ্গি বা স্থায়ী লবণ শ্রমিক ও ঠিকা মালঙ্গি বা অস্থায়ী লবণ শ্রমিক। মোট লবণ শ্রমিকের দুভাগ আজুরা আর একভাগ ঠিকা। আজুরা শ্রমিকরা বংশ পরম্পরায় খালারির সঙ্গে যুক্ত থাকত। ওখানেই তাদের গৃহ ও চাষ জমি। এ ব্যবস্থা একধরনের নথিবদ্ধ দাসপ্রথা (bonded labour system)। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আজুরা ব্যবস্থা তুলে দেয়; এরপর থেকে ঠিকা প্রথায় লবণ তৈরি হত। ঠিকা মালঙ্গিরা লবণ তৈরির সময় (ডিসেম্বর থেকে মে) খালারিতে হাজির হত। সাধারণত একটি খালারিতে ৭ জন মালঙ্গি বছরে ২৩৩ মণ লবণ প্রস্তুত করত। আজুরা প্রথার অবলুপ্তির পর লবণ শ্রমিকদের স্বাধীনতা অনেকখানি ফিরে আসে। তারা সুবিধামত স্বাধীনভাবে লবণ তৈরির চুক্তি করার অধিকার পায়। শতাব্দীর শেষে হিজলিতে একশ মণ লবণ তৈরির জন্যে মালঙ্গিরা মজুরি পেত চল্লিশ আর্কট টাকা আর চব্বিশ পরগনায় ষাট আর্কট টাকা। একজন লবণ শ্রমিক দৈনিক

১২। জেমস্ গ্রান্ট, অ্যানালিসিস, ফিফথ্ রিপোর্ট ২য় খন্ড।

পারিশ্রমিক পেত এক আনা দুগণ্ডা তিন কড়ি। একজন সাধারণ মজুর দৈনিক পেত তের গণ্ডা কড়ি।[১৩]

**চিনি শিল্পঃ** এ যুগে বাংলার অপর প্রধান শিল্প হল চিনি। চিনি বাংলা থেকে তৃতীয় প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। এশীয় দেশগুলিতে চিনি রপ্তানি করে বাংলা প্রচুর অর্থোপার্জন করত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ হল পাঁচ লক্ষ মণ। পলাশীযুদ্ধের আগের দুদশকে (১৭৩৭-১৭৫৭) চিনি রপ্তানি করে বাংলা মোট ষাট লক্ষ টাকা রোজগার করেছিল। শতকের শেষ দুই দশকে ইংল্যাণ্ডে চায়ের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদা বাড়ে এবং বাংলা থেকে ইংল্যাণ্ডে চিনি রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কোম্পানি বাংলার চিনি ইংল্যাণ্ডে ৫৩ শতাংশ বা ততোধিক লাভে বিক্রি করেছিল।[১৪] বাংলাদেশে উৎপন্ন চিনির ৯৫ শতাংশ আখের রস আর বাকী ৫ শতাংশ খেজুর গাছের রস থেকে প্রস্তুত করা হত। ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাস-এর গ্রন্থে বাংলার দেশীয় চিনি প্রস্তুত পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কাঠের যন্ত্রে পিষে আখের রস বার করা হত। তারপর এই রস থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে জ্বালিয়ে পরিস্রাবণ করে জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিনি বানানো হত। অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়েও বেশ কিছু পরিমাণে চিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপে চালান যেত।

মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার চিনি উৎপাদন ও ব্যবসায়ে খানিকটা মন্দা দেখা দেয়। এর কারণ হল বাংলা চিনির অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি ও অত্যধিক পরিবহন ব্যয়। বোম্বাই ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে চীন, ম্যানিলা ও জাভার চিনি বাংলার জায়গা দখল করে। জাভার চিনি বাংলার চিনি থেকে গুণগতমানে উন্নত অথচ দামে সস্তা। এমনকি বাংলাদেশেও চীনের ক্যাণ্ডি (candy) আনা শুরু হয়। ১৭৭৬ সনে বাংলার বণিকরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পদ্ধতিতে বাংলার চিনি শিল্প গড়ে তোলার আবেদন রেখেছিল। ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে কোম্পানি আখ চাষের জন্য বাড়তি জমি দিয়ে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাও করেছিল, তবে এ প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭৯০-এ পূর্বাঞ্চলের বৃটিশ কলোনীগুলিতে বাংলা চিনির উপর ধার্য শুল্ক কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানোর প্রস্তাব কোম্পানি গ্রহণ করেছিল। এতে বাংলা চিনির রপ্তানি খানিকটা বেড়েছিল। ১৭৯৬তে কোম্পানি বাংলাদেশের চিনিশিল্পে পশ্চিম ভারতীয় পদ্ধতি প্রচলনের শেষ চেষ্টা করেছিল।[১৫] কোম্পানি রিচার্ড কার্ডিয়ান (Richard

১৩। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯।

১৪। এইচ. আর. ঘোষাল, দি ইকনমিক ট্রানজিশন ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, পৃঃ ৫৯।

১৫। বাংলার চিনি শিল্পে পশ্চিম ভারতীয় পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা এর আগে দুবার হয়েছিল। সত্তর দশকের শেষ দিকে একবার আর ১৭৯২এ মিঃ প্যাটারসনের (Paterson) নেতৃত্বে বীরভূমে দ্বিতীয়বার। উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। দ্রঃ এইচ. আর. ঘোষাল, ঐ, পৃঃ ৫৯।

Cardian) নামে জামাইকায় চিনি তৈরিতে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য শান্তিপুর পাঠায়। কিন্তু শতাব্দীর শেষ কয়েকবছরে ইংল্যাণ্ডের চিনি বাজারে মন্দা দেখা দিলে ১৮০১ সনে কোম্পানির শান্তিপুর প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। তবে শান্তিপুরে প্রস্তুত দোবারা (dobara) চিনি গুণগত মানে উন্নত ধরনের (remarkably good in quality) হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।[১৬]

বাংলার প্রায় সব জেলাতে অল্প বিস্তর চিনি উৎপন্ন হত। তবে রংপুর, বীরভম, শান্তিপুর, হরিপাল ও রাধানগর বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৭৯৩-র ২২শে সেপ্টেম্বর রংপুরের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বোর্ড অব ট্রেডকে লিখছেন ঃ 'এই জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে অসংখ্য চিনির কারখানা আছে; এরমধ্যে চার পাঁচটি ইউরোপীয়দের আর বাকী সব এদেশীয়দের।' আখ চাষী ও চিনি উৎপাদকদের পুঁজির অভাবের কথা ঐ চিঠিতে তিনি বোর্ডকে জানিয়েছিলেন। ১৭৯৪তে শুধু এ জেলা থেকে কোম্পানি ৫৫,০০০ মণ চিনি কিনেছিল। বীরভূম জেলায়, বিশেষ করে সুরুল ও তার আশেপাশে, খুব মিহি দানার চিনি (very fine grain sugar) উৎপন্ন হত। এ চিনি দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং ইউরোপের বাজারে বীরভূম চিনির চাহিদাও বেশি। রাধানগরেও উন্নতমানের চিনি উৎপন্ন হত এবং ইউরোপের বাজারে রাধানগর চিনির চাহিদা বাড়ছিল বলে কোম্পানি ১৭৯৪ সনে এখান থেকে ৩৪,০০০ মণ চিনি সংগ্রহ করেছিল।

**কাগজ শিল্প ঃ** আঠারো শতকে বাংলার প্রয়োজনীয় কাগজ এদেশে প্রস্তুত করা হত। বর্তমান কাগজের সঙ্গে তুলনায় এ কাগজ অবশ্যই নিম্নমানের। এগুলি অনেকটা হলদেটে, কর্কশ, অসমান, দাগবিশিষ্ট ও আঁশযুক্ত হত। হাতে তৈরি এ কাগজে অনেক ছিদ্র থাকত বলে সহজে কালি টেনে নিত এবং পোকায় খেত। অল্পদিনে বা খুব সহজে এ কাগজ ছিঁড়েও যেত। যারা কাগজ বানাত তারা কাগজী নামে পরিচিত ছিল। কাগজীদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলে জানা যায়। কাগজ বানানোর জন্য বেশি পুঁজির দরকার হত না। বাংলাদেশে পাট, চুণ ও জল দিয়ে খুব সহজ পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি হত। চুণের জলে ভেজানো পাটের মণ্ড ঢেঁকিতে কুটে, বাঁশের ছাঁচে ফেলে, রৌদ্রে শুকিয়ে কাগজ বানানোর ব্যবস্থা ছিল। বাংলার কাগজ পাঠানোর জন্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে মাঝে মাঝে নির্দেশ আসত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলার কাগজ কিছু কিছু রপ্তানি করা হত।[১৭]

রেনেলের জার্নাল থেকে বীরভূম জেলার লোহার খনিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এ জেলার মল্লারপুর, দামরা ও কৃষ্ণনগরে বেশ কয়েকটি লোহার খনি ছিল। খনি থেকে আকর তুলে পার্শ্ববর্তী দেওচা, মহম্মদবাজার ও মাইসায়াতে ব্যবহারযোগ্য করা হত। বীরভূমের মল্লরাজারা স্থানীয় কারিগর দিয়ে উন্নত

১৬। এইচ. আর. ঘোষাল, ঐ, পৃঃ ৬৪।

১৭। মণ্টগোমারি মার্টিন, ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩৫-৩৬

ধরনের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বানাতেন। বিষ্ণুপুর রাজাদের বিখ্যাত দলমাদল কামান এবং প্রথম রঘুনাথ সিংহের তরবারি আজো তাদের উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করছে। রেনেল ঢাকায় একটি ও মুর্শিদাবাদে তিনটি বৃহৎকামান দেখেছিলেন। বাংলাদেশে তখন ভারী কামান ও কামান টানা লোহার গাড়ি তৈরি হত বলে কোম্পানির কাগজ পত্রে উল্লেখ আছে।[১৮] মীরকাশিম মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানা বানিয়েছিলেন। গোলাম হোসেন তাঁর 'সিয়ার মুতাক্ষরীণে' লিখেছেন মীর কাশিমের অস্ত্র কারখানায় অনেক কামান ও মাস্কেট তৈরি হত। সিয়ারের ইংরাজী অনুবাদক মঁশিয়ে রেমণ্ড (হাজী মোস্তফা) মীরকাশিমের অস্ত্র কারখানায় প্রস্তুত অস্ত্রশস্ত্রের গুণগতমানের প্রশংসা করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর অফিসারও এরূপ ধারণা পোষণ করতেন।[১৯] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা কলকাতা কাউন্সিলকে গোলাবারুদ বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন।[২০]

সত্তরের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে নীলের চাষ ও নীল উৎপাদন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু হয়। এ সময় থেকে ইউরোপে নীলের চাহিদা বাড়ছিল। লুই বোনাত, কারেল ব্লুম, জে, টি প্রিন্সেপ, ক্লড মার্টিন ও জি, এফ গ্রাণ্ড বাংলাদেশে নীলের সরবরাহ ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৭৮১-৮২ সনে প্রিন্সেপ সাড়ে পাঁচ টাকা সের দরে কোম্পানিকে এক হাজার মণ নীল সরবরাহ করেছিলেন। প্রিন্সেপ ছাড়াও ডগলাস, ফার্গুসন, বারেটো, জে. পি. স্কট ও হেনরি স্কট কোম্পানিকে নীল সরবরাহ করতেন। প্রথমদিকে নীলের ব্যবসায়ে কোম্পানির লোকসান হয়; পরে অবশ্য এ ব্যবসায়ে লাভ দেখা যায়। কারেল ব্লুম হুগলীতে কুঠি বানিয়ে নীলের চাষ ও উৎপাদন শুরু করেছিলেন। আস্তে আস্তে আরো অনেকে নীলের চাষে আকৃষ্ট হন এবং নীলের গুণগতমানের ক্রমশ উন্নতি দেখা যায়। সেই সঙ্গে জবরদস্তি করে রায়তকে দিয়ে নীল চাষ করানোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।[২১] ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ভকিল রহমতুল্লাহ জবরদস্তিতে নীলচাষের দুটি ঘটনা সদর দেওয়ানি আদালতে তুলেছিলেন।

আঠারো শতকের বাংলাদেশে অন্যান্য পণ্যের মধ্যে পূর্ণিয়া ও রংপুর জেলাতে সামান্য পরিমাণে সোরা তৈরি হত। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রংপুরে সোরা তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণিয়াতে নবাবী আমলে নবাবের প্রয়োজনীয় সোরা উৎপন্ন হত। ১৭৮৮ পর্যন্ত পূর্ণিয়াতে সোরা তৈরি হয়েছিল; তারপর বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের দিনাজপুর ও রংপুরে অল্প পরিমাণে আফিমের চাষ হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফিমের বিশাল আন্তর্জাতিক চাহিদা ছিল। বেশিরভাগ আফিম যেত চীনদেশে। কোম্পানি আফিম ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল।

১৮। কনসালটেশনস, ৪ ডিসেম্বর ১৭৫২।
১৯। গোলাম হোসেন, সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯।
২০। কোর্টের চিঠি, ৩রা মার্চ, ১৭৫৮।
২১। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় বসবাসকারী বিদেশী বণিক, পর্যটক ও পর্যবেক্ষক সকলেই বাংলায় অসংখ্য উন্নত মানের হস্তশিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। এদেশের সমকালীন লেখক ও কবিদের রচনায় বাংলার উন্নত ধরনের বহু হাতের কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত সোনা রূপো ও হাতির দাঁতের কাজ, শাঁখার নানারকম অলঙ্কার, পিতল কাঁসা ও ভরণের তৈজসপত্র, লোহা ও কাঠের তৈজস ও আসবাবপত্র। এযুগে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভূম পিতল কাঁসার কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। এক শ্রেণীর কারিগর বা হস্তশিল্পী একটি বিশেষ কাজে বংশ-পরম্পরায় নিযুক্ত থাকত। সেজন্য তাদের প্রস্তুত সামগ্রী উন্নত মানের হত। নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান রাজবল্লভ ঢাকার কাছে রাজনগরে হস্তশিল্পী ও কারিগরদের আহ্বান করে বসিয়েছিলেন। রাজনগরের পিতল কাঁসার বাসন, লোহার জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির তৈজসপত্র ও সুতীবস্ত্র সারা পূর্ববাংলায় জনপ্রিয় হয়েছিল। এযুগে ঢাকার শাঁখার কাজ সারা বাংলায় সুপরিচিত। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ ও চন্দননগরের কাঠের কাজ বাংলার প্রয়োজন মেটাত।[২২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা বাংলার নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি। চট্টগ্রামেও একটি নৌঘাঁটি ছিল। নৌবহরের প্রয়োজন ছাড়াও বাংলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা। বাংলার নৌ কারিগর ও শিল্পীরা অসংখ্য সৌখিন ও বৃহৎ নৌকা তৈরি করত। করম আলি 'মুজাফফর নামায়' বাংলার তৈরি নৌকাগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও বজরা, ময়ূরপংখী, খোসখান, পালবারা, সেরিঙ্গা, স্লুপ প্রভৃতি নৌকার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার কারিগররা সামরিক প্রয়োজন, নৌবাণিজ্য ও দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিশেষ বিশেষ নৌকা প্রস্তুত করত। শতাব্দীর শেষপাদে ইউরোপীয়দের পরিচালনায় সমকালীন ইউরোপীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে বাংলায় নতুন জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে। কলকাতায় জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কাজ শুরু হয়। জাহাজ নির্মাণ ছাড়া রেশম ও চিনি শিল্পেও আধুনিক ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগ হয়েছিল।

২২। কে. সি. কর্মকার, চন্দননগর, গ্রেট ডুপ্লে।

# ৬

# বাণিজ্য ঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু জাতি নিয়ে গঠিত বাংলার বণিক সমাজ বাংলার অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ পরিচালনা করত। বাঙালী ও ইউরোপীয়দের পাশাপাশি অন্যান্য বহু জাতি ও প্রদেশের লোক বাংলার এ বাণিজ্যে অংশ নিত। এরা হল গুজরাতি, মাড়োয়ারি, ভোজপুরী, আর্মেনীয়,[১] মির্জাপুরী, বেনারসী, গোরখপুরী, লাহোরী, মুলতানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি।

প্রাক্-পলাশীর যুগে বাংলার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বিশাল। দেশীয় বণিকদের পাশাপাশি ইউরোপীয় কোম্পানির কর্মচারীরা বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেও ইউরোপীয়দের অধিকার স্বীকৃত ছিল। এদের ব্যবসায়ী সংগঠন, বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও বিনিয়োগ করা পুঁজির পরিমাণ বেশ ভাল রকম দাঁড়াত। হ্যারি হারনেট, হিউজ বার্কার ও টমাস কুকের বিস্তৃত ও বহুমুখী ব্যবসা থেকে এরকম ধারণা করা যেতে পারে।[২]

বাংলাদেশের এযুগের বণিকসমাজ তিনভাগে বিভক্তঃ বড়, মাঝারি ও ছোট। (ক) বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে সব সময় বিশাল পুঁজি মজুদ থাকত। এরা সাধারণত বড় বড় শহরে—কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা—বাস করত। জেলান্তরে বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের প্রায় দেখা পাওয়া যেত না। ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীরা জেলান্তরের বড় ব্যবসায়ী ছিল। বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের সম্পদ ও ঋণে পুঁজি গড়ে তুলত। এদের সংগঠন ও ব্যবসায়ের পরিমাণও বিশাল। মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এরা সরাসরি উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত। (খ) মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের পুঁজি কম, সংগঠন ছোট এবং এদের ব্যবসায়ী কাজকর্মের ধরনও আলাদা। এদের বেশিরভাগ কোনো বিশেষ পণ্যে বা বিশেষ অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করত। তাছাড়া বড় ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেন্ট হিসাবে দাদন নিয়ে এরা পণ্য সরবরাহ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত। নিজেদের মূলধন কম বলে অধিকাংশ সময় এদের সুদে টাকা ধার নিতে হত। বাংলায় সন্ন্যাসী ও ফকির বণিকরা ভ্যান লিউর (Van Leur) বর্ণিত অল্প পুঁজির ভ্রাম্যমাণ ছোটবণিক, এরা এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে পণ্য নিয়ে যাতায়াত করত।[৩]

১। আর্মেনীয় বণিকরা মুর্শিদাবাদের কাছে সৈদাবাদে বাস করত। অষ্টাদশ শতকের বাংলার বাণিজ্যে এদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

২। পি. জে. মার্শাল, ইস্ট ইন্ডিয়ান ফরচুনস, পৃঃ ১০৯-১১০।

৩। জে. সি. ভ্যান লিউর, ইন্দোনেশিয়ান ট্রেড এ্যান্ড সোসাইটি, বান্দুং, ১৯৫৫, পৃঃ ২১০-২২৫।

বণিক শ্রেণীর উপরতলায় অবৈধভাবে বা অসাধু উপায়ে টাকা রোজগারের ঝোঁক থাকলেও সাধারণভাবে বাংলার বণিকসমাজ কঠোরভাবে ব্যবসায়ী রীতিনীতি মেনে চলত। বিদেশী বণিকরা বাংলার বণিকদের চরিত্র, ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও পুঁজির পরিমাণ ভালভাবে যাচাই করে তবেই এদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করত।[৪] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা সাধারণত বাংলার বৃহৎ বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি করত। আর্থিক নিশ্চয়তা, সুনাম ও পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এরা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হত। সাধারণত নিজেদের বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও লেনদেন সীমায়িত রাখা এযুগের বাংলার বণিকসমাজের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করত না। তবে সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলমান বণিকদের জাহাজ ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি দেখা যায় না। অনেক সময় হিন্দুসমাজের এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের সঙ্গে সহজে ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপন করত না।[৫] মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততার সম্ভাবনায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রাক্-পলাশী যুগে মুসলমান বণিকদের সঙ্গে খুব কমই ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করত। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান বণিকদের সংখ্যাও খুব বেশী নয়।

সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ্‌রা এযুগে বাংলা বাণিজ্যের সামগ্রিক উন্নতির কয়েকটি আর্থ-সামাজিক কারণ উল্লেখ করেছেন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। দ্বিতীয়ার্ধে রাস্তাঘাট, সেতু ও স্থলপথে পরিবহনের ব্যবস্থা খারাপ হতে শুরু করে ঠিকই তবে নৌপরিবহনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। সারা শতাব্দীব্যাপী বাংলায় মজুরের যোগান অব্যাহত[৬] ও সস্তা। বাংলায় মজুর ও খাদ্যশস্যের দাম কম হওয়ায় উৎপন্ন পণ্যের দামও কম। বাংলার কৃষি উন্নত এবং নানাধরনের কৃষিজ পণ্য বাংলায় পাওয়া যেত। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ (Commercialisation of agriculture) বাংলার কৃষিপণ্য উৎপাদনে বেশ ভালরকম উন্নতি ঘটিয়েছিল।[৭] এখানকার কুটির ও হস্তশিল্প উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপে বাংলায় উৎপন্ন কৃষিজ ও শিল্প পণ্যের বেশ ভাল রকম চাহিদা দেখা যায়। সর্বোপরি এদেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত মুদ্রা

৪। কে. এন. চৌধুরী, দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া এ্যান্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পৃঃ ১৪৯।

৫। জেমস্ লঙ্ সিলেকসনস্ ফ্রম আনপাবলিশড রেকর্ড'স অব দি গভর্ণমেন্ট, পৃঃ ১০, রেকর্ড নং ১৮ ও বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস্. ২৩ মে ১৭৪৮।

৬। অবশ্য মারাঠা আক্রমণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও ১৭৮৮ সনের দুর্ভিক্ষের সময় মজুরের যোগান ব্যাহত হয়েছিল।

৭। বিনয় চৌধুরী, 'গ্রোথ অব কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার ইন বেঙ্গল' ১ম খঃ দেখুন।

ব্যবস্থা ও সহজ স্বল্পমেয়াদি বাণিজ্যিক পুঁজির যোগান বাণিজ্যের সহায়ক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। প্রখ্যাত জগৎশেঠ পরিবার, পাঞ্জাবী, আর্মেনীয়, বারানসী, মাড়োয়ারী ও এদেশীয় বণিকগোষ্ঠী এ পুঁজি সরবরাহ করত। শতাব্দীর শেষ তিনদশকে বাংলাদেশে তিনটি ইউরোপীয় ব্যাংক—ব্যাংক অব হিন্দুস্থান (১৭৭০), বেঙ্গল ব্যাংক (১৭৮৪) ও জেনারেল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া (১৭৮৬)—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শেষ দুই দশকে পনেরোটি ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস কলকাতায় গড়ে উঠল।[৮] এগুলি ইউরোপীয়দের পরিচালনায় বাংলাদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের সহায়ক সংস্থা। এরা ব্যাঙ্কিং কমিশনে ব্যবসা, জাহাজ পরিবহন ও বাণিজ্য বীমার কাজ করত। উপরিউক্ত কারণগুলির সম্মিলিত ফল হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় বাণিজ্যের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল।

## ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

বাণিজ্য সহায়ক এ পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলার বিশাল ও উন্নত ধরনের অভ্যন্তরীণ বাজার ও বাণিজ্য।[৯] বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ বাজার গড়ে উঠেছিল। জল ও স্থলপথে, নৌকা, বলদ ও ঘোড়ার গাড়িতে বিপুল পরিমাণ পণ্য এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে দেওয়া নেওয়া চলত। মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা ও ঢাকার কাছে রাজনগর এ যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি।[১০] তাছাড়া অসংখ্য ছোট বড় গঞ্জ, বাজার ও হাট সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল। বড় বড় মহাজন, দালাল ও পাইকারি ব্যবসায়ী থেকে ছোট ছোট অসংখ্য দোকানদার ও ব্যবসায়ী বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার দুধরনের—স্থানীয় বাজার ও আমদানি রপ্তানি বাজার। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র কাঁচা রেশম, সোরা, আফিম, নীল ইত্যাদি) বেচাকেনার জন্যে আলাদা বাজার ছিল। তেমনি অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ভোগ্য পণ্যেরও (চাল, ডাল, তেল ঘি, লবণ, পান, সুপারি, তামাক, লংকা প্রভৃতি) আলাদা বাজার ছিল। এসব দ্রব্য উৎপাদন স্থান থেকে ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বা অঞ্চলে রপ্তানি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ঢাকা, নোয়াখালি, রংপুর ও দিনাজপুর

৮। এজেন্সি হাউসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল ফার্গুসন, ফেয়ারলি এ্যাণ্ড কোম্পানি, প্যাক্সটন, ককরেল এ্যাণ্ড ডেলিসলে, ল্যাম্বার্ট এ্যাণ্ড রস, কলভিন এ্যাণ্ড বাজেট, যোসেফ বারেটো, পের্‌জ এ্যাণ্ড পলিং, পর্চার এ্যাণ্ড কোম্পানি, লোকার্টেল এ্যাণ্ড কোম্পানি, বুইনে এ্যাণ্ড্রু কোম্পানি, ও গ্রাহাম এ্যাণ্ড কোম্পানি। এস. বি. সিং, ইউরোপীয়ান এজেন্সি হাউসেস ইন্ বেঙ্গল, ১৭৮৩-১৮৩৩, পৃঃ ৯-১০।

৯। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ১০৬।

১০। বিজয়রাম সেনবিশারদের 'তীর্থমঙ্গলে' ভগবানগোলা এবং রসিকলাল গুপ্তের 'মহারাজ রাজবল্লভসেন' গ্রন্থে রাজনগর বাজারের বিবরণ আছে।

থেকে এ দুই শহরে চাল আমদানি করা হত। শতকের শেষ দিকে এক দিনাজপুর জেলায় চল্লিশ লক্ষ টাকার খাদ্য শস্য বেচাকেনা হত।[১১] বাংলার অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের বাজারে দিনাজপুর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এর কারণ দিনাজপুরে উৎকৃষ্ট ধরনের অনেক প্রকার চাল উৎপন্ন হত। বৈদ্যনাথ মণ্ডল, ঠাকুরদাস নন্দী ও ভোজরাজ পরিবার এ জেলার শস্য ব্যবসায়ে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। নিজেদের এজেন্টদের মাধ্যমে কৃষকদের আগাম দিয়ে এরা শস্য ব্যবসা নিজেদের হাতে রেখেছিল।

পাশের জেলা রংপুরে নন্দীরা, বেনারসের ব্যবসায়ীরা ও বহিরাগতরা ব্যবসা চালাত। স্থানীয় ব্যক্তিদের নাম ব্যবসায়ীদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় না। রংপুর ও পূর্ণিয়া জেলা থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় চাল রপ্তানি করা হত। লক্ষ্মীপুর ( নোয়াখালি ) ও চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু ও পণ্য বাংলার অন্যান্য জেলায় পাঠানো হত। লক্ষ্মীপুর থেকে প্রধানত রপ্তানি করা হত ধান, সুপারি, চিনি ( মোটা ) লবণ, কাঁচা তুলা, লংকা এবং গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত নানারকম কলাই। চট্টগ্রাম থেকে বাৎসরিক রপ্তানি তালিকায় দেখা যায় লবণ, কাঠ, লংকা, কাচা তুলা এবং সামান্য পরিমাণে ধান।[১২] ঠিক একইভাবে বিভিন্নধরনের রপ্তানি পণ্য বাংলার বিভিন্ন জেলার আড়ঙ থেকে সংগ্রহ করে কলকাতা, হুগলী, চন্দননগর ও শ্রীরামপুরে আনা হত এবং এখান থেকে জাহাজে বিদেশে পাঠানো হত। বিহারের সোরা ও আফিম বাংলার মধ্য দিয়ে বিদেশে যেত। আবার ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্নদেশ থেকে আমদানিকরা পণ্যসামগ্রী নদীবন্দরগুলিতে এসে জমা হত এবং সেখান থেকে জেলাগুলিতে বিক্রির জন্যে পাঠানো হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অবাধ বা মুক্ত ছিল না। তবে প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার বণিকরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করত। তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর দু ধরনের শুল্ক দিতে হত। বাংলার নবাবদের দেয় সরকারি শুল্ক ( সায়ের ) এবং জমিদারদের দেয় দুরকমের শুল্ক—জমিদারির মধ্য দিয়ে বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাওয়ার শুল্ক ( transit duties ) এবং জমিদারির মধ্যে বাজার, গঞ্জ ও হাটের উপর স্থাপিত শুল্ক। বাংলার নবাবরা বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করতেন। মুসলমান বণিকরা দিত ২½ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক, হিন্দুরা ৫ শতাংশ এবং আর্মেনীয়রা ৩½ শতাংশ। ফরাসি ও ওলন্দাজরা ২½ শতাংশ হারে শুল্ক দিত আর ইংরাজরা বার্ষিক তিনহাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত। কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারের অপব্যাখ্যা করে কোম্পানির কর্মচারীরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত এবং নবাবের শুল্ক ফাঁকি

১১। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪।
১২। পি. জে. মার্শাল. ঐ, পৃ. ১০৭।

দিত। এ নিয়ে প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ লেগেই থাকত।[১৩]

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বাংলার নবাবদের থেকে বিভিন্ন বণিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এককালীন দেয় শুল্কের বিনিময়ে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার লাভ। আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদ পলাশী যুদ্ধের আগে ও পরে লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। মীর আফজল নামে একব্যক্তি বিহারের আফিম ব্যবসায়ে অনুরূপ সুবিধা পেয়েছিল। ঠিক একইভাবে বাংলার সীমান্ত জেলার ফৌজদাররা পূর্ণিয়া, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি—অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা পেত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামাক, সুপারি ও চুণের ব্যবসা। শ্রীহট্ট জেলায় বাংলা-আসাম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এরকম সুবিধাজনক একচেটিয়া ব্যবসার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

পলাশী যুদ্ধের আগেই ইউরোপীয় বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে ( private trade ) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষত লবণ, আফিম, তামাক ও সুপারির ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে অংশ নিত। এ পণ্যগুলি সরকারের বিশেষ বাণিজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকায় এদেশের রাজশক্তির সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিরোধ দেখা দিত, বিশেষ করে লবণের ব্যবসায়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লবণের ব্যবসায় এবং সাধারণভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ ভাল হত। বাংলাদেশে চালের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শতকরা পঁচিশ টাকা লাভ হত। লবণের ব্যবসায় লাভ হত কমপক্ষে ৫০ শতাংশ। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যেও বেশ ভাল লাভ হত। অবশ্য সারা বছর সব জিনিসের ব্যবসায় লভ্যাংশ একরকম থাকে না। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের হারে এরকম উত্থান পতন দেখা দিত।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকালে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। এদেশীয় বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্য অনেকটা কোণঠাসা হয়ে যায়। এদেশী বণিকরা কোম্পানির কর্মচারীদের নামে বা তাদের ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে বা তাদের বেনিয়ান হিসেবে এ বাণিজ্য করার অধিকার পায়। কোম্পানির কর্মচারীরা সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসায়—লবণ, সুপারি, তামাক, চাল, তেল, ঘি, আফিম প্রভৃতি—নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করে। এ ঘটনাটিকে যথার্থভাবে 'Plassey plunder' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইংরাজ বণিকরা বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা করায় দুভাবে বাংলার

১৩। এস. সি. হিল, বেংগল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭, ৩য়, খণ্ড। তাদের অবৈধ বাণিজ্যের ফলে নবাবের বাণিজ্য শুল্কে খাতে দেড় কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগে সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে।

আর্থিক ক্ষতি হতে থাকে—(১) বাংলা সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত হলেন (এদেশী বণিকরাও কোম্পানির দস্তক কিনে সরকারি শুল্ক ফাঁকি দিত) আর (২) এদেশীয় বণিকরা ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হল। এছাড়া ইংরাজ বণিকদের নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতনতা নবাবের অধিকারের উপর আঘাত স্বরূপ দেখা দিল (encroachments on the rights of the Nawabs)। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাংলার তৎকালীন গভর্ণর হেনরি ভ্যান্সিটার্টকে লেখা একখানি চিঠিতে বাংলার নবাব মীরকাশিম কোম্পানির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্বরূপটি প্রকাশ করেছিলেন।[১৪]

১৭৬২ সনের অক্টোবর মাসে ঢাকায় কালেক্টর মাহমেদ আলি গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখছেন ঃ 'প্রথমত, একদল বণিক ফ্যাক্টরির লোকদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের নৌকায় ইংরাজ পতাকা উড়িয়ে নিজেদের পণ্য ইংরাজদের নামে বহন করে; এর ফলে শাহ্‌বন্দর ও অন্যান্য শুল্কের ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, লখিপুর ও ঢাকা ফ্যাক্টরির গোমস্তারা বণিক ও অন্যান্যদের বাজার থেকে চড়াদামে তামাক, তুলা, লোহা ও অন্যান্য অনেক জিনিস কিনতে বাধ্য করে, তারপর বলপ্রয়োগে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। তাছাড়া তাদের কাছ থেকে পিওনদের জন্য রাহাখরচ (diet money) নেয় এবং চুক্তি ভঙ্গ করলে জরিমানা দিতে বাধ্য করে। এরকম কাজকর্মের ফলে আড়ঙ্ ও অন্যান্য বাজার ধ্বংস হচ্ছে। তৃতীয়ত, লখিপুরের গোমস্তারা তহশিলদারের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে তালুকদারের তালুকগুলি নিজেদের ভোগের জন্যে অধিকার করেছে অথচ এজন্য ভূমি-রাজস্ব দেয় না। কিছু লোকের উস্কানিতে তারা অভিযোগ তদন্তের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে ইউরোপীয় ও সিপাহীদের দস্তকসহ দেশের অভ্যন্তরে পাঠায়। বিভিন্ন স্থানে তারা শুল্ক চৌকি বসায় এবং গরীব মানুষের ঘরে যা পায় বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে। এরকম অত্যাচারে দেশ ধ্বংস হয়। রায়তরা ঘরে থাকতে পারে না বা মালগুজারি (খাজনা) দিতে পারে না। মি. শেভালিয়র অনেকস্থানে বলপ্রয়োগে নতুন নতুন ফ্যাক্টরি ও বাজার বসিয়েছেন; নকল সিপাহী খাঁড়া করে যাকে খুশী আটক করে জরিমানা করেন। তাঁর জবরদস্তি কাজকর্মের ফলে, অনেক হাট, ঘাট ও পরগনা ধ্বংস হয়েছে।[১৫]

মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রশ্নে ইংরাজদের সঙ্গে মীরকাশিমের সংঘর্ষ বেধেছিল (১৭৬৩-৬৪)। এ যুদ্ধের সংবাদে বিলাতের ডিরেক্টর সভা রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তারা নির্দেশ পাঠালেন কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত

১৪। এ রকম কয়েকটি চিঠি এবং ইংরাজ বণিকদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে ভ্যান্সিটার্ট ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অভিমত জানার জন্য দ্রঃ রমেশ চন্দ্র দত্তের 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া', ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮-৩৪।

১৫। রমেশ চন্দ্র দত্ত, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪-২৫।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে কর্মচারী ও গোমস্তাদের জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হোক।[১৬] এ নির্দেশ কার্যকরী করা অবশ্য সম্ভব হয়নি। তবে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার বাংলার গভর্ণর (১৭৬৫-১৭৬৭) হয়ে এসে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঐ বছর কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার্থে 'সোসাইটি ফর ট্রেড' গঠন করলেন। তিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের (লবণ, সুপারি ও তামাক) উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার সোসাইটির হাতে দেওয়া হল এবং এর লভ্যাংশ কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্লাইভ সোসাইটির মাধ্যমে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শুল্ক খাতে কোম্পানির রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা তাঁর অপর উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়ত, ক্লাইভ ন্যায্য দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ক্রেতা সাধারণের কাছে সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন।[১৭] এ পরিকল্পনায় ব্যবসায়ে অসাধারণ লাভ দেখা গেল—শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ এবং এ লাভ কোম্পানির মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসারের মধ্যে বন্টিত হল।[১৮] কোম্পানির ডিরেক্টর সভা পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬৬তে এ ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে নির্দেশ পাঠালেন। এ ব্যবস্থায় বাংলার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল এবং বাংলার বণিক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি তুলে দেওয়া হল বটে তবে নানা অছিলায় ও ছল চাতুরি করে অন্তত লবণ ব্যবসা পরের বছর পর্যন্ত চালানো হয়েছিল।

কোম্পানি তার কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দেওয়ার জন্যে আগ্রহ দেখিয়েছিল ঠিকই, তবে কোম্পানি নিজে লবণ, সোরা ও আফিমের উপর একাধিপত্য স্থাপনে এগিয়ে গেল। কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশীয় বণিকদের মাধ্যমে এ ব্যবসা-গুলিতে নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে চলেছিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানি বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অবাধ ও মুক্ত নীতি (open and free) অনুসরণ করতে থাকে। কোম্পানি ক্রমশ একচেটিয়া ব্যবসা ও ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে কর্ম-চারীদের সরিয়ে দেয়। হেস্টিংস ১৭৭৩-এ দস্তক ব্যবস্থা তুলে দেন। এদেশী ও বিদেশী সব বণিকের জন্য ২½ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুল্ক ধার্য হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পণ্য চলাচল অবাধ ও মুক্ত রাখার জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার অসংখ্য শুল্ক চৌকি তুলে দিয়ে কলকাতা ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে অভ্যন্তরীণ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। জোর করে উৎপাদকদের দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা রহিত করা হয়। আগেই গভর্ণর ও কাউন্সিলের সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কোম্পানির কর্মচারীরা

১৬। লেটার ফ্রম কোর্ট, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৪।

১৭। পি. জে মার্শাল. ঐ. পৃঃ ১৩৩।

১৮। মাত্র ৬০ জন অফিসারের মধ্যে সোসাইটির লভ্যাংশ বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

লবণ, সুপারি, তামাক, খাদ্যশস্য ও আফিমে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে পারত না। কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা রহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর নানারকম বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।[১৯] এ সব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা টিকে ছিল। শতাব্দীর শেষ দিকে চিনি ও নীলের ব্যবসা লাভজনক হওয়াতে ওরা ওদিকে ঝুঁকেছিল।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কর্মচারীরা এবং শতাব্দীর শেষ পাদে কোম্পানি নিজে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে অনেকগুলি পণ্যের উপর একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সিয়ার মুতাক্ষরীণ রচয়িতা গোলাম হোসেন দুঃখ করে লিখছেন ঃ 'বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটিও অবাধ বা মুক্ত নয়। কোম্পানি নিজে বা ইংরাজরা সবগুলিকেই নিজেদের কুক্ষিগত করেছে।[২০] সত্তরের দশকের প্রথম দিকে নিজের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার পর কোম্পানি তার কর্মচারীদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যদিও এ চেষ্টা খুব ফলবতী হয়নি।[২১] কোম্পানি লবণের ব্যবসা নিজের হাতে নিয়ে এবং একাধিপত্য স্থাপন করে নিজের আয় বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সোরা ও আফিমের ব্যবসায়ে, অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা—ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি—কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অবাধ, মুক্ত বা প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকায় বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ক্রমশ অবনতি বা অবক্ষয় দেখা দেয়।

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবক্ষয়ের দিকটি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি সাধারণ কারণ লক্ষ্য করা যায়।

(ক) পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয় এবং জোর জবরদস্তি করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকে। মীরকাশিমের পরে বাংলার নবাবেরা সকলেই (মীরজাফর (দ্বিতীয়বার) নাজমুদ্দৌলা, সৈফুদ্দৌলা ও মুবারক-উদদৌলা) এ উৎপীড়নমূলক ব্যবসার নীরব দর্শক ছিলেন মাত্র। কর্ণওয়ালিশের আগে কোম্পানি তেমন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি।

(খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে সরকার, জমিদার ও ইজারাদারদের ধার্য করা নানাপ্রকার কর ও শুল্ক প্রায় প্রতিটি উৎপন্ন পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর

১৯। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্যে অধ্যায় নয় দেখুন।

২০। গোলাম হোসেন, সিয়ার, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৯৩।

২১। হাবার্ট হিল্ডার, দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিস রেগুলেশনস্ অব ইট্‌স সারভেন্টস, বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, জানুয়ারী-জুন, ১৯৭৮।

স্থাপিত হয়েছিল। অসংখ্য শুল্ক চৌকি এবং শুল্ক আদায়কারী কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(গ) শতকের প্রথমার্ধে বাংলার রাস্তাঘাট ও নৌপরিবহন ব্যবহারযোগ্য ও অনেকখানি নিরাপদ ছিল। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। নবাব বা কোম্পানি এদিকে নজর না দেওয়ায় এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে অভ্যন্তরীণ জল ও স্থলপথের ক্রমশ দুর্গতি বাড়তে থাকে।

(ঘ) এ যুগে প্রশাসনিক শিথিলতার ফলে সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুরা দলবদ্ধ-ভাবে বাংলার সর্বত্র লুটপাট, খুন, ডাকাতি ও রাহাজানি করে বেড়াত, এঁদের অত্যাচার বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পক্ষে অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়েছিল।[২২]

## খ. আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিস্তৃত ও বিশাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পূর্বে আসাম, ভুটান, তিব্বত ও নেপাল থেকে পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দক্ষিণে করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল পর্যন্ত এ বাণিজ্যের বিস্তার। পশ্চিম উপকূলের বোম্বাই ও গুজরাটের সঙ্গে বাংলার ভাল রকমের বাণিজ্য ছিল।[২৩] স্থলপথে বর্তমান উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর বাংলা ও উত্তর ভারত এবং বাংলা ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে মধ্যবর্তী বাণিজ্য ঘাঁটি হিসেবে কাজ করত। উত্তর ও মধ্য ভারতের দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কাশী, বুন্দেলখণ্ড ও মালবের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উত্তর পশ্চিমে লাহোর, মুলতান ও সিন্ধুদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যপণ্য বিনিময় চলত। সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বণিকদল বাণিজ্য করতে আসত। এ সময়ে বাংলার অবাঙালী বণিকদের মধ্যে আফগান, শেখ, কাশ্মীরী, মুলতানী, পাগিয়া (পাগড়িধারী উত্তর ভারতীয় বণিক), ভুটিয়া ও সন্ন্যাসীরাই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে এরাই এ যুগের বাংলায় ভ্রাম্যমাণ বণিকদল। সন্ন্যাসী ও ফকির বণিকরা হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের উৎপন্ন উদ্ভিজ্জ ফসল, চন্দন কাঠ, মালার বীচি, নানারকম ভেষজদ্রব্য ও গাছগাছালি বাংলায় নিয়ে আসত, হলওয়েল জানিয়েছেন প্রতিবছর আগ্রা ও দিল্লী থেকে বণিকদল বর্ধমানে বাণিজ্যের জন্য আসত। এখান থেকে তারা সীসা, তামা, টিন, লঙ্কা ও নানারকম বস্ত্র নিয়ে যেত, এ বাণিজ্যের পরিমাণ হত বিশাল। দিল্লী ও আগ্রার বণিকদল তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য খানিকটা নগদ

২২। এইচ. আর. ঘোষাল, ঐ, পৃঃ ১৬৯।

২৩। আলেকজান্ডার ডাও, হিন্দুস্থান, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৫।

টাকায় এবং খানিকটা বিনিময় প্রথায় (barter) কিনত। আফিম, সোরা ও ঘোড়ার বিনিময়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করত। উইলিয়ম বোল্টস্‌ও অনুরূপ বর্ণনা রেখে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল ও স্থলপথে হাজার হাজার বণিক বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বাংলায় আসত।[২৪]

বাংলা থেকে একই উদ্দেশ্যে বণিকদল দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে যেত। এরা ঐ অঞ্চলে নিয়ে যেত লবণ, চিনি, আফিম, রেশমীবস্ত্র, রেশম, প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের সুতীবস্ত্র ও মস্‌লিন। সব মিলিয়ে আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ চার কোটি (১৭,৫০,০০০ পাউণ্ড) টাকায় দাঁড়াত।[২৫] দিল্লী-আগ্রা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত। তাদের প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানগুলি হল উত্তর ভারতের বিভিন্ন নগর, আসাম, কাছাড়, মালাবার ও করমণ্ডল উপকূল এবং গুজরাট। জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলায়' এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'চন্দ্রকান্ত' গ্রন্থে বাঙ্গালী বণিকদের বাণিজ্য উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।[২৬]

বাংলার বণিকরা আসাম, কাছাড় ও নেপাল থেকে আনত প্রধানত কাঠ ও হাতির দাঁত, রেশম, লাক্ষা, মুগা ধুতি প্রভৃতি। উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকে আসত লোহা ও পাথরের জিনিসপত্র, চাল ও অন্যান্য দ্রব্য। বাংলা থেকে বালেশ্বরে পাঠানো হত তামাক ও অন্যান্য দ্রব্য।[২৭] বাংলার বণিকরা আসামে নিয়ে যেত লবণ, তামাক ও সুপারি। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমস্ত বন্দর ও শহর, দিল্লী ও আগ্রার সন্নিহিত অঞ্চল, কাশী, এলাহাবাদ ও অযোধ্যাতে বাংলার বণিকদের দেখা যেত। বাংলার বণিকরা এ সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করত ফল, ওষুধ, কড়ি টিন, তুলা, শাঁখ প্রভৃতি নানারকম পণ্য। বাংলা থেকে নিয়ে আসত সুতী ও রেশমী-বস্ত্র, মস্‌লিন, চিনি, তামাক, সুপারি, লবণ, আদা, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি। কাশ্মীরী ও আর্মেনীয় বণিকরা এযুগে বাংলায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কাশ্মীরী বণিকরা বাংলা থেকে লবণ সংগ্রহ করত এবং এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের মালঙ্গিদের আগাম টাকা দিয়ে সস্তায় লবণ বানিয়ে নিত। এই বণিকদল বাংলা ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যে অংশ নিত। এরা বাংলা থেকে বস্ত্র, রেশম, ঝিনুক, চামড়া, নীল, মুক্তো, তামাক, চিনি, লবণ, সুপারি, ব্রড ক্লথ, লোহার জিনিসপত্র, ও মালদা সাটিন নিয়ে নেপাল, তিব্বত ও ভুটানে যেত। তারা

২৪। উইলিয়ম বোল্টস, কনসিডারেশনস অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স, পৃঃ ২০০।

২৫। আবে রেনল, এ ফিলজফিক্যাল এ্যান্ড পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব দি সেটেলমেন্টস্‌, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৮।

২৬। জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা' ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পৃঃ ৬৬২-৬৩।

২৭। জেমস্‌ লঙ্‌, ঐ, পৃঃ ৩৩৬, রেকর্ড নং ৫৫৮।

বাংলার জন্য এসমস্ত অঞ্চল থেকে নানারকম ভেষজদ্রব্য, সোনা, রেশম, হাতির দাঁত, পশমের কাপড়, মুখোশ ও লাক্ষা নিয়ে আসত।[২৮]

আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অন্যতম প্রধান পণ্য হল বাংলার লবণ। বাংলা থেকে লবণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ করা হত। বাংলা থেকে জলপথে লবণ পাঠাবার সুবিধা থাকায় পরিবহন ব্যয় বেশি হত না এবং এর ফলে লবণের দাম কম থাকত। বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ লবণ পাঠানো হত কাশী ও মির্জাপুরে। সেখান থেকে এ লবণ চালান যেত অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বুন্দেলখণ্ড ও মালবরাজ্যে।[২৯] বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ আসামে পাঠানো হত। পাঁচশ-ছশ টনের অন্তত: চল্লিশখানি বড় নৌকা বা জাহাজ বাংলার লবণ নিয়ে প্রতিবছর আসাম যেত। বাংলা-আসাম লবণ ব্যবসায়ে অসাধারণ লাভ (প্রায় শতকরা ২০০ ভাগ) হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় তামাক ও সুপারির উৎপাদন যথেষ্ট ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যরূপে বাংলা থেকে তামাক ও সুপারি উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি করা হত।

শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এসময়ে বাংলার প্রধান শিল্পপণ্য সুতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র ও মসৃলিন। সারা ভারতে এ পণ্যের বাজার উত্তর থেকে পশ্চিমের গুজরাট এবং উত্তর-পশ্চিমে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাই, সুরাট ও নাগপুর থেকে বিপুল পরিমাণে কাঁচা তুলা বাংলায় আসত; এগুলি বাংলার তাঁতের চাহিদা মেটাত। বাংলা থেকে কাঁচা রেশম গুজরাট ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি করা হত। এর পরিমাণও হত বেশ বিশাল। আলিবর্দির সময়ে শুধু মুর্শিদাবাদের (চুণাখালি) শুল্ক চৌকির হিসেবে বার্ষিক কমপক্ষে সত্তর লক্ষ টাকার রেশম বাংলার বাইরে চালান হত। ইউরোপীয়রা বাংলা থেকে যে রেশম কিনত তা এ হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি। পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের অপর প্রধান পণ্য বাংলার চিনি। বাংলার চিনি মাদ্রাজ, মালাবার উপকূল, বোম্বাই, গোয়া, সুরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে চালান দেওয়া হত। এ সময়কার ভারতবর্ষে বাংলা এ পণ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাক্-পলাশীযুগে বাংলার বার্ষিক মোট রপ্তানিযোগ্য চিনির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার মণ। চিনির ব্যবসা থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ লাভ হত এবং সেই পরিমাণে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটত। পলাশী-উত্তর যুগে জাভা ও চীনদেশের সস্তা চিনি ভারতের পশ্চিম উপকূলে আমদানি হলে বাংলার এই লাভজনক আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ধ্বংস শুরু হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় পাট থেকে তাঁতে চট বোনা হত। প্রথম দিকে এ চট শুধু অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। এ পণ্যের রপ্তানি প্রায় ছিল না বললেই চলে। পঞ্চাশের দশক থেকে কিছু কিছু চট ও চটের ব্যাগ বাংলা থেকে

২৮। আলেকজান্ডার ডাও, ঐ, প্রথম খন্ড, পৃ: ১২৫ ও ভ্যান্সিটার্ট, ন্যারেটিভ, ২য় খন্ড, পৃঃ, ২২৯।

২৯। আলেকজান্ডার ডাও, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৯-১২০।

বাইরে চালান শুরু হয়। ১৭৫৩-তে কোম্পানির বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে[৩০] এবং ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকেও কলকাতায় চট কেনার নির্দেশ আসে। ১৭৫৫-তে কোম্পানি নথিপত্রে ২০০০ গানিব্যাগের উল্লেখ আছে। এসব সাক্ষ্য থেকে বাংলার বাইরে বাংলার চট ও চটের ব্যাগের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণ মেলে এবং বাংলাদেশ এ পণ্য রপ্তানি করে বেশ কিছু অর্থোপার্জন শুরু করেছিল। অধিকন্তু পাট ও পাটজাত পণ্য ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট চাষ অনেকখানি বেড়ে যায়।

**উপকূল বাণিজ্য ঃ** প্রধান প্রধান পণ্যগুলি ছাড়াও বাংলা থেকে অনেকগুলি কৃষিজ পণ্য যেমন লম্বা লংকা, চাল, আফিম, আদা, হলুদ প্রভৃতি পশ্চিম পূর্ব উপকূলের প্রদেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। এর বিনিময়ে বাংলা এ অঞ্চল থেকে তার প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভেষজ দ্রব্যাদি, ফল, কড়ি টিন, শাঁখ প্রভৃতি সংগ্রহ করত।[৩১] বাংলার বিদেশী কোম্পানিগুলি আন্তঃপ্রাদেশিক, বিশেষ করে উপকূল বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা থেকে চিনি, চাল, চটের ব্যাগ, আদা, হলুদ, তেল এবং নানা খনিজ দ্রব্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট, পণ্ডিচেরি, কালিকট, মাহে—পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দর ও শহরে বিক্রি করত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কর্মচারীরাও উপকূল বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। উইলিয়ম বোল্টস্-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায় পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কর্মচারীরা আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কাশী ও অযোধ্যায় সোরার ব্যবসা এবং আগ্রা অঞ্চলে নীলের ব্যবসায়ে কোম্পানির কর্মচারীরা বেশ লাভ করত। এরা ছাড়া লাইসেন্সধারী ইংরাজ স্বাধীন বণিক (free merchant) এবং লাইসেন্সহীন বেআইনি বণিক (interloper) বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক ও উপকূল বাণিজ্যে অংশ নিত।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলের কতকগুলি বন্দরের সঙ্গে—ওলন্দাজদের কোচিন, ইংরাজদের তেলিচেরি ও আনজেঙ্গো (Anjengo), স্বাধীন কালিকট ও মহীশূরের মাঙ্গালোর—বাংলার বেশ বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মাধ্যমে বাংলা এ অঞ্চল থেকে লংকা, এলাচ, দারুচিনি ও চন্দনকাঠ সংগ্রহ করত।[৩২] এ পণ্যের কিছু অংশ পুনরায় পশ্চিম এশিয়া ও চীনদেশে রপ্তানি (re-export) করা হত। সিন্ধুদেশের থাট্টাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মুলতানের সঙ্গেও এযুগে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ অব্যাহত দেখা যায়। বাংলা

৩০। বোম্বাই কাউন্সিলের লেটার টু ক্যালকাটা, ১২ আগস্ট, ১৭৫৩।

৩১। এস. সি. হিল, ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১০।

৩২। এ বাণিজ্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ এ. দাশগুপ্ত, মালাবার ইন এশিয়ান ট্রেড, ১৭৪০-১৮২০, কেম্ব্রিজ, ১৯৬৭।

থেকে জলপথে সিন্ধুদেশে নানারকম ধাতব দ্রব্য, চিনি, চাল ও রেশম যেত। করমণ্ডল উপকূলের বন্দরগুলিতে কলকাতা থেকে যেত খাদ্যশস্য, ডাল, চিনি, সোরা গুড়, আদা, লম্বা লংকা, মাখন, তেল, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, মস্‌লিন, হলুদ, সোহাগা (borax) প্রভৃতি।[৩৩] (শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নেপাল থেকে বাংলায় সোহাগা আমদানি বৃদ্ধি পায়।) ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ পরিবহন ব্যবসার সুবিধার্থে করমণ্ডল উপকূল থেকে বাংলাদেশে লবণ (কুরকুচা) আমদানি চলতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল বলা চলে। বাংলায় আপেক্ষিক শান্তি (মারাঠা আক্রমণ ছাড়া), বণিক ও বাণিজ্যের অনুকূল রাষ্ট্রনীতি, বাংলার উন্নত শিল্প ও কৃষি এর প্রধান কারণ। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নানাকারণে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর কারণ প্রধানত তিনটি।

প্রথমত, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। স্বাধীন রাজা বা সুলতানরা আলাদা আলাদাভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করেছিলেন। এতে সারা ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি হয়।

দ্বিতীয়ত, সারা ভারতে লুটেরা, ডাকাত ও দস্যুদের উৎপাত আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীকে বলা হয় অরাজকতার শতবর্ষ (century of anarchy)। শান্তি ও শৃঙ্খলা সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত।[৩৪]

তৃতীয়ত, কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ঝোঁক বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি করেছিল। পূর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কতকগুলি জিনিস যেমন সোরা, আফিম, ও লবণের ব্যবসায়ে একাধিপত্য স্থাপন করে। অপরদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা তামাক, সুপারি, নীল ও চুণের ব্যবসা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে এবং কোনো কোনো অঞ্চলের আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উপর নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে দেয় (যেমন বাংলা-আসাম ব্যবসা)। এর ফলে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যণিজ্য দুর্দশার সম্মুখীন হয়। অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত ও কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।[৩৫]

৩৩। এম. কে. সিংহ, ঐ. ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৫।
৩৪। কে. কে. দত্ত. ঐ, পৃ; ২৭০-২৭১। ও আলেকজান্ডার ডাও, ঐ, ১ম খন্ড পৃ, ১২৫
৩৫। ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্তব্য, কনসালটেশনস, ১ মার্চ ১৭৬৩।

# ৭

# বাণিজ্য : আন্তর্জাতিক

স্কটল্যাণ্ডবাসী আলেকজাণ্ডার ডাও বাংলা বাণিজ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন : 'বাংলার নরম জলবায়ু, জমির উর্বরাশক্তি ও হিন্দুদের প্রকৃতিগত ঐতিহ্য বাণিজ্যের সহায়ক।'[১] শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের পর বাংলার পক্ষে উদ্বৃত্ত ( balance of trade ) থাকে ; এখানে যে সোনা বা রুপো বিদেশীরা নিয়ে আসে তা আর কখনো ফেরত যায় না।' গ্রোস লিখেছেন এখান থেকে প্রতিবছর পঞ্চাশ থেকে ষাটখানা জাহাজ ভর্তি হয়ে বাংলার পণ্যসম্ভার বিদেশে যায়।[২] প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার বহির্বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিমাণে বিশাল এবং প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলা প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করত। আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবছর লেনদেনের পর বাংলার এককোটি ষোল লক্ষ টাকার উপর লাভের পরিমাণ দাঁড়াত। শতাব্দীর গোড়ার দিকে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন হুগলীকে বাংলার সবচেয়ে বড় আমদানি রপ্তানি বন্দর বলে উল্লেখ করেছিলেন। হুগলী হল বক্সবন্দর—বাংলা সুবায় সম্রাটের সবচেয়ে বড় শুল্ক চৌকি। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বন্দরে যে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আদায় করা হয়েছিল তার পরিমাণ দুলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ষোল সিক্কা টাকা। এ হিসেবের মধ্যে পাশের নটি গঞ্জের শুল্কও ধরা আছে। পলাশী যুদ্ধের সময় কলকাতা নিঃসন্দেহে বাংলার সবচেয়ে বড় বন্দর। কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং মোট বাণিজ্যের পরিমাণ এক মিলিয়ন পাউণ্ড বা এক কোটি টাকা।

শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, জার্মানি ও বেলজিয়ামের অধিবাসীদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। গ্রীস ও পর্তুগালের সঙ্গেও অল্প পরিমাণে বাংলার বাণিজ্য হত। ইউরোপীয়রা ছাড়া এ যুগে বাংলার বহির্বাণিজ্যে বিদেশী বণিকদের মধ্যে আরব, চীনা, তুর্কী, ইরাণী. আবিসিনীয় জর্জীয় ও আর্মেনীয়দের দেখা যায়। স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলার অবাঙালী বণিক সমাজ বাংলার এশীয় বাণিজ্যে অংশ নিত। এরা হল গুজরাটী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, মালাবারী প্রভৃতি। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকার বণিকদল বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল।

১। আলেকজাণ্ডার ডাও, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৩।
২। জে. গ্রোস, ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৮।

ভৌগোলিক দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১। পশ্চিম এশিয়ার লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উপকূলভাগের দেশগুলি—আরব (জেদ্দা), ইরাক (বসরা, বুশায়ার, বন্দর রিগ), ইয়েমেন (মোখা), ওমান (মসকট) ও ইরাণ (গোম্ব্রুন—ইংরাজদের বন্দর আব্বাস)। জেদ্দার মধ্যে দিয়ে মিশর ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের বন্দরগুলি এবং বসরার মধ্য দিয়ে সিরিয়ার আলেপ্পোর সঙ্গে বাণিজ্য চলত। (২) বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দেশগুলি ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপপুঞ্জ। (৩) দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি—ইন্দোনেশিয়া (বাটাভিয়া), সুমাত্রা (অচিন, বেঙ্কলীন), বোর্ণিও, মালয় (কেদা), ম্যানিলা (ফিলিপিন) ও চীন (ক্যানটন)। (৪) আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কেনিয়া (পেত Pate), পর্তুগীজ উপনিবেশ মোজাম্বিক, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা। (৫) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি ও বেলজিয়াম (তৎকালীন অস্ট্রিয়ার নেদারল্যান্ড)।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। বাংলা প্রধানত বিভিন্ন প্রকারের সুতীবস্ত্র, মসলিন, রেশম, চাল, চিনি এ অঞ্চলে সরবরাহ করত। এ অঞ্চল থেকে বাংলায় আসত তামা, ঘোড়া, খেজুর, বাদাম, সিরাজীমদ, গোলাপজল প্রভৃতি। বাংলা ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল আর্মেনীয় বণিকদের। পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানের নিকট জালফাতে ওদের উপনিবেশ ছিল। বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদের কাছে সৈদাবাদ ও কলকাতা এ সময়ে ওদের বড় বাণিজ্য ঘাঁটি। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই বেশ ধনী এবং ব্যবসা বাণিজ্য এদের জাতিগত ঐতিহ্য।[৩] এ অঞ্চলের বাণিজ্যের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বাংলা পণ্যের একাংশ জল ও স্থলপথে মিশর, সিরিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও বন্দরে পুনরায় রপ্তানি (re-export) করা হত। লোহিত সাগরের উপকূলে জেদ্দা ও মোখাতে বাংলার বাণিজ্য চলত। এ অঞ্চলে বাংলার মসলিন, অন্যান্য সুতীবস্ত্র, চাল ও চিনি বিক্রি হত। এ অঞ্চল থেকে বাংলা তার পণ্যের বিনিময়ে নিয়ে আসত সোনা ও রুপো। অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের উপকূলভাগের দেশগুলির সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য বেশ ভালরকম চালু ছিল। তারপর থেকে আস্তে আস্তে এ বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। সত্তরের দশক থেকে এ বাণিজ্য নামমাত্র টিকে ছিল বলা যায়।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাংলা বাণিজ্যের অবনতির তিনটি কারণ লক্ষ্য করা যায়।

(ক) শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। ইরাণে আফগান আক্রমণ, রাশিয়া ও তুরস্কের বিরুদ্ধে ইরাণের যুদ্ধ, নাদির শাহের শাসন এবং জান্দ ও কাজারদের মধ্যে লড়াই পারস্যের শান্তি ও বাণিজ্যিক পরিবেশ

৩। এম. জে. শেঠ. আর্মেনিয়ানস ইন ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৩৭, দ্রষ্টব্য।

দু'ই নষ্ট করে দেয়। ইরাকে বাসাদের নেতৃত্বে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এরফলে বসরা বন্দরের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বসরা ও কায়রোর মধ্যে বাণিজ্য পথটি রুদ্ধ হয়। বসরা ও সিরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যও অচল হয়ে পড়ে। ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এককথায় বলা যায় সমগ্র পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশগুলি রাজনৈতিক অশান্তির শিকার হয়।

(খ) লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলির—জেদ্দা, মোখা, মস্কট—কর্তৃপক্ষের জুলুম ও জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা, বাণিজ্য পণ্যের ন্যায্য দাম না দেওয়া এবং বণিকদের পাওনা টাকা শোধ না করে ফেলে রাখা এ অঞ্চলের বাণিজ্যের অনেকখানি ক্ষতি করেছিল। এ সময়ে এ অঞ্চলে বিদেশী জাহাজ আটক করে বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাও কম নয়।

(গ) পঞ্চাশের দশক থেকে (১৭৪০) বাংলাদেশে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বাংলা এ অঞ্চলে প্রধানত তিনটি পণ্য সরবরাহ করত —সুতীবস্ত্র, রেশম ও চিনি। জাভা ও চীন থেকে সস্তা চিনি[৪] ও চীনদেশ থেকে সস্তা রেশম এ অঞ্চলের বাজারে আসতে থাকে। শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাংলার সুতী বস্ত্রের দাম কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। ফলে বাংলা এ অঞ্চলের বণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্রুত পরাজিত হতে থাকে এবং বাজার হাতছাড়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ ও মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য চলত। এ যুগে শ্রীলঙ্কা ওলন্দাজদের উপনিবেশ। ওলন্দাজরা সাধারণত ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাদের নিজেদের উপনিবেশে বাণিজ্যাধিকার দিতে রাজী হত না। ওলন্দাজদের বাধা নিষেধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে মাঝে মাঝে শ্রীলঙ্কায় বাণিজ্য জাহাজ যেত। মালদ্বীপ থেকে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে কড়ি, শাঁখ ও দড়ি (coire) আমদানি করত। ব্রহ্মদেশের সিরিয়াম ও পেগু থেকে বাংলাদেশে আসত টিন, প্রচুর সাধারণ কাষ্ঠ, চন্দন ও সাপন কাঠ, মোম, হাতির দাঁত ও লাক্ষা। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গৃহ নির্মাণ ও জাহাজ তৈরিতে ব্রহ্মদেশের কাঠ ব্যবহৃত হত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক বহু প্রাচীন। শতকের গোড়ার দিকে এ সম্পর্ক তেমন বিস্তৃত বা বিশাল নয়। সত্তরের দশক থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির যুগ। হোল্ডেন ফারবার (Holden Furber) মন্তব্য করেছেন পশ্চিম এশিয়াতে বাংলা বাণিজ্যে অবনতি শুরু হওয়ার সময় থেকে পূর্বাঞ্চলে শ্রীবৃদ্ধি দেখা দেয়। এ ঘটনাটিকে তিনি 'বাণিজ্য বিপ্লব' (Commercial revolution) আখ্যা দিয়েছেন।[৫] পি.জে. মার্শাল এ দুটি ঘটনার মধ্যে অন্তত তিরিশ বছরের (১৭৪০-১৭৭০) ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন।[৬] বাংলা

৪। কে. গ্ল্যাম্যান, ডাচ এশিয়াটিক ট্রেড, হেগ, ১৯৫৮, পৃঃ ১৬০-১৭০।

৫। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন হোল্ডেন ফারবার, জন কোম্পানি এ্যাট ওয়ার্ক, কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্, ১৯৫১, পৃঃ ১৬০-১৭০।

৬। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ১০৪।

থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে—ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ফিলিপিন ও ইন্দোচীনে—সাধারণত রপ্তানি করা হত আফিম, বিভিন্ন ধরনের সুতীবস্ত্র, রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য। এ অঞ্চল থেকে আমদানি করা হত টিন, লংকা মোম ও নানারকম মশলা—জৈত্রি, জায়ফল, এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি। এ অঞ্চলের ব্যবসায়ে দুটি প্রধান অসুবিধা হল ফিলিপিনের রোমান ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ প্রোটেস্টান্ট বণিকদের এখানে বাণিজ্য করতে দিত না। ইংরাজ বণিকরা আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকদের নামে এখানে ব্যবসা করত। এখান থেকে স্পেনদেশের মধ্য দিয়ে পাওয়া মেক্সিকো রুপো বাংলায় আসত। ঠিক একইভাবে বাটাভিয়াতে ওলন্দাজরা ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহ্য করতে পারত না। এরা আশেপাশের স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন সুলতানদের উপর বাণিজ্যিক একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করত। ফলে এ অঞ্চলের বাণিজ্য অনেকাংশে ব্যাহত হত। ওলন্দাজদের বাধাধান সত্ত্বেও বাংলার জাহাজ সেলাঙ্গর (Selangor), রিয়াও (Riau), প্যালেম্ব্যাঙ্গ (Palembang) ও ট্রেঙ্গানুতে (Trenganu) ব্যবসা করত। এস্থানগুলির সবই মালয় ও মালাক্কা প্রণালীর কাছাকাছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যান্টন বন্দরের মধ্য দিয়ে চীনদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চীনদেশ থেকে চা কিনতে শুরু করে এবং কোম্পানির কর্মচারীরা দেশে টাকা পাঠানোর জন্য কোম্পানির ক্যান্টন ট্রেজারিতে টাকা জমা দিয়ে লন্ডনের উপর বিল অব এক্সচেঞ্জ গ্রহণ করতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারীরা ক্যান্টন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে আফিম বিক্রি করে ঐ টাকা সংগ্রহ করত। আফিমের ব্যবসা চীনদেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত ছিল না বলে কোম্পানি নিজে এ ব্যবসায়ে নামতে পারত না। বাংলার জাহাজগুলি চীনদেশে আফিম ছাড়া কাঁচাতুলা, লংকা ও টিন নিয়ে যেত। মালাবার উপকূলের লংকা, গুজরাটের তুলা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে টিন সংগ্রহ করা হত। ক্যান্টন বন্দর থেকে বাংলার জাহাজগুলি বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে আসত। এগুলির মধ্যে তুতেনাগ (দস্তা ও তামার মিশ্র ধাতু), মোটা চিনি, চা, পোর্সলেনের বাসন ও ফিটকিরি উল্লেখযোগ্য।[৭]

অষ্টাদশ শতকে আফ্রিকার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।[৮] কেনিয়া উপকূলে বাংলার জাহাজ যাতায়াত করত। শতকের মধ্যভাগে বাংলা থেকে কয়েকটি জাহাজ বাণিজ্য উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসেছিল বলে জানা যায়। জাহাজগুলি এদেশ থেকে কড়ি সংগ্রহ করত। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দক্ষিণাঞ্চলে পর্তুগীজ উপনিবেশ মোজাম্বিকেও বাংলার বাণিজ্য জাহাজের দেখা মিলত। আফ্রিকার ক্রীতদাস সংগ্রহ এ বাণিজ্যের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বলে মনে করার কারণ আছে।

৭। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃ. ১০০।

৮। ডেভিড রেণির মন্তব্য, এস. সি. হিল, ঐ, তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ৩৯০ ; জে. গ্রোস, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫ ; এইচ. ভেরেলস্ট, এ ভিউ অব দি রাইজ, প্রগ্রেস এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট স্টেট অব দি ইংলিশ গভর্ণমেন্ট ইন বেঙ্গল, লণ্ডন, ১৭৭২, সংযোজন, পৃঃ ৫৯।

এ যুগের ইউরোপীয় জাহাজ মালিকরা দাস ব্যবসায়কে বেশ লাভজনক বলে মনে করত। শতাব্দীর শেষে বাংলার জাহাজ মাঝে মাঝে সুদূর অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে হাজির হত। এ সময়ে আমেরিকার বণিকরা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে জাহাজ নিয়ে কলকাতায় আসত। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ অধিকার তাদের দিয়েছিল। শতাব্দীর প্রথমভাগে এশীয়দের স্বার্থে বাংলার এশীয় বাণিজ্য পরিচালিত হত। শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনের সঙ্গে বাংলার বেশিরভাগ বাণিজ্য ইংরাজ বণিকদের স্বার্থে গড়ে উঠেছিল। কোম্পানির নিজের এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসা গড়ে উঠেছিল।[৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানির (ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ) সিংহভাগ ছিল। তিনটি কোম্পানিরই বাণিজ্যিক উপনিবেশ ও দুর্গ ছিল। ইংরাজদের কলকাতা ও ফোর্ট উইলিয়ম, ফরাসিদের চন্দননগর ও ফোর্ট আঁরলিও আর ওলন্দাজদের চুঁচুড়া ও ফোর্ট গুস্তাভাস ইউরোপীয় বণিকদের বাংলা বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি। এ ছাড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাশিমবাজার, মালদা, রাজমহল, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও হুগলীতে এ তিন কোম্পানির ব্যবসাকেন্দ্র বা ফ্যাক্টরি ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্প ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন কেন্দ্রে এদের কুঠি ছিল।[১০] এদেশের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গেও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয়দের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি কোম্পানির একটি করে নিজস্ব বণিকগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক মূলধনের কোনো অভাব হত না। দরকার হলে এদেশের বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে তারা স্বচ্ছন্দে টাকা ধার নিত। তাছাড়া জগৎশেঠ পরিবারের নিয়োজিত পুঁজির যোগান ছিল। এদের সুদের হারও খুব চড়া নয়। জগৎশেঠরা বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে বিদেশী বণিকদের টাকা ধার দিত। শতাব্দীর শেষ দিকে বেনারসের বণিকগোষ্ঠী (গোপালদাস ও হরিকিষেণ দাস, মনোহর দাস, দ্বারকাদাস), পাঞ্জাবী (হুজুরিমল), আর্মেনীয় (খাজা ওয়াজেদ), রাজস্থানী ও বাংলার শেঠ ও বসাক বণিকরা বাণিজ্যিক মূলধন সরবরাহ করত। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই প্রয়োজনীয় আর্থিক দিকগুলি ছাড়াও বাংলায় ইউরোপীয় রাজাদের উপযোগী অঢেল সুতীবস্ত্র, মস্‌লিন, রেশম এবং বিহারের সোরা পাওয়া যেত। এই পণ্যগুলি গুণগত মানে উন্নত অথচ দামে সস্তা। বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির ভাল লাভ হত। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তারা সুতীবস্ত্রের রপ্তানি কমিয়ে কাঁচ, রেশম, তুলা, চিনি, নীল, শণ, পাট, তামাক প্রভৃতি ইউরোপে রপ্তানি করতে থাকে।[১১] আশি ও নব্বই এর দশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাঁচা

৯। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ১০৫।

১০। এস. ভট্টাচার্য, দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল, ১৭০৪-১৭৪০, পৃঃ ১০-১৫।

১১। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯।

রেশম ৮ টাকা সের দরে কিনত। এ সময়ে লণ্ডনের বাজারে এর দাম ২৩ টাকা সের।[১২] সোনামুখীতে কোম্পানি গরা কাপড় কিনত প্রতিখণ্ড তিন টাকা বারো আনা দামে। ইউরোপের বাজারে এর প্রতি খণ্ডের দাম তখন বাইশ টাকা বারো আনা। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বিহারের সোরা প্রতিমণ ২-১৩-১ পয়সা হিসেবে কিনত এবং কমিশনসহ সব খরচ মিলিয়ে দাম পড়ত ২-১১-০ আনা। অথচ এ পণ্য ইউরোপে বিক্রি করে কোম্পানিগুলি প্রচুর মুনাফা করত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্য একরকম নয়। সারা শতাব্দীতে ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ দিকে স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭০২-১৭১৩), রিজেন্সি কাউন্সিলের বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে নিস্পৃহতা, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) এবং ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগর অধিকার, আমেরিকার স্বাধীনতা সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৭৮-৮৩), শেষ দিকে বিপ্লবী যুদ্ধের (১৭৯২-৯৯) ফলে ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য তেমন জোরালো হতে পারেনি। শুধু চন্দননগরে ডুপ্লের থাকাকালীন (১৭৩১-৪১) এ বাণিজ্যে কিছুটা প্রাণসঞ্চার হয়েছিল। তাঁর পণ্ডিচেরি গমনের পর ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দাভাব দেখা দেয়। শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয়দের মধ্যে ওলন্দাজরা বাংলা বাণিজ্যের প্রধান পক্ষ। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনেকখানি তাদের হাতে ছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশীযুদ্ধের পর ওলন্দাজরা বাটাভিয়াতে মশলার ব্যবসার দিকে বেশি ঝুঁকেছিল। এ ব্যবসা তখন বেশ লাভজনক।[১৩] এ সময় থেকে ইংরাজরা রাজশক্তি হাতে পাওয়ায় বাংলার আন্তর্জাতিক বাজারের দুটি প্রধান পণ্য—আফিম ও সোরা—নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ওলন্দাজরা তাদের বাংলা বাণিজ্য ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতায় কোনমতে চালিয়ে গেল। ঠিক এ সময়ে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সিংহভাগ ইংরাজদের হাতে চলে যায়।

প্রাক্-পলাশীযুগে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলসম্রাট ফারুখসিয়ার এক আদেশ বা ফারমান জারি করে কোম্পানিকে কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েছিলেন। এগুলি হলঃ (১) বাৎসরিক ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার; (২) কলকাতার পাশে আরো ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কেনার অধিকার; (৩) বাংলার রাজশক্তিকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল কোম্পানির পণ্য চুরি হলে চোর ধরে শাস্তি দিতে হবে এবং কোম্পানির পণ্য ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে; (৪) কোম্পানির মাদ্রাজ টাকার (মাদ্রাজ আর্কট) উপর বাট্টা নেওয়া চলবে না; (৫) সবসময় বাদশাহী ফারমানের মূল কপি দাবী করা

১২। ঐ, ঐ, পৃঃ ১৭৭, ১৯১, ২১৪-১৫। বাংলাদেশে কাঁচা রেশমের দাম মাঝে মাঝে ৯ টাকা থেকে ১২ টাকা পর্যন্ত উঠে যেত।

১৩। এস. ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ৭।

চলবে না ; কাজীর প্রত্যয়িত কপি দেখালে যথেষ্ট হবে। (৬) কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণীব্যক্তি বা কর্মচারী পলাতক হলে তাকে আটক করে কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হবে ; (৭) ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইংরাজ জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা চলবে না ; বরং এরকম ক্ষেত্রে ইংরাজদের সাহায্য করতে হবে ; (৮) কোম্পানির পণ্যতরীর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সহিযুক্ত 'দস্তক' থাকলে তরী আটক বা অনুসন্ধান কোনটাই চলবে না ; (৯) বাংলা সরকারের অসুবিধা না হলে বাংলার টাঁকশালে কোম্পানির সোনা-রুপো টঙ্কনের অধিকার দিতে হবে।

সম্রাট ফারুখসিয়ারের ফারমানকে বাংলাদেশে ইংরাজ কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪]

প্রথমত, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে তুলনায় বাদশাহী ফারমানে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনেকগুলি বাড়তি বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা পায় এবং এর পর থেকে কোম্পানির বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সম্রাট শাহজাহানের সময় থেকে ইংরাজ কোম্পানি বাংলাদেশে যে সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করত নতুন ফারমানে সেগুলি আইনগত স্বীকৃতি পায়।

তৃতীয়ত, বাদশাহী ফারমানে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে বিশেষ অধিকারগুলি তারা পেল তাতে বলা যায় কোম্পানি বাংলাদেশে অতি-আঞ্চলিক অধিকার (extra-territorial privileges) লাভ করেছিল।

মুর্শিদকুলি বাদশাহী ফারমান অনুযায়ী কোম্পানির সরকারি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিনাশুল্কে করতে দিতে রাজী হলেন। তবে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এর অন্তর্ভুক্ত হল না। কলকাতার পাশে আরো আটত্রিশখানি গ্রাম কেনার অধিকার তার মনঃপূত হয়নি। তাঁর বাধাদান সত্ত্বেও কোম্পানি ঐ গ্রামগুলি বেনামে কিনতে সক্ষম হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের অধিকার কোম্পানি কখনো পায়নি আর মাদ্রাজ টাকার উপর ধার্য বাট্টার প্রশ্নটিও অমীমাংসিত থেকে যায়।

প্রাক্-পলাশীযুগে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাংলা বাণিজ্যের ধরন (pattern) অনেকটা এক রকম। বিদেশী কোম্পানিগুলি এদেশীয় বণিক, দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে পণ্য কেনার আগাম ব্যবস্থা করত। এর সমকালীন ইংরাজী নাম ইনভেস্টমেন্ট (investment)—অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের আগেই তাতে দাদন বা অগ্রিমের মাধ্যমে কোম্পানিগুলির অধিকার এসে যেত। যারা উৎপাদকদের দাদন দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করত তারা হল দাদ্নি ব্যবসায়ী। এরা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট দামে ও গুণগতমানে কোম্পানিগুলিকে পণ্য সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ থাকত। এজন্য দাদ্নি ব্যবসায়ীরা কমিশন পেত এবং কোম্পানীগুলি আগেই পণ্য দামের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ এদের আগাম দিত। কোম্পানিগুলির এভাবে পণ্য কেনার ব্যবস্থা চুক্তি

১৪। এস. ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ২০-২১।

ব্যবস্থা বা 'কন্ট্রাক্ট সিস্টেম' ( contract system ) নামে পরিচিত। ১৭০০ থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য কিনেছিল। পঞ্চাশের দশকে এ ব্যবস্থায় নানাপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকে।[১৫] কোম্পানি সময়মত পণ্য পেত না; পণ্যের নির্দিষ্টমান বজায় থাকত না আর দামও বেশি পড়ত। দাদনি ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। উপরন্ত তাদের উদ্ধত ব্যবহার কোম্পানিকে পণ্যক্রয়নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানি বাংলাদেশে পণ্য কেনার নতুন ব্যবস্থা চালু করে দেয়। নতুন ব্যবস্থার নাম 'এজেন্সি সিস্টেম' ( agency system ) অর্থাৎ কোম্পানি সরাসরি তার এজেন্ট ও গোমস্তাদের মাধ্যমে উৎপাদকদের আগাম দেওয়া ও নির্দিষ্ট পণ্য সরবরাহের চুক্তি করত। কোম্পানি ও উৎপাদকদের মাঝখানে দাদনি ব্যবসায়ীরা রইল না।

১৭৫৩ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানি বাংলা দেশে পণ্য কিনেছিল। পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় এবং দস্তকের অপব্যবহার করে তারা প্রচুর অর্থোপার্জন করতে থাকে। কোম্পানির গোমস্তারা জবরদস্তি ব্যবসা করে বাংলার তাঁতিদের ৩০, ৪০ বা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাজার দর থেকে দাম কম দিত।[১৬] ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির 'আড়ঙ্ কমিটি' বাণিজ্যিক বিনিয়োগ দেখাশোনা করত। পরে 'কন্ট্রোলিং কমিটি অব কমার্স' ঐ দায়িত্ব পায়। 'কন্ট্রোলার অব ইনভেস্টমেন্ট' কমিটির সঙ্গে একযোগে তদারকির দায়িত্ব পালন করত। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ 'বোর্ড অব ট্রেড' কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বোর্ড অব ট্রেড কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে 'কন্ট্রাক্ট সিস্টেম' বা চুক্তির মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এদেশীয় বণিকরা কোম্পানির কর্মচারীদের সহযোগী হিসাবে কোম্পানির পণ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আয়ের একাংশ তারা কোম্পানির কর্মচারীদের দিতে বাধ্য হত। স্বাধীন দাদনি বণিক হিসাবে এরা সরাসরি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে পারত না। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির সংগৃহীত রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়লো অথচ গুণগতমানে ঘাটতি দেখা গেল। বোর্ড অব ট্রেডের কাজকর্মে নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখা দেওয়ায় কর্ণওয়ালিশ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা এগারো থেকে কমিয়ে পাঁচ করেন; আর পণ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এজেন্সি সিস্টেম চালু করেন। এছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে, বর্ধিত বেতন ও কমিশন দিয়ে তিনি কোম্পানির বাণিজ্য দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।[১৭]

প্রাক্-পলাশী যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে প্রধানত

১৫। কোম্পানির পণ্যক্রয় নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যায় আট দ্রঃ।
১৬। এন. কে. সিংহ. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২।
১৭। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য অধ্যায় নয় দেখুন।

সোনা ও রুপো নিয়ে আসত। পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের বাংলায় আমদানিকৃত মোট পণ্যের ৭৪ শতাংশ এই দুই ধাতু। পলাশীর পরে বাংলাদেশে পণ্য কেনার জন্য কোম্পানির পুঁজি হিসাবে সোনা-রুপো আনার আর দরকার হত না। ১৭৬০ সনের মধ্যে তারা চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি পেয়েছিল; ১৭৬৫ সনে দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব (surplus revenue) তাদের বাণিজ্যের পুঁজি হল। ১৭৬৫-র তিরিশে সেপ্টেম্বর ক্লাইভ লণ্ডনে ডিরেক্টর সভাকে লিখছেন ঃ 'দেওয়ানি নেওয়ার ফলে বৎসরে আড়াই কোটি টাকা আয় হবে। এ আয় পরে আরো ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা বাড়বে। সাধারণ শাসন ও সামরিক ব্যাপারে বছরে ৬০ লাখ টাকা ব্যয় হবে। নবাবের ভাতা কমিয়ে ৪২ লাখ করা হয়েছে, মোগল দরবারে ২৬ লাখ টাকা দিতে হবে। এই এককোটি ২৮ লাখ টাকা বাদ দিয়ে নীট লাভ এককোটি ২২ লাখ টাকা কোম্পানির হাতে থাকবে।'[১৮] ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি শাসনের যে রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করা হয় তাতে দেখা যায় মোট এক কোটি ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ৭৬১ পাউন্ড আয় হয়েছে, ব্যয় হয়েছে ৯০ লাখ ২৭ হাজার ৬০৯ পাউন্ড, মোট ৪০ লাখ ৩৭ হাজার ১৫২ পাউন্ড ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছে। ভারত থেকে আমদানি করা সব পণ্যের দাম কোম্পানির হাতে রাজস্ব বাবদ মুনাফার দ্বারা মেটানো যেত। ১৭৮৩ সনের সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে 'বিনিময়ে কিছু না দিয়েই ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'[১৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ব্রড ক্লথ (সুতী ও পশমের মিশ্র একধরনের ঝকমকে কাপড়), পশমের কাপড়, দস্তা, সীসা, লোহা, টিন, তামা, পারদ ও ঔষুধপত্র ও অন্যান্য ছোটখাট জিনিস নিয়ে আসত। কোম্পানি তার আমদানি করা কাপড় বাংলায় বিক্রি করার এবং এ পণ্যের বাজার তৈরি করার খুব ইচ্ছা ও উৎসাহ দেখিয়েছিল। তাদের আমদানি করা কাপড় অবশ্য বাংলাদেশে বেশি বিক্রি করা সম্ভব হত না। এগুলি বছরের পর বছর গুদামে পড়ে থাকত।[২০] ইংরাজ কোম্পানির অন্যান্য পণ্যগুলির মধ্যে ধাতু ও ধাতব পণ্যগুলি বাংলার বাজারে ভাল বিক্রি হত। তবে এক্ষেত্রে তাদের ওলন্দাজ ও ফরাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হত। তারাও অনুরূপ পণ্য বাংলার বাজারে বিক্রির জন্য আনত। কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের লাভ আমদানি বাণিজ্যের লোকসান পুষিয়ে দিত। এ যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে নানাধরনের সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, কাঁচা রেশম, মসলিন ও সোরা ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় বাজারের জন্য সংগ্রহ করত। ১৭০০ ও ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ড নিজের পশম ও রেশমবস্ত্র

১৮। বিনয় চৌধুরী, ঐ. পৃঃ ১৩।

১৯। ঐ

২০। লেটার টু দি কোর্ট, ৮ ডিসেম্বর, ১৭৫৫।

শিল্পকে রক্ষার জন্য বাংলা তথা ভারতের সূতী ও রেশম বস্ত্রের আমদানি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় এবং বাংলাবস্ত্রের উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। তবে ইউরোপের বাজারে বাংলার সুতী ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা থাকাতে বাংলার বস্ত্রশিল্পের উপর বৃটিশ সংরক্ষণ নীতির প্রভাব তেমন ক্ষতিকর হয়নি। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে রেশম কিনত। ক্রমশঃ এর পরিমাণ বেড়ে ১৭৩৪-এ দু লক্ষ ন হাজার একশ ছেষট্টি পাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল।[২১] ১৭৫১ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক রেশম সংগ্রহের পরিমাণ চল্লিশ থেকে আশি হাজার পাউন্ডে দাঁড়ায়। কোম্পানি বাংলা থেকে সংগৃহীত আফিম চীন, জাভা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত।

প্রাক্-পলাশী যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়াত চব্বিশ লক্ষ টাকা।[২২] ১৭০৮ থেকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি বাংলাদেশে ৫,১২,৪৮,১৮৪ টাকা দামের সোনারুপো এবং ১,৮২,৭০,৭৪৪ টাকা মূল্যের বাণিজ্য পণ্য এনেছিল। শতকের প্রথম বছরে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮,৯৬,৯৬৮ টাকা।[২৩] শতকের মধ্যভাগে ১৭৫৫ সনে রপ্তানি বাণিজ্য বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩২,৯২,০৪০ টাকা। প্রাক্-পলাশী যুগে ১৭৪২-এ কোম্পানি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করেছিল। ঐ বছর কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৪৪,৮৩,১৬০ টাকা। এ সময়ে কোম্পানির শেয়ার মালিকরা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল। এ যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মোট এশীয় বাণিজ্যের ৬০ শতাংশ বাংলার সঙ্গে হত। পলাশী-উত্তর যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর কোম্পানি কয়েকটি রপ্তানি পণ্য—সুতীবস্ত্র, আফিম, রেশম, সোরা—এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। বাণিজ্য পুঁজির অভাব ছিল না; ফলে বিনিয়োগ অনেকখানি বেড়ে গেল। ১৭৬৭তে কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো ষাট লক্ষ চালানি টাকা। ঠিক দশ বছর পরে কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ এক কোটি টাকা। আশি ও নব্বই-এর দশকে কোম্পানির গড় রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল এক কোটি টাকা। ১৭৯১ ও ১৭৯৩ সনে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো যথাক্রমে ১,০৬,০০,১০৯ ও ১,০৯,৫৯,১৩০ চালানি টাকা।[২৪]

শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোম্পানির বাংলা বাণিজ্যের উপর ইংল্যাণ্ডের শিল্প

২১। কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ৫৩৪।
২২। ঐ. পৃঃ ৫০৯-৫১০।
২৩। পাউন্ডের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার এক পাউন্ড সমান আট টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে। প্রাক্-পলাশী যুগে বিনিময় হার এক পাউন্ড সমান আট থেকে নয় টাকা; উত্তর পলাশী যুগে এক পাউন্ড সমান দশ টাকা।
২৪। এন কে. সিংহ ঐ প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৮। ও অমলেশ ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৩৬-৩৭। শেষোক্ত গ্রন্থে শতকের শেষ দিকে কোম্পানির বাণিজ্যের বিস্তৃত হিসাব আছে।

বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কোম্পানি বাংলা থেকে ছাপা সুতীবস্ত্র আমদানি বন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, ম্যানচেস্টারে যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত মসলিন বাংলায় পরীক্ষামূলকভাবে আমদানি করা হয়। এ মসলিনের দাম ২০ শতাংশ কম। তৃতীয়ত, যন্ত্রে প্রস্তুত উন্নত সুতো বাংলায় আমদানি করা হয় ও বাংলা থেকে সুতো রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থত, কোম্পানি সুতীবস্ত্রের পরিবর্তে (substitute বাংলা থেকে কাঁচা তুলা, রেশম, চিনি, নীল, শন, পাট, তামাক প্রভৃতি রপ্তানি করার কথা চিন্তা করতে থাকে। অর্থাৎ সুতীবস্ত্রের আমদানি অচিরে বন্ধ হবে এ সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কোনো সন্দেহ ছিল না। মোটা সুতীবস্ত্রের উপর প্রথম আঘাত আসে। এর রপ্তানি ক্রমশঃ কমতে থাকে। তবে সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের রপ্তানিতে এই শতাব্দীতে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা যায় না। রেশম রপ্তানিতেও তেমন কোনো হেরফের হয়নি। ১৭৯৩তে কোম্পানি ৬৭,৬৮,৪০৮ টাকার ৮,৩৯,৯০৬ খণ্ড সুতীবস্ত্র এবং ২৫,৮৬,৮৪৭ টাকা মূল্যের রেশম রপ্তানি করেছিল। ১৭৯৫ সনে রপ্তানি করা সুতীবস্ত্রের পরিমাণ হল ৮,৬৭,০৪০ খণ্ড।[২৫]

**ওলন্দাজ বাণিজ্য ঃ** প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইংরাজদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হল ওলন্দাজরা। শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে ওলন্দাজ বাণিজ্যের পরিমাণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য থেকে কিছু পরিমাণে বেশিই ছিল। ১৭৫৬-৫৭ সনে তাদের ইউরোপীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ৪২,১৯,৭৩৭ গিল্ডার্স।[২৬] এ সময়ে বাংলার সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রে তাদের কুঠি ছিল! ১৭৩৯ সনে কাশিমবাজারে ওলন্দাজ কোম্পানি ১,৫৩,০০০ টাকা ব্যয়ে এক বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে আবার সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়।[২৭] ১৭৩৩ সনে ওলন্দাজ কোম্পানির শেয়ার মালিকরা ২৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল। প্রাক্-পলাশী যুগে ওলন্দাজ কোম্পানির মোট এশীয় বাণিজ্যের ৩৩ শতাংশ বাংলার সঙ্গে। বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক ধরনও অনেকটা ইংরাজদের মত। ইংরাজদের মত ওলন্দাজরা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ (১৭০৯) এবং জাহান্দর শাহের (১৭১২) নিকট থেকে বাদশাহী সনদ আদায় করে ২½ শতাংশ শুল্ক দিয়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করত। মাথা পিছু কর (capita tax) থেকে রেহাই পেয়েছিল। তবে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তুলনায় ওলন্দাজ কোম্পানির কতকগুলি অসুবিধা ছিল। প্রথমত, তাদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সংগঠন তেমন ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে শতাব্দীর শেষ দিকে,

২৫। এন. কে. সিংহ. ঐ. প্রথম খণ্ড. পৃঃ ১৮।

২৬। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কোম্পানির ডিরেক্টর এ. বিসডমের চিঠি, ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ ও এস. সি. হিল, ঐ. ১ম খণ্ড পৃঃ ২৯।

২৭। ঢাকাতে ওলন্দাজদের আগের কুঠি ১৬৯০ সনে পরিত্যক্ত হয়। কে. কে. দত্ত, দি ডাচ ইন বেঙ্গল এ্যান্ড বিহার, ১৭৪০-১৮২৫, পৃঃ ১-১৯।

তাদের বাণিজ্যিক পুঁজির অভাব হত। দ্বিতীয়ত, ওলন্দাজ কোম্পানি ইন্দোনেশিয়া (বাটাভিয়া) কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার ও সিংহলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তারা বাংলাদেশের বাণিজ্য ও রাজনীতিকে তেমন প্রাধান্য দেয়নি। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে তাদের কর্মচারীরা রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা বা কূটবুদ্ধির স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সবগুলি রাজনৈতিক সংকটে তারা পরাজিত পক্ষে ছিল—সরফরাজ খাঁ, মারাঠা, দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও মীরজাফর।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত ওলন্দাজ কোম্পানি অগ্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে রপ্তানি পণ্য কিনত। তাদের মত ইউরোপ থেকে সোনা ও রুপো আনত এবং সঙ্গে থাকত পশমের কাপড়। তবে ওলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধনের সমস্তটাই ইউরোপ থেকে আসত না। ওলন্দাজ কোম্পানি জাপান থেকে তামা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে টিন ও দস্তা এবং ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে নানারকম মশলা—লংকা, লবঙ্গ, জৈত্রি, জায়ফল প্রভৃতি বাংলাদেশে নিয়ে আসত। এগুলি বাংলায় বিক্রি করে রপ্তানি পণ্যের পুঁজি সংগ্রহ করা হত। ওলন্দাজরা বাংলার পণ্যসম্ভার নিয়ে যেত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ইউরোপীয় বাজারে। রপ্তানি বাণিজ্যে ইংরাজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের একটি প্রধান পার্থক্য হল ইংরাজরা বাংলা থেকে প্রধানত সুতীবস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা নিয়ে যেত আর ওলন্দাজরা সোরা ও আফিমকে প্রাধান্য দিত। তারপর আসত সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম। নেপাল থেকে বিহারে আমদানি করা সোহাগা ও বাংলার মাখনও তাদের রপ্তানি পণ্য তালিকায় স্থান পেত।

পলাশী-উত্তর যুগে ওলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এ সময় থেকে বাণিজ্যিক পুঁজি সংগ্রহ করায় আর কোনো অসুবিধা হল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বিপুল পরিমাণ টাকা ওলন্দাজ কোম্পানির উপর বিল অব একস্চেঞ্জের মাধ্যমে ইউরোপে পাঠাত। ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা করার জন্য কোম্পানির হাতে যথেষ্ট পুঁজি মজুদ হল। দ্বিতীয়ত, তাদের দুটি প্রধান রপ্তানি পণ্য আফিম ও সোরা ব্যবসায়ে ইংরাজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ওলন্দাজ কোম্পানির ব্যবসা অনেকখানি ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্লাইভ ওলন্দাজদের জন্য বিহারের ২৮,৫৭৯ মণ সোরা বরাদ্দ করেছিলেন; শতাব্দীর শেষ দিকে তারা পেত ৫০০ বাক্স আফিম।[২৮] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা থেকে বেশী করে সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম কিনতে থাকে। তৃতীয়ত, পলাশী-উত্তর যুগে ওলন্দাজ কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার ও বাধাদানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হত। ওলন্দাজদের তাঁতি, আফিমচাষী, গোমস্তা ও কর্মচারীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে নিগৃহীত হত; এরা মুঘল সম্রাটদের প্রদত্ত ফারমানের

২৮। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২, ৬৫।

কোনো মূল্যই দিত না। ওলন্দাজ কোম্পানির ডিরেক্টর এ. বিসডম ও টিটসিং-এর চিঠিতে এর উল্লেখ আছে।[২৯] শতাব্দীর শেষ দিকে ওলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্য মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত। ইংরাজ কোম্পানির বোর্ড অব ট্রেডের ১৭৮৭র রিপোর্টে বলা হয়েছে 'এ বছর মনে হচ্ছে ওলন্দাজদের কোনো বিনিয়োগ ( বাণিজ্য ) নেই'।[৩০]

**ফরাসি বাণিজ্য ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা বাণিজ্যে তৃতীয় প্রধান অংশীদার হল ফরাসিরা। চন্দননগরে তাদের প্রধান ঘাঁটি ছাড়াও কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা ও বালেশ্বরে তাদের বাণিজ্য কুঠি ছিল। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহর বাদশাহী ফারমানের বলে ফরাসিদের দেয় বাণিজ্য শুল্ক শতকরা ৩½ থেকে কমে ২½তে দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্যকে চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ (১) ১৭০০-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য; (২) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ( ১৭৫৬-৬৩ )[৩১] ফরাসি কোম্পানি ও স্বাধীন বণিকদের বাণিজ্য (১৭৬৪-১৭৬৯), (৩) ১৭৬৯-এ ফরাসি সম্রাট ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বাতিল করে দিলে ঐ বছর থেকে ১৭৭৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফরাসি স্বাধীন বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসা করেছিল, (৪) ১৭৮৩তে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর কালোনের (Calonne) ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি নতুন ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। ১৭৯০তে ফরাসি দেশের বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ, প্রাচ্যের বাণিজ্য অবাধ ও উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করে।

প্রথম পর্যায় ঃ প্রথম পর্যায়ের প্রথম দিকে ফরাসি কোম্পানির বাংলা বাণিজ্য খুব সামান্য ছিল। শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরাজ বণিক হ্যামিলটন হুগলীতে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন চন্দননগরে ফরাসিদের একটি সুন্দর ছোট চার্চ আছে। বাংলাদেশে তাদের প্রধান কাজ হল চার্চে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করা। ডুপ্লে চন্দননগরে গভর্ণর হয়ে আসার আগে (১৭৩১) মাত্র ৬ খানি দেশী নৌকা ফরাসিদের বাণিজ্য পণ্য বহন করত। মাঝে মাঝে তাদেরও কাজ থাকত না। ডুপ্লে গভর্ণর হয়ে আসার পর বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ৩০ থেকে ৪০ খানি জাহাজ ফরাসি বাণিজ্যপণ্য বহন করার জন্যে দরকার হত। এ যুগে চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও হুগলীর আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদের মাধ্যমে ফরাসিদের পণ্য বেচা কেনা চলত। ১৭৩৩-এ পাঁচখানি জাহাজে ফরাসিদের রপ্তানি পণ্য ইউরোপে পাঠানো হয়েছিল। ডুপ্লে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের অনেকগুলি নতুন বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পণ্য কেনার ব্যবস্থা করলেন। ১৭৪১-এ ডুপ্লে যখন

২৯। লেটার ফ্রম চিনসুরা, ৩০ জুন. ১৭৬২ ও প্রসিডিংস্. বোর্ড অব ট্রেড, ৫ ডিসেম্বর, ১৭৮৭।

৩০। প্রসিডিংস, বোর্ড অব ট্রেড ২ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮।

৩১। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ( ১৭৫৬-৬৩ ) এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংক্রান্ত যুদ্ধে ( ১৭৭৮-৮৩ ) ইংরাজ ও ফরাসিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

গভর্ণর জেনারেল হয়ে পন্ডিচেরীতে গেলেন তখন বাংলাদেশে ৭২ খানা জাহাজ ফরাসি বাণিজ্য পণ্য বহন করত। বাংলার পণ্য তিনি সুরাট, জেদ্দা, মোখা, বসরা, পারস্য ও চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন। এমন কি তিব্বতের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩২]

ইংরাজ ও ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা বাংলাদেশে আগাম ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য কিনত। অনেক সময় একই বণিক গোষ্ঠী ইংরাজ ও ফরাসিদের পণ্য সরবরাহ করত। বাংলার বণিক ও উৎপাদকরা ফরাসিদের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহ দেখাত কারণ তারা বেশ লাভজনক শর্ত দিত। এজন্য ফরাসিদের বাংলাদেশে পণ্য সংগ্রহে কোনো অসুবিধা হত না। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা এদেশে সোনা, রুপো, তামা, টিন, দস্তা, সীসা ও পশমের কাপড় আনত, আর বাংলা থেকে ইউরোপীয় বাজারের জন্য নিয়ে যেত সুতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র, রেশম ও সোরা। এশীয় দেশগুলির জন্যে, এগুলি ছাড়া, ফরাসিরা বাংলা থেকে চিনি, আফিম, লাক্ষা, চাল, কড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করত।[৩৩]

ডুপ্লের পর বাংলাদেশের ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দা দেখা দেয়। এর কারণ প্রধানত দুটি (ক) বাংলা বাণিজ্যের জন্য ফরাসিদের যথেষ্ট মূলধন ছিল না আর (খ) চন্দননগরে ডুপ্লের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাণিজ্যিক কাজকর্মে অনুৎসাহ। ১৭৪১ থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য অনেকটা প্রাণহীন; গতিহীন (stagnant) অবস্থায় ছিল। ১৭৫৩-৫৪ থেকে বাংলায় ফরাসি বাণিজ্যের দ্রুত অধোগতি শুরু হয়। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের কাগজপত্রে এ সময়কার ফরাসি বাণিজ্যের ক্রমাবনতি সম্পর্কে মন্তব্য আছে। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে নিলেন।

**দ্বিতীয় পর্যায়ঃ** এপর্যায়ে বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্য প্রকৃতপক্ষে ফরাসি বণিকদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য। এ যুগে ফরাসি বণিকদের বাণিজ্যিক মূলধন সংগ্রহে কোনো অসুবিধা হয়নি। ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের টাকা নিয়ে ইউরোপে 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' দিত। এভাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার মত যথেষ্ট মূলধন তারা সংগ্রহ করতে পারত। এযুগে ফরাসি বণিকরা ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীদের জবরদস্তি ও জুলুম সত্ত্বেও বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে—বাউলিয়া, রাধানগর, সোনামুখী, রংপুর, মেদিনীপুর, কাশিমবাজার, পাট্টাহাট (ঢাকার কাছে), খিরপাই, হরিয়াল, শান্তিপুর, মালদা, পাটনা ও ঢাকায় বস্ত্র ও রেশম, রেশমী বস্ত্র, সোরা ও আফিম কিনত। অনেক সময় পণ্য কেনার

৩২। ক্যালকাটা রিভিয়্যু, ১৮৬৬, পৃ: ১৩২-৩৩।

৩৩। ইন্দ্রাণী রায়, দি ফ্রেন্স কোম্পানি এ্যাণ্ড দি মার্চেন্টস্ অব বেঙ্গল, ১৬৮০-১৭৩০, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিয়্যু, ৮ম খণ্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৪১ ৫৫। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে ফরাসি বাণিজ্যের উপর ইন্দ্রাণী রায়ের অন্যান্য প্রবন্ধ দ্রঃ।

প্রশ্নে ইংরাজ কর্মচারীদের সঙ্গে ফরাসি বণিকদের বিরোধ দেখা দিত। তবে এ পর্বে ফরাসিরা ইংরাজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে তাদেরই সহযোগিতায় বাংলায় বাণিজ্য করেছিল।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুন ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হলে বাংলাদেশে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অভ্যন্তরীণ বাজারে ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। এ যুগে বাংলা ও বিহারের আফিম ও সোরার ব্যবসা ইংরাজদের কুক্ষিগত। ফরাসিরা বেশি দাম দিয়ে সুতীবস্ত্র ও রেশম কিনতে পারে এ ভয়ও ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছিল। শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য সহযোগিতার প্রশ্নে দুই কোম্পানির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয় ফরাসি কোম্পানি বাংলা-বিহার থেকে বার্ষিক মোট ১৮,০০০ মণ সোরা ও দুশ বাক্স আফিম পাবে। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের ২$\frac{১}{২}$ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হবে।[৩৪] নতুন ফরাসি কোম্পানি বাংলাদেশে মূলধন হিসাবে সোনা-রুপো আনত। এতে ইংরাজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ খুশীই হয়েছিল কারণ এসময় বাংলাদেশে রুপোর ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এ পর্বেও ফরাসি কেম্পানির সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীদের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার বিভিন্নস্থানে জোর করে ফরাসি কোম্পানির বাণিজ্য নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। ঢাকা, মালদা, খিরপাই, শান্তিপুর ও পাটনাতে সুতীবস্ত্র, রেশম, আফিম ও সোরা কেনার প্রশ্নে ফরাসি ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে জোর বিবাদ দেখা দেয়। ফরাসিদের পণ্য কেনার প্রতিযোগিতামূলক বাজারের রীতি অনুযায়ী পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এতে ইংরাজ বণিকদের লাভের হার কমে আসে। এবং তারা ক্ষুব্ধ হয়।[৩৫] শতাব্দীর শেষ দিকে বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্বে ফরাসিরা বাংলাদেশে সুনামের সঙ্গে বাণিজ্য করে প্রচুর রুপো আনে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়া তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।

**অন্যান্য বিদেশী বণিকগোষ্ঠী ঃ** প্রধান তিনটি কোম্পানি ছাড়াও আরো তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেছিল। এরা হল দিনেমার, বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড এবং জার্মানীর রয়্যাল প্রাশিয়ান কোম্পানি। দিনেমাররা চন্দননগরের কাছে গোঁদলপাড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা করত। ইংরাজদের মত বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার জন্যে দিনেমারার সম্রাটের ফারমান যোগাড় করার চেষ্টা করেছিল। তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭১৪তে ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদকুলি সরকারের সঙ্গে দিনেমারদের মনোমালিন্য দেখা দিলে তারা বাংলাদেশের উপনিবেশ ছেড়ে তাদের দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশ ট্রাঙ্কুভারে

৩৪। এন. কে সিংহ, ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২।
৩৫। প্রসিডিংস্, বোর্ড অব ট্রেড, ১৯ অক্টোবর ১৭৮৭।

চলে যায়। সরকার ও দিনেমারদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে ইংরাজরা দিনেমারদের বাংলাদেশে রাখার চেষ্টা করেছিল। তাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭১৪ থেকে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা বাণিজ্যে দিনেমারদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।[৩৬] আলিবর্দির রাজত্বের শেষ দিকে (১৭৫৫) দিনেমাররা বাংলা দেশে ফিরে এসে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে। দিনেমাররা ফরাসি ও ওলন্দাজদের মত কক্সবন্দরে (হুগলী) ২½ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করত। এদেশের রাজশক্তি তাদের পণ্যতরী অনুসন্ধান করে দেখতে পারত না বা পণ্যের তালিকা দাবী করতে পারত না। ১৭৮১ সনে ডেনমার্কের রাজা দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভেঙ্গে দেন এবং ভারতের বাণিজ্য সবার জন্যে অবাধ ও উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। শতাব্দীর শেষ দিকে দিনেমার বণিকরা কোম্পানির জন্যে নির্দিষ্ট ২½ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করত। এ যুগে তারা প্রধানত ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পণ্য বহন করত।[৩৭]

সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত অস্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ডস বা বেলজিয়ামের বণিকদের নিয়ে গঠিত অস্টেণ্ড কোম্পানিকে ১৭২৩-এ আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা প্রথম থেকেই এই নতুন ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভাল চোখে দেখেনি। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের কাছে তাঁরা এ কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে আবেদন করেছিল। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের বাধাদান সত্ত্বেও ১৭২৬ থেকে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সময়কালে ইংরাজ আলেকজান্ডার হিউম ও সোনামিলির (Schonomilli) অধীনে অস্টেণ্ড কোম্পানি গঙ্গার পূর্বতীরে ব্যারাকপুরের নিকট বাঁকিবাজারে কুঠি স্থাপন করে বাংলাদেশে বাণিজ্য করেছিল। বহরমপুর ও ঢাকায় এদের কুঠি ছিল এবং ইউরোপীয় ও অভ্যন্তরীণ দুধরনের বাণিজ্যেই তারা অংশ নিত।[৩৮] এদেশের শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৭২৮ সনে সম্রাট সাত বছরের জন্য এদের প্রাচ্য দেশের বাণিজ্য বন্ধ রাখতে রাজী হয়েছিলেন তবুও এদের বাংলা বাণিজ্য বন্ধ হল না। অস্টেণ্ড কোম্পানি বাংলাদেশে বেশি দাম দিয়ে প্রচুর জিনিস কিনত—সুতীবস্ত্র, রেশম, রেশমী বস্ত্র, সোরা ইত্যাদি—আর ইউরোপ থেকে আমদানি করা পণ্য সস্তায় বিক্রি করত। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় ইংরাজ ও ওলন্দাজরা বলপ্রয়োগে অস্টেণ্ড কোম্পানির জাহাজ, স্লুপ ইত্যাদি অধিকার করে লুণ্ঠ করতে শুরু করে। ১৭৩০ সনের জানুয়ারী মাসে তাদের জাহাজ সেন্ট টেরেসা ইংরাজরা দখল করেছিল। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন অস্টেণ্ড কোম্পানিকে বিতাড়ন করার

৩৬। এস ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ৭৯।

৩৭। এন. কে. সিংহ. ঐ. ১ম খণ্ড, সংযোজন বি পৃঃ ২৪৮।

৩৮। লুক বোয়েভা (Luc Boeva), 'দি ফ্যাক্টরি অব বাঁকি বাজার ইন বেঙ্গল', 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট, জানুয়ারী-জুন, ১৯৮০, পৃঃ ৬০।

কথা ঘোষণা করলেন।[৩৯] ইংরাজ ও ওলন্দাজদের চরম শত্রুতা, বিরোধিত ও সরকারি ঔদাসীন্য উপেক্ষা করে অস্টেন্ড কোম্পানি ১৭৪৪ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে টিঁকে ছিল। ঐ বছর সরকারি আদেশে তাদের বাংলা বাণিজ্যের উপর যবনিকাপাত ঘটে।[৪০]

আলিবর্দির সময়ে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক রয়্যাল প্রাশিয়ান বেঙ্গল কোম্পানি গঠন করে প্রাচ্য দেশে ও বাংলায় বাণিজ্য করতে চেয়েছিলেন। আলিবর্দি ও ইংরাজরা কেউই বাংলা বাণিজ্যে জার্মান অনুপ্রবেশ পছন্দ করেননি। জার্মানদের পক্ষে সে যুগে ইংরাজ বিরোধিতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশে ব্যবসা চালানো সম্ভব ছিল না। সমুদ্র থেকে গঙ্গার প্রবেশমুখে ইংরাজদের সতর্ক প্রহরা। এ প্রহরা এড়িয়ে বাংলা দেশের সমুদ্রবাণিজ্যে তাঁদের অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুকাল বাংলাদেশে বাণিজ্য চালানোর পর জার্মানদের এ প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১৭৫৯ খৃীষ্টাব্দের পর বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক কাজকর্মের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।[৪১]

শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলার সঙ্গে আমেরিকা ও পর্তুগালের বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে যায়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে সম্পাদিত জয় চুক্তির (Joy Treaty; ১৯শে নভেম্বর, ১৭৯৪) অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা ও ত্রুটির সুযোগ নিয়ে আমেরিকার বণিকরা এদেশের আন্তঃপ্রাদেশিক, এশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিতে শুরু করে। এরা হ্যামবুর্গ, ম্যানিলা, বাটাভিয়া ও দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুর ও ট্রাঙ্কুবারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৭৯৯ সনে বাংলার সঙ্গে আমেরিকার মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৩৭,৮৭,৯৩৭ সিক্কা টাকা।[৪২] শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে পর্তুগালের সঙ্গে বাংলা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। শতাব্দীর শেষ বছরে ওয়েলেস্‌লি ডিরেক্টর সভার চেয়ারম্যানকে লিখেছেন ঃ 'এ বছর বাংলা থেকে পর্তুগালের রপ্তানি বাণিজ্য কোম্পানির বাণিজ্যের প্রায় সমান হবে।'[৪৩] শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিদেশী আধিপত্য (আমেরিকা, পর্তুগাল, ডেনমার্ক) কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে বেশ আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বিদেশী আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে এ বাণিজ্য পুনরায় হস্তগত করার জন্য কোম্পানি ও ইংরাজ বণিকরা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। ১৭৯৯-১৮০০ সনে বাংলার মোট বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ২,৫৯,৬৮,০০০ সিক্কা টাকা। এর মধ্যে ইংরাজ কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা—অর্থাৎ মোট রপ্তানি বাণিজ্যের ৬০ শতাংশেরও কম।

৩৯। এস. ভট্টাচার্য ঐ, পৃঃ ৯২।
৪০। লুক বোরেভা, ঐ. পৃঃ ৬২ এবং ভট্টাচার্য, ঐ পৃঃ ৬৫।
৪১। প্রসিডিংস, আগস্ট ২১, ১৭৬০। জে, লণ্ড, ঐ পৃঃ ৩৩২।
৪২। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৪৪, ৬৩, ৬৯।
৪৩। ঐ, ঐ, পৃঃ ৬০। ওয়েলেসলি টু চেয়ারম্যান, ২৯ নভেম্বর ১৭৯৯।

# ৮

# ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যক্রয় নীতি

## (Investment Policy)

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে পণ্য ক্রয় 'ইনভেস্টমেন্ট' নামে অভিহিত। ইংরাজী 'ইনভেস্টমেন্ট' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বিনিয়োগ। কোনো শিল্প, ব্যবসা বা আর্থিক লেনদেনে লাভের আশায় টাকা খাটানোকে বিনিয়োগ বলে। এই অর্থে কোম্পানির সরকারি ব্যবসা বিনিয়োগ নয়; এর আসল অর্থ হল রপ্তানি পণ্যক্রয়। কাপ্টেন গ্রান্ট কোম্পানির পণ্যক্রয়ের এমন নামকরণের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কোম্পানি রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের আগেই চুক্তির মাধ্যমে তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করত। এজন্য ভারতবর্ষে তাদের পণ্যক্রয় 'ইনভেস্টমেন্ট' নামে পরিচিত। ('the company were invested with a prior right to the goods for which they contracted, and hence their purchase in India acquired the name of investment.')[১] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে পণ্য ক্রয়ের জন্য, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্যাক্টরি বা কুঠি স্থাপন করেছিল। কোম্পানির প্রধান প্রধান ফ্যাক্টরিগুলি হল পাটনা, কাশিমবাজার, রংপুর, রামপুর-বোয়ালিয়া (রাজসাহী), লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালি), কুমারখালি (নদীয়া), শান্তিপুর, বুরন (নদীয়া), সোনামুখী (বাঁকুড়া), রাধানগর, খিরপাই, হরিপাল, গোলাগর, জঙ্গীপুর, সুরদা (রাজশাহী), জগদিয়া, ঢাকা, কলিন্দা, বালেশ্বর, বলরামগাড়ি, মালদা, বরানগর, ধনিয়াখালি, বুদাল (ময়মনসিংহ) ও হরিয়াল (রাজশাহী)। এছাড়া দেশের বহুস্থানে অধীনস্থ ফ্যাক্টরি (subordinate factories) এবং আড়ঙ্ (aurungs) ছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বোলপুরের কাছে সুরুল, সিউড়ীর কাছে ইলামবাজার ও মুর্শিদাবাদে গানুটিয়া আড়ঙ্।

ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা ও গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করত। শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা থেকে তাদের সংগৃহীত প্রধান পণ্যগুলি হল বিভিন্ন প্রকারের সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে রেশমবস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে কোম্পানি রেশমবস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করে বেশি করে কাঁচা রেশম রপ্তানি করতে থাকে। কোম্পানির সংগৃহীত বিহারের সোরা ও আফিম বাংলার

১। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট, হিস্ট্রি অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, পৃঃ ৬৭; কে. কে. দত্ত, স্টাডিজ, পৃঃ ১১৪-১১৫।

মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। ইংল্যাণ্ডের বাজারে এসব পণ্যের চাহিদা ও দাম অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের দাম ও পরিমাণ ঠিক করা হত।[২] কোম্পানির ডিরেক্টর সভা চাইতেন লণ্ডন বাজারে বাংলা পণ্যের দাম অনুযায়ী বাংলাদেশে কোম্পানির পণ্য ক্রয়মূল্য নির্ধারিত হোক। ডিরেক্টর সভা ভারতবর্ষে কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনায় সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ ও পরামর্শ পাঠাতেন। শুধু তাই নয় পণ্য কেনাবেচার ছোটখাট ব্যাপারেও ডিরেক্টর সভার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আসত। তাদের পরামর্শ ও নির্দেশমত কাজ না করলে অনেক সময় গভর্ণরসহ গোটা কাউন্সিলকে বরখাস্ত করতেও তারা দ্বিধা করতেন না।[৩] প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে ডিরেক্টর সভা ভারতবর্ষে ক্রয়যোগ্য পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করতেন। এই তালিকায় বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের নাম, পরিমাণ ও গুণগতমান উল্লেখ করা থাকত। তবে লণ্ডনের বাজারে মাঝে মাঝে রপ্তানি পণ্যের দামে উঠানামার জন্যে সংশোধিত তালিকাও পাঠানো হত। ফলে এদেশে কোম্পানির কর্মচারীদের পণ্যক্রয়ে অসুবিধা দেখা দিত। পণ্যক্রয়ের নির্দেশমূলক তালিকার সঙ্গে বিভিন্ন ক্রয়যোগ্য পণ্যের লণ্ডনের বাজার দামের তালিকাও থাকত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিরেক্টর সভা সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে কোম্পানির পণ্য ক্রয় ব্যবস্থার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করত। নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে পণ্য ক্রয়ের খুঁটিনাটি দিকগুলিতেও তাদের দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ( remote control system) কার্যকরী করার চেষ্টা হত। তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ (ক) ডিরেক্টর সভায় পাঠানো পণ্য-তালিকা অনুযায়ী ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্মচারীদের পণ্য কিনতে হত। (খ) লণ্ডন বাজারের উঠানামা অনুযায়ী ডিরেক্টর সভার শেষ নির্দেশের জন্য এদের অপেক্ষা করতে হত এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হত। (গ) লন্ডন বাজারের দাম অনুযায়ী এদেশের পণ্যদাম নির্ধারণ করার নির্দেশ থাকত। (ঘ) এদেশে কোনো পণ্যসরবরাহ চুক্তি করার পরেও কোম্পানির ডিরেক্টর সভার নির্দেশে অনেক সময় চুক্তি বাতিল করতে হত।

**পণ্য ক্রয় ব্যবস্থা ঃ**

**চুক্তি ব্যবস্থা ঃ** শতাব্দীর প্রথমভাগে কোম্পানি বাংলাদেশে চুক্তি ব্যবস্থার (contract system) মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত। এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হত। চুক্তিবদ্ধ বণিকরা নির্দিষ্ট দামে ও গুণমতমানে নির্দিষ্ট পণ্য সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ঐ পণ্য সংগ্রহ করে বণিকরা কলকাতা বা কোম্পানির মফঃস্বল ফ্যাক্টরিতে চুক্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগান দিত। চুক্তির সময় কোম্পানি বণিকদের পণ্যমূল্যের পঞ্চাশ থেকে পচাত্তর শতাংশ অগ্রিম দিত। এই অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা থেকে

২। কে এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ৩০১।
৩। ঐ, পৃঃ ৩০২।

চুক্তিবদ্ধ বণিকরা দাদ্‌নি বণিক নামে পরিচিত হয়। দাদ্‌নি বণিকরা দালালদের সঙ্গে এবং দালালরা আবার পাইকারদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করত। এভাবে পণ্য সংগ্রহে কোম্পানির কতকগুলি সুবিধা হত।

প্রথমত, এদেশের বণিকদের অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায়ী সংগঠন কোম্পানির পণ্য সংগ্রহে ব্যাবহার করা যেত। এভাবে কোম্পানি প্রায় বিনা আয়াসে তার রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করতে পারত।

দ্বিতীয়ত, এদেশীয় বণিকরা কোম্পানি ও এদেশীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করত। তার ফলে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে বিরোধ বা এদেশীয় বণিকদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে কোম্পানি রেহাই পেত।

তৃতীয়ত, অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান আলেকজান্ডার হিউমের মতে দাদ্‌নি ব্যবসায়ীদের বেশি পরিমাণে দাদন দিয়ে চুক্তি করলে সময়মত রপ্তানি পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা থাকত। দাদন না দিলে বিশাল পরিমাণ পণ্যের যথাসময়ে সরবরাহে অনিশ্চয়তা দেখা দিত।

কলকাতা ছাড়াও কোম্পানির প্রধান প্রধান ফ্যাক্টরিতে এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হত। বাজারে প্রচলিত দামের উপর ভিত্তি করে দরদামের মাধ্যমে অর্থাৎ দরকষাকষি করে (bargaining) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের নিয়ম ছিল। এরকম পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পণ্য সরবরাহ করার পর এদেশীয় বণিকরা চুক্তিমত দামের সবটাই পেত না। কোনো না কোনো কারণে তাদের প্রাপ্য দামের একাংশ বাদ যেত। সাধারণত যে কারণটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেত সেটি হল সরবরাহ করা পণ্য চুক্তির সময়ের নমুনা (sample) মানের অনুরূপ নয়। কোম্পানির রপ্তানি পণ্যের গুদামবাবু ও তার দাম নির্ধারক সহকারীদের এ ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পণ্যমূল্য নির্ধারণের সময় এরা একদিকে যেমন কোম্পানিকে ঠকাত তেমনি এদেশীয় বণিকদের ঠকিয়েও দুপয়সা রোজগার করত। এদেশীয় বণিকরা কোম্পানির কাছে অবৈধ, অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে তাদের সরবরাহ করা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে বলে প্রায়শ অভিযোগ করত।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একজন দালালের (broker) মাধ্যমে কোম্পানির দাদ্‌নি বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি করত। ঐ বছর দালালের পদটি তুলে দেওয়া হয়। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি চুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের পণ্য সংগ্রহ করেছিল। বাংলাদেশে অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান আলেকজান্ডার হিউম তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন বণিকদের অগ্রিম দেওয়ার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে বাণিজ্যপণ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা অনেকদিন ধরে চলে আসছিল। বিদেশীরা বাংলা বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণের পর থেকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্যে এ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়। চল্লিশের

দশকে কলকাতায় কোম্পানির প্রধান প্রধান দাদ্‌নি ব্যবসায়ী হলেন গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, অক্রুর দত্ত, উমিচাঁদ, হুজুরি মল, এবং কোত্‌মা সম্প্রদায়ের বণিকরা।[৪] দাদ্‌নি বণিকদের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ ছাড়াও রপ্তানি পণ্যের একাংশ কোম্পানি নগদ টাকায় কিনত। সাধারণত নগদ টাকায় কেনা পণ্যের পরিমাণ মোট রপ্তানি পণ্যের এক তৃতীয়াংশ।

শতাব্দীর প্রথম বছরে কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ১৮,৯৬,৯৬৮ টাকা।[৫] ১৭০৩ থেকে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক গোলযোগের জন্যে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ খুব কমে গিয়েছিল।[৬] এ সময়ে বার্ষিক রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হল পাঁচ থেকে আট লক্ষ টাকা। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৭২০তে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৬২,৩৩৬ টাকা। ১৭২০ থেকে ১৭৩০-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয়েছিল ১৭২৭-এ। ঐ বছর কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৪১,০৫,৯৯২ টাকা। ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ চব্বিশ থেকে আটত্রিশ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণকালে ( ১৭৪২-১৭৫১ ) কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছিল—কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যান থেকে কিন্তু এই প্রচলিত ধারণার সমর্থন মেলে না। বরং ঐ সময়ে কোম্পানি বাংলা থেকে প্রতিবছর গড়ে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য করেছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। ঐ বছর কোম্পানির মোট বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৩০,০৩,৫৯২ টাকা।[৭]

কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতির উপর অবশ্য মারাঠা আক্রমণের অন্যরকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে ডিরেক্টর সভা কলকাতা কাউন্সিলের কাছে অগ্রিম বা দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যসংগ্রহ নীতির পরিবর্তন ঘটানোর সুপারিশ করেছিলেন। অগ্রিম দাদন ব্যবস্থা একেবারে তুলে দিয়ে অথবা দাদনের পরিমাণ কমিয়ে নগদ টাকায় পণ্য কেনার ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল। এ প্রস্তাব যখন দাদ্‌নি বণিকদের নিকট রাখা হল তারা একযোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। তারা দাদ্‌নি ব্যবস্থা রাখার সপক্ষে দুটি জোরালো যুক্তি রাখে: (১) দাদনি ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলে বণিকদের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চড়া দামে পণ্য কিনতে হবে; (২) আর নবাব সরকার যদি জানতে পারেন বণিকরা

৪। এন. কে সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬।

৫। এক পাউণ্ড সমান আট টাকা ধরে এ হিসাব।

৬। ১৭০৪ থেকে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থায় রোটেশন গভর্ণমেন্ট ( Rotation Government ) চালু ছিল। দুই প্রেসিডেন্ট এবং দুই কোম্পানির ( পুরাতন ও নতুন কোম্পানি ) চার জন করে সদস্য নিয়ে আট জনের কাউন্সিল। প্রতি সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বদল হত।

৭। সারণী দেখুন।

নিজেদের মূলধনে পণ্য কিনছে তাহলে তাদের কাছ থেকে জবরদস্তিভাবে বেশি টাকা আদায় করবেন। কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল তাদের যুক্তি গ্রাহ্য করলেন না কারণ এদেশী দাদ্‌নি বণিকরা সময়মত তাদের চুক্তিমত পণ্যসরবরাহে ক্রমশঃ ব্যর্থ হচ্ছিল। ১৭৫২ সনে কোম্পানি বাংলাদেশের বণিকদের সঙ্গে পনেরো লক্ষ টাকার পণ্য সরবরাহের চুক্তি করেছিল। এজন্য তাদের মোট পণ্যমূল্যের ৮৫ শতাংশ অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। অথচ যখন ইউরোপে জাহাজ পাঠানোর সময় এল দেখা গেল দাদ্‌নি বণিকরা মাত্র আট লক্ষ টাকার পণ্যসরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। এ হিসেব কোম্পানির রপ্তানি পণ্যের গুদামবাবু চার্লস ম্যানিংহ্যাম এবং উইলিয়ম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের।[৮] অথচ আগের দিনে কোম্পানির দাদ্‌নি বণিকরা পঁচিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি পণ্য স্বচ্ছন্দে যথাসময়ে সংগ্রহ করে দিত। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানি নিজেদের কর্মচারী ও গোমস্তাদের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইংরাজদের আগেই ওলন্দাজরা অবশ্য এ ব্যবস্থা চালু করেছিল। নতুন পণ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা এজেন্সি সিস্টেম নামে পরিচিত। কন্ট্রাক্ট সিস্টেম বা চুক্তি ব্যবস্থা ত্যাগ করার কারণগুলি হলঃ (১) সাধারণভাবে কোম্পানির দাদ্‌নি বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি, (২) সময়মত পণ্যসরবরাহে ব্যর্থতা, গাফিলতি ও অক্ষমতা; (৩) দাদ্‌নি বণিকদের অনড় মনোভাব, ঔদ্ধত্য এবং ১৭৫৩ সনে কোম্পানির পছন্দমত শর্তে চুক্তি করতে রাজী না হওয়া; (৪) বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি—কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা; (৫) সম্ভবত দাদ্‌নি বণিকদের সরিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা নিজেদের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ পূরণ করার কথা ভেবেছিলেন।[৯]

**এজেন্সি ব্যবস্থাঃ** ১৭৫৩-১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতির দ্বিতীয় পর্ব।[১০] ডিরেক্টর সভা এজেন্সি ব্যবস্থায় সরাসরি পণ্য ক্রয়-পদ্ধতি সমর্থন করলেন।[১১] তবে কর্মচারীদের কাজকর্মের উপর লক্ষ্য রাখার জন্যে কলকাতা কাউন্সিলকে নির্দেশ পাঠানো হল। এই পর্ব কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ও বৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসার সুবর্ণযুগ। তারা শুধু বিনাশুল্কে নিজেদের ব্যবসা করেনি, 'দস্তকের' অপব্যবহার এযুগে সবচেয়ে বেশি হয়। পণ্যসংগ্রহের সমস্ত দায়দায়িত্ব এসময় কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল বলে তারা নানাভাবে ধনসঞ্চয়ে উদ্যোগী হয়। তারা কোম্পানিকে যেমন ঠকাত তেমনি এদেশীয় উৎপাদকদের ঠকিয়ে অর্থোপার্জন করত। এদেশীয় উৎপাদকরা কোম্পানির আড়ঙে রপ্তানি পণ্য সূতীবস্ত্র,

৮। কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ৩১১।

৯। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭।

১০। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানি যে রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ নীতি অনুসরণ করেছিল তাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) ১৭০০-১৭৫৩ পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট সিস্টেম; (২) ১৭৫৩-১৭৭৫ পর্যন্ত এজেন্সি সিস্টেম; (৩) ১৭৭৫-১৭৮৮ পর্যন্ত আবার কন্ট্রাক্ট সিস্টেম; (৪) ১৭৮৮-১৭৯৯ পর্যন্ত এজেন্সি সিস্টেম।

১১। লেটার ফ্রম কোর্ট, ৩১ জানুয়ারী ১৭৫৫।

রেশম, রেশমবস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে এলে ঐ পণ্যগুলি কোম্পানির নির্দিষ্ট মানের নয় বলে কর্মচারীরা বাতিল করত। পরক্ষণে ঐ পণ্যগুলি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে কিনে নিত। উৎপাদকরা আড়ঙে নানাধরনের বস্ত্র নিয়ে এলে এজেন্টদের গোমস্তারা এগুলিকে এ, বি, সি, ডি, ই—এই পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি শ্রেণীর বস্ত্র এক অক্ষর নামিয়ে কিনত আবার এক অক্ষর উপরে উঠিয়ে কোম্পানির কাছে বিক্রি করত। এছাড়া উৎপাদকদের কাছ থেকে দালালি ও দস্তুরি নেওয়ার প্রথা ছিল। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এদেশীয় গোমস্তাদের মত নিজস্ব প্রাপ্য দস্তুরি নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

১৭৫৭ মার্চ মাসে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা বাংলা বাণিজ্যে অবনতির কারণ জানতে চান। কলকাতা কাউন্সিল যে কারণগুলি জানিয়েছিল সেগুলি হল ঃ (ক) বিদেশে (সম্ভবত পশ্চিম এশিয়াতে) কতকগুলি ভাল ভাল বাজারের অবক্ষয়; (খ) বাংলার নবাবদের জবরদস্তিভাবে টাকা আদায়; (গ) ভারতের বিভিন্ন বন্দরে উচ্চ শুল্ক হার, (ঘ) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বাজারে নতুন নতুন ক্রেতার আবির্ভাব এবং (ঙ) ওলন্দাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির বাংলা বাণিজ্যে কোনো বড় রকমের ঘাটতি দেখা যায় না। ঐ চার বছর গড়ে পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ টাকার রপ্তানি পণ্য এজেন্সি ব্যবস্থায় কেনা হয়েছিল। শুধু পলাশী যুদ্ধের বছরে কোম্পানির সামান্য ব্যবসা হয়েছিল—রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র ৫,৫৩,৭৫২ টাকা। পলাশীর পর থেকে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন আসে। পলাশী পর্যন্ত বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্য কেনার জন্য কোম্পানিকে দেশ থেকে সোনা রূপো আনতে হত। পলাশীর পর থেকে কোম্পানির হাতে এত টাকা আসতে থাকে যে পণ্য কেনার জন্যে দেশ থেকে আর সোনা রূপো মূলধন হিসেবে আনার প্রয়োজন হল না। ১৭৫৭র জুন মাসের চুক্তি অনুযায়ী মীরজাফর কোম্পানিকে প্রায় এক কোটি টাকা দিয়েছিলেন। ১৭৬৩র জুলাই মাসের চুক্তিতে তিনি কোম্পানিকে আরো তিরিশ লক্ষ টাকা দিলেন। ১৭৬০এ মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন। এ তিনটি জেলার বার্ষিক আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। মীরজাফর আগেই চব্বিশ পরগনা কোম্পানিকে দিয়েছিলেন। ১৭৬৫তে দেওয়ানি লাভের পর থেকে কোম্পানির হাতে আরো রাজস্ব এল। শুধু যুদ্ধের বছরগুলি ছাড়া কোম্পানিকে রপ্তানি পণ্য কেনার জন্যে ধার করতে হত না বা দেশ থেকে মূলধন আনার প্রয়োজন দেখা দিত না।

এ পর্বে নিজের পণ্য কেনা ছাড়াও কলকাতা কাউন্সিল উদ্বৃত্ত রাজস্বের একাংশ (বছরে গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও কোম্পানির চীনদেশের বাণিজ্যের জন্যে পাঠাত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এ টাকার একাংশ রপ্তানি পণ্য ক্রয়ে কাজে লাগাত। তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলাদেশে উপার্জিত টাকা কোম্পানির উপরে 'বিল অব এক্সচেঞ্জের' মাধ্যমে দেশে পাঠানোর

ব্যবস্থা হয়। ফলে এ পর্বে নানা কারণে বাংলাদেশে রূপোর অভাব ও মুদ্রাসংকট দেখা দেয়। এ সংকট থেকে বাঁচার জন্যে সোনার মোহর বৈধ মুদ্রা হিসেবে বাজারে ছাড়া হয়। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহেও (হায়দার আলি, মীরকাশিম, ফরাসী ও ওলন্দাজদের সঙ্গে) কোম্পানির বেশ কিছু টাকা খরচ হয়; সেজন্যে এ পর্বের শেষদিকে কোম্পানিকে ঋণপত্র বিক্রি করে রপ্তানি পণ্যের একাংশ কিনতে হয়। ১৭৭৩এ কোম্পানির ঋণের পরিমাণ হল ১,৩৯,২৭,০৩২ টাকা।[১২] পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে অবশ্য এদেশীয় উৎপাদকরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়নি। তারা বেশি দাম পায়নি। সুতো ও খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছিল অনেকখানি অথচ কোম্পানির ক্রয়যোগ্য রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়লো না। সত্তরের দশকে সুতোর দাম বাড়লো ২৫ শতাংশ অথচ সেই হারে কোম্পানির ক্রয়যোগ্য কাপড়ের দাম বাড়েনি। শান্তিপুরের তাঁতিদের অভিযোগ কোম্পানির গোমস্তারা তাদের কাপড়ের বাজার দাম অপেক্ষা কম দাম দেয়। এ দামে অনেক সময় তাদের কাপড়ের সুতোর দামটুকু উঠত মাত্র। আবার অনেক সময় সতোর দামও উঠত না। দ্বিতীয় পর্বে কোম্পানির বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে যায়। ১৭৫৩ সনে মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০,০৩,৫৯২ টাকা; ১৭৭৫ সনে এর পরিমাণ বেড়ে হল ৮৩,৯৫,৫৩৩ টাকা। অঢেল টাকার যোগান এবং কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ বলে ধরা যেতে পারে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির 'আড়ঙ্‌ কমিটি' কোম্পানির পণ্যক্রয় ব্যবস্থা তদারকি করত। কিছুকাল পরে কোম্পানির রপ্তানি পণ্যক্রয় তদারকির জন্য কন্ট্রোলার অব দি ইনভেস্টমেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উইলিয়ম বোল্টস তাঁর সুপরিচিত 'কনসিডারেশনস অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স' গ্রন্থে পলাশী পরবর্তীকালে কোম্পানির এজেন্ট ও গোমস্তাদের পণ্যক্রয় পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয় কোম্পানির ইউরোপীয় রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতি মূলত অত্যাচারের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এর কুফল এদেশের প্রতিটি তাঁতি উৎপাদক ভোগ করত। এদেশের উৎপন্ন প্রতিটি পণ্যে একচেটিয়া অধিকার। ইংরাজরা এদেশীয় বেনিয়ান ও কালা গোমস্তাদের সহায়তায় প্রতিটি উৎপাদক কত পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করবে এবং কত মূল্য পাবে তা ঠিক করত। গোমস্তা কাছারিতে এসে দালাল, পাইকার ও তাঁতিদের ডেকে পাঠিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম দেয়; তারপর নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট দামে বিশেষ পরিমাণ পণ্য সরবরাহের জন্যে তাঁতিকে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করে। তার মতামতের কোনো প্রয়োজন হয় না। গোমস্তা কোম্পানির পক্ষে যা খুশী সই করিয়ে নিতে পারে। যদি কোনো কারণে তাঁতি অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তার বস্ত্রাঞ্চলে টাকা গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাতে তাড়ানো হয়। গোমস্তাদের খাতায় তাঁতিদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে। তারা ইচ্ছামত অন্যদের জন্যে কাজ করতে পারে না। ক্রীতদাসের

১২। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫।

মত তাদের এক গোমস্তা থেকে অন্য গোমস্তার অধীনে চালান করা হয়। এই বিভাগের দুর্নীতি ও অপশাসন কল্পনার অতীত। তবে সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হল গরীব তাঁতিকে ফাঁকি দেওয়া। কোম্পানির গোমস্তা ও জাচনদাররা (পণ্যের গুণ ও মূল্য নির্ধারক) পণ্যের যে দাম ধার্য করে তা খোলাবাজারে দামের চেয়ে অন্ততঃ ১৫ শতাংশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কম। তাঁতিরা যদি তাদের মুচলেকা অনুযায়ী কোম্পানির পণ্য সরবরাহ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের পণ্য আটক ও বিক্রী করে কোম্পানির পাওনা শোধ করা হয়। কাঁচা রেশম সুতো প্রস্তুতকারক নাকদদের সঙ্গেও অনুরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে।[১৩]

**চুক্তি ব্যবস্থা (২য়)ঃ** ডিরেক্টর সভার ১৭৭৪ সনের ২৯শে মার্চের নির্দেশে কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনার জন্য 'বোর্ড অব ট্রেড' গঠিত হয়। এই বোর্ডের হাতে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কেনা ও আমদানি পণ্য বিক্রির সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। কোম্পানির এগারোজন সিনিয়র কর্মচারী নিয়ে গঠিত এই বোর্ডের হাতে বাণিজ্যিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। শুধু রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সুপ্রিম কাউন্সিলের হাতে। বোর্ড অব ট্রেড বাংলাদেশে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য সংগ্রহের জন্যে আবার 'কন্ট্রাক্ট সিস্টেম' চালু করে। অর্থাৎ কোম্পানির এজেন্ট ও এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহের নীতি গ্রহণ করা হয়। তবে প্রথম পর্বের চুক্তি ব্যবস্থার সঙ্গে তৃতীয় পর্বের (১৭৭৫-১৭৮৮) চুক্তি ব্যবস্থার একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে প্রধানত এদেশীয় দাদনি বণিকরা কোম্পানির রপ্তানি পণ্য সরবরাহ করত। তৃতীয় পর্বের চুক্তি ব্যবস্থায় কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির পণ্যসরবরাহে অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

এজেন্সি ব্যবস্থার শেষদিকে কোম্পানির সংগৃহীত পণ্যের গুণগত মানের অবনতি এবং অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ডিরেক্টর সভাকে পণ্যক্রয় নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করার জন্যে তাঁরা সচেষ্ট হন। তাঁদের ধারণা কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিযুক্ত থাকার জন্যে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করেছিল। ১৭৭৫-এ কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৮৩,৯৫,৫৩৩ টাকা আর ১৭৮৮ এর পরিমাণ দাঁড়ালো ৮২,৮০,৭১৭ টাকা।

পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হল বাংলাদেশের পণ্যের মাধ্যমে বিলাতের কর্তৃপক্ষ বাংলার রাজস্ব ভোগ করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ ডিরেক্টর সভা মুঘল সম্রাটদের উত্তরাধিকারী হলেন।

১৩। উইলিয়ম বোল্টস, কনসিডারেশনস, পৃঃ ১৯১-১৯৪।

সত্তরের দশক থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলাদেশের পণ্যসংগ্রহ নীতিতে আর একটি বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানি এতকাল বাংলা থেকে সুতীবস্ত্র, রেশম, রেশমবস্ত্র রপ্তানি করত। এসময় থেকে কোম্পানি মোটা সুতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি কমিয়ে দিতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডের অর্থনীতির সঙ্গে রেশমবস্ত্র ও মোটা সুতীবস্ত্র রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কোম্পানি ইংল্যাণ্ডের রেশম শিল্পের উপযোগী উন্নত পদ্ধতিতে কাটা সুতো ও জড়ানো রেশম দেশে পাঠাতে থাকে। গুণের উন্নতি ঘটিয়ে এগুলি ইতালী ও চীনদেশের সিল্কের সমমানের করা হয়।

এযুগের পণ্যসংগ্রহে (investment) অপর বৈশিষ্ট্য হল ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবিসম্বাদী আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বাংলার ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফরাসি ও ওলন্দাজদের পক্ষ থেকে তাঁতিদের ভাগ করার প্রস্তাব কলকাতা কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করেছিল। অপরদিকে একই বণিকগোষ্ঠীর মাধ্যমে যৌথভাবে পণ্য কেনার ফরাসি প্রস্তাবেও তারা সাড়া দেয়নি।

ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময় বোর্ড অব ট্রেডের অধীনে কোম্পানির বাংলা থেকে পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তবে এ পর্বে কন্ট্রাক্ট সিস্টেম চালু থাকায় দুর্নীতি খুব বেড়েছিল। কোম্পানি কর্মচারীদের সঙ্গে বা তাদের অধীনস্থ গোমস্তাদের সঙ্গে বোর্ড পণ্যসরবরাহের চুক্তি করত। এতে কোম্পানির কর্মচারীরা আগের মত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। এ পর্বেও কোম্পানির কেনা পণ্যের দাম বেশি পড়ত এবং পণ্য নীচু মানের হত। অথচ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত লাভ হত।

**এজেন্সি ব্যবস্থা (২য়):** কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কন্ট্রাক্ট সিস্টেমের অবসান ঘটিয়ে আবার এজেন্সি ব্যবস্থা চালু করলেন। কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এর সঙ্গে তিনি আরো কতকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন: (ক) বোর্ড অব ট্রেডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে পাঁচ করা হল, (খ) বোর্ডের কার্যাবলীর উপর সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের তদারকির ব্যবস্থা করা হল, (গ) সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও কমিশন বাড়িয়ে তিনি রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার রহিত করলেন, (ঘ) শুধু কমার্শিয়াল রেসিডেন্টদের (Commercial Resident) ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার রাখা হল ঠিকই তবে তাদের ক্ষেত্রেও কঠোর বিধিনিষেধ এমনভাবে আরোপ করা হল যাতে কোম্পানির বাণিজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়।[১৪]

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এজেন্সি ব্যবস্থায় কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কেনা পুরোপুরি চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় পণ্য সংগ্রহের ফলে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা হল। উৎপাদকরা আগের চেয়ে ভালো পারিশ্রমিক বা মূল্য পেল। কোম্পানির সংগৃহীত

১৪। পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

পণ্যের গুণগতমানে উন্নতি লক্ষ্য করা গেল আর পূর্ববর্তী কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় এ ব্যবস্থায় কমিশন দিয়েও কোম্পানি অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য কিনতে পারলো। ১৭৯০ সনের অক্টোবর মাসে বোর্ডের মন্তব্য ঃ 'বর্তমান ব্যবস্থায় সুবিধা সকলেই স্বীকার করছেন। কোম্পানির এদেশীয় কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে; ন্যায্য লেনদেন, শৃঙ্খলা ও নিয়মরীতি স্বীকৃতি পাওয়ায় দেশের সুখ ও কোম্পানির সুবিধা বাড়ছে।'[১৫]

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হল ৮২,৮০,৭১৭ টাকা। ১৭৯৩ সনে বাণিজ্য ক্রমশ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১,০৯,৫৯,১৩০ টাকায়। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত কোম্পানির গড়ে প্রতি বছর এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি বাণিজ্য করেছিল। ১৭৯৭-৯৮ সনে কোম্পানির ঋণের পরিমাণ হল ৭,৬৭,৩০,১৭৮ টাকা। এ ঋণের একাংশ কোম্পানির এযুগের রপ্তানি পণ্যের জন্যে ব্যয় হয়েছিল।

কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতির শেষ পর্বের (১৭৮৮-১৭৯৯) উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-গুলি হল ঃ (১) এদেশীয় মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ও পাইকারদের ক্রমশ অবলুপ্তি; শেষ পর্যায়ে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহে এদের আর বিশেষ কোনো ভূমিকা রইল না। (২) এদেশীয় বণিকরা কোম্পানির দাদ্‌নি ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করার জন্যে আগের মত আর আগ্রহ দেখায়নি। কলকাতার দাদ্‌নি ব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকরা কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা থেকে আস্তে আস্তে অপসৃত হল। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এদেশীয় দাদ্‌নি বণিকদের বা কোম্পানির পণ্যসরবরাহে যুক্ত অন্যান্য বণিকদের অপছন্দ করেছিল। (৩) এই পর্বে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব কোম্পানির রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানচেষ্টারে যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত মসলিন তারা পরীক্ষামূলকভাবে এদেশের বাজারে পাঠিয়েছিলেন। এসময় থেকে মাঝারি ও মোটা কাপড় রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র উৎপাদক ও শিল্পপতিরা এগুলির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার জন ডিরেক্টর সভার উপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। ১৭৮৬ সনে তুলার সুতা রপ্তানি তালিকা থেকে বাদ গেল। আশির দশক থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মাঝারি ও মোটা কাপড়ের পরিবর্তে (substitute) তুলা, নীল, চিনি, তামাক, পাট, শণ প্রভৃতি রপ্তানি করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে তার নিজের তাঁতের প্রয়োজনীয় তুলা উৎপন্ন হত না। পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে তুলা আমদানি করে বাংলা তার নিজের ঘাটতি মেটাত। নীল ও চিনি কোম্পানির রপ্তানি তালিকায় স্থান পেল ঠিকই তবে চিনির রপ্তানি ব্যবসা ১৭৯৫তেও কোম্পানির পক্ষে তেমন লাভজনক হয়নি।[১৬] এসময়ে ইংল্যাণ্ডে সুতীবস্ত্রশিল্পে অসাধারণ উন্নতির জন্য কোম্পানির

১৫। প্রসিডিংস, বোর্ড অব ট্রেড, অক্টোবর, ১৭৯০।
১৬। লেটার ফ্রম কোর্ট, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৭৯৫।

কাঁচা রেশম রপ্তানি ব্যবসায় বিপদের সম্মুখীন হয়। ইংল্যাণ্ডের বাজারে কাঁচা রেশমের দাম অস্বাভাবিকভাবে নামতে থাকে—প্রতি পাউণ্ডের দাম ২১ শিলিং ৮ পেন্স থেকে ১৬ শিলিং ৪ পেন্সে নেমে আসে। এযুগে কোম্পানি চক্তির মাধ্যমে নীল সংগ্রহ করত। এ নীল ইংল্যাণ্ডের ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শণ বা পাট কোম্পানির রপ্তানি পণ্য তালিকায় পাকাপাকি স্থান পেল না কারণ এগুলির শিল্পে ব্যবহার সম্পর্কে তখনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি।

সম্পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি পণ্য সংগ্রহের জন্যে চার রকমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল—(১) দালাল ও পাইকারদের মাধ্যম, (২) দাদ্‌নি বণিকদের মাধ্যম—কন্ট্রাক্ট সিস্টেম, (৩) নিজেদের এজেন্ট ও গোমস্তাদের মাধ্যম—এজেন্সি সিস্টেম এবং (৪) নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যম (ready money purchase)। এক একটি পর্বে কমপক্ষে দুটি, পদ্ধতি চালু ছিল। যখন কোম্পানি দাদ্‌নি বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করে পণ্য সংগ্রহ করছিল তখন রপ্তানি পণ্যের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সরাসরি নগদ টাকায় কেনা হত। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোম্পানি তার পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতি ঠিক করত। বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ ও দাদ্‌নি বণিকদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি তাদের এজেন্সি ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় (১৭৫৩)। কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে হেংস্টিংস আবার কন্ট্রাক্ট সিস্টেম চালু করে দেন (১৭৭৫)। বোর্ড অব ট্রেডের দুর্নীতি কর্ণওয়ালিশকে পুনরায় এজেন্সি ব্যবস্থা চালু করতে প্ররোচিত করে (১৭৮৮)। কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে শতাব্দীব্যাপী এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হল ন্যায্য দামে ও যথাযথ গুণগতমানে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করা। অপর উদ্দেশ্য হল এদেশীয় উৎপাকদের উপর কোম্পানির এজেন্ট, গোমস্তা, বণিক, দালাল ও পাইকারদের জবরদস্তি ও অত্যাচার বন্ধ করা। প্রথম উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সাধিত হলেও দ্বিতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য শতাব্দীব্যাপী অনায়ত্ত থেকে যায়।

## সারণী

**অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ।**

| বৎসর | মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ( টাকায় ) |
|---|---|
| ১৭০০ | ১৮,৯৬,৯৬৮ |
| ১৭০৫ | ৫,২৭,১৪৪ |
| ১৭১০ | ১৩,৯০,৫৫২ |
| ১৭১৫ | ১২,৯০,৮৭২ |
| ১৭২০ | ২৬,৬২,৩৩৬ |
| ১৭২৫ | ১৫,২৮,৯৩৬ |
| ১৭৩০ | ৩৬,৫২,৬৪৮ |
| ১৭৩৫ | ৩২,০৭,৯০৪ |
| ১৭৪০ | ৩২,০৯,৩০৪ |
| ১৭৪৫ | ৩৫,৯৩,২১৬ |
| ১৭৫০ | ৪০,৮৯,৪১৬ |
| ১৭৫৩ | ৩০,০৩,৫৯২ |
| ১৭৫৫ | ৩২,৯২,০৪০ |
| ১৭৫৭ | ৫,৫৩,৭৫২ |
| ১৭৬০ | ২৯,৩৪,৯৭৬ |
| ১৭৬৭ | ৬০,০০,০০০ |
| ১৭৭২ | ৭৭ ৯২,৯০২ |
| ১৭৭৫ | ৮৩,৯৫,৫৩৩ |
| ১৭৭৭ | ৯৭,৪০,০৯৭ |
| ১৭৮০ | ১,১২ ৯৪,৬২২ |
| ১৭৮৬ | ৮১,৪৮,২০০ |
| ১৭৮৮ | ৮২,৮০,৭১৭ |
| ১৭৯০ | ৯৯,১১ ৫৯৮ |
| ১৭৯৩-৯৪ | ১,৪০,২০,৩৮২ |
| ১৭৯৪-৯৫ | ১,১০,৮৪ ৪৮৭ |
| ১৭৯৫ ৯৬ | ১,৪৫,৯৫,৪৭০ |
| ১৭৯৬ ৯৭ | ১,২০,২৩,৯৪৪ |
| ১৭৯৭ ৯৮ | ১,৫০,১৯,৬৮৫ |

দ্রঃ কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ৫০৯-১০। জে, সি. সিংহ, ইকনমিক এ্যানালস্ অব বেঙ্গল, পৃঃ ১৭১,২৪৩। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৪১।

১৭০০-১৭৬০ পর্যন্ত এক পাউণ্ড সমান আট টাকা হিঃ
১৭৬১-১৭৯৩ ,, ,, ,, ,, ,, নয় ,, ,,

# ৯

# বেসরকারি ব্যবসা

## (Private Trade)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইউরোপীয় কেম্পানিগুলির ব্যবসা সরকারি ব্যবসা (Public trade); আর কোম্পানিগুলির কর্মচারী, লাইসেন্সধারী স্বাধীন বণিক (free merchant) ও লাইসেন্সহীন বেআইনি বণিকদের (interloper) ব্যবসা একত্রে বেসকারি ব্যবসা (private trade) নামে অভিহিত। অর্থাৎ ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসাই বেসরকারি ব্যবসা নামে পরিচিত। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা নিয়োগপত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার লাভ করত।[১] তাদের সঙ্গে কোম্পানির চাকরি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে (covenant) পরিষ্কারভাবে জানানো হত যে বিনাবাধায় তারা কোম্পানির চাকরিতে থাকাকালীন ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে পারবে। শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের এ অধিকার বজায় ছিল। যদিও ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এর উপর নানারূপ বিধি নিষেধ আরোপ করা শুরু হয়। ফরাসি কোম্পানি শতাব্দীর তৃতীয়দশক থেকে তাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার দেয়। ওলন্দাজ কোম্পানির কর্মচারীরা শতাব্দীর পঞ্চমদশক থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করে দেয়। দিনেমার, অস্টেণ্ড ও প্রাশিয়ান কোম্পানির কর্মচারীরাও এ অধিকার ভোগ করত। শুধু কোম্পানির চাকরি নয় ব্যক্তিগত ব্যবসা করে ধনবান হওয়ার উদ্দেশ্যেও ইউরোপীয়রা ভারতে আসত। দেশে ফিরে স্বচ্ছল ভদ্রলোকের জীবন যাপনের আশাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা দুস্তর সাগর পেরিয়ে সুদূর ভারতবর্ষে আসার উৎসাহ পেত (incentive)। এ যুগে শুধু ইউরোপীয় কোম্পানির কর্মচারীরা নয় ধর্মযাজক, ডাক্তার ও সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা পর্যন্ত এ ব্যবসায়ে যোগ দিত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সর্বশ্রেণীর কর্মচারী—গভর্ণর থেকে রাইটার—ব্যক্তিগত ব্যবসা করার সুযোগ পেত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা কোম্পানির অনুমতি নিয়ে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য করত—এরা স্বাধীন বণিক নামে পরিচিত। আর কিছু বণিক কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অস্বীকার করে ভারতে ব্যবসা করতে আসত। এরা হল বেআইনি বণিক বা interloper। কোম্পানি এদের কাজ কর্মের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত এবং ধরা পড়লে এদের বন্দী করে দেশে ফেরত পাঠাত। তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কোম্পানির কর্মচারীরা স্বাধীন বা বেআইনি বণিক কাউকেই পছন্দ করত না।

১। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ১৮।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি তাদের কর্মচারীদের কম বেতন দিত বলে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার মেনে নিত। প্রাক্-পলাশী যুগে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন খুবই কম ছিল। এযুগে একজন গভর্ণর সব মিলিয়ে বার্ষিক বেতন পেতেন ২৪০ পাউণ্ড, একজন কাউন্সিলর ৪০ পাউণ্ড, একজন ফ্যাক্টর ১৬ পাউণ্ড ও একজন রাইটার পেত মাত্র ৫ পাউণ্ড।[২] শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কর্মচারীদের বেতন কিছুটা বেড়েছিল। এ সময় একজন কাউন্সিলরের বার্ষিক বেতন হল ২৫০ পাউণ্ড, একজন ফ্যাক্টর ১৪০ পাউণ্ড এবং একজন রাইটার পেত ১৩০ পাউণ্ড।[৩] অবশ্য এর সঙ্গে আহার, বাসস্থান, চাকর, জল প্রভৃতি খাতে নানারকম ভাতা পেত। কিন্তু বাংলাদেশে ইউরোপীয় কোম্পানির কর্মচারীরা এবং স্বাধীন বণিকরা বেশ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করত। কোম্পানির সামান্য বেতন তাদের এরূপ জীবন যাপনের জন্যে যথেষ্ট ছিল না।

চাকর, পরিচারক, দোভাষী, মালি, সহিস, রাঁধুনী প্রভৃতি নিয়ে তারা সংসার সাজাত এবং তার সঙ্গে থাকত পাল্কি, বেহারা, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি। ফলে অতিরিক্ত অর্থের যোগানের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রয়োজন হত। কোম্পানিগুলি তাদের কর্মচারীদের সৎভাবে ও ন্যায়সঙ্গত পথে ব্যবসা করার অধিকার দিত তবে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকাররূপে বিবেচিত ইউরোপ-এশীয় বাণিজ্য এদের নাগালের বাইরেই থাকত।

কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা এদেশীয় বেনিয়ান, গোমস্তা, মুন্সী ও সরকারদের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করত। এদেশীয়দের পুঁজি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতা ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভ বলা যেতে পারে। কোম্পানির নবাগত রাইটারদের কেন্দ্র করে এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। প্রাক্-পলাশী যুগে এরা বেশিরভাগ বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোক ; পলাশী-উত্তরকালে এদেশের অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দু একাজ করত। এরা একই সঙ্গে ইউরোপীয়দের দোভাষী, দালাল, হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারি, পুঁজির যোগানদার ও খাজাঞ্চী হিসাবে কাজ করত।[৪] বেনিয়ান ও গোমস্তারা এদেশের হালচাল, গোপন কাজকর্ম, ছোটখাট জালিয়াতিতে রপ্ত লোক। অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা শুধু তাদের নামটা ধার দিত এবং এর বিনিময়ে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ পেত। একজন বেনিয়ান একই সময়ে অনেকের হয়ে ব্যবসায়িক কাজকর্ম করত। ইউরোপীয় বণিক ও এদেশীয় বেনিয়ানদের মধ্যে প্রায়শ এক অবিশ্বাসের মনোভাব দেখা যেত। সুযোগ পেলে একে অন্যকে ফাঁকি দিতে দ্বিধা করত না। এ যুগে ইংরাজ বণিক ও এদেশীয় বেনিয়ানদের মধ্যে বিশ্বস্ততার একটি ব্যতিক্রম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল উইলিয়াম ল্যাম্বার্ট ও তাঁর

২। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক-পলাশী বাংলা, পৃঃ ১৫৮।
৩। জেমস্ মিল, হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২, পাদটীকাসহ।
৪। এন কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১।

বেনিয়ান বলরাম মজুমদাররের সম্পর্ক। রামকিশোর ঘোষ, লক্ষ্মণ, দুর্গাচরণ মিত্র, শেখ জাওদি, গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, জয়নারায়ণ ঘোষাল ও মনোহর মুখার্জি অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বেনিয়ান। পলাশী-উত্তর যুগে বাংলার ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকে—মহারাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী প্রভৃতি—ইউরোপীয়দের বেনিয়ানের কাজ করেছিলেন। বেনিয়ান ও গোমস্তা ছাড়াও ইউরোপীয় বণিকরা কোম্পানির সরকারি বাণিজ্যের মত দাদ্নি ব্যবসায়ী, দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনে ব্যবসা করত।

ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে কতকগুলি ঝুঁকি নিতে হত। প্রথমত, চড়াসুদে তাদের ব্যবসায়ী পুঁজি যোগাড় করতে হত। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা পরিচালনার জন্যে তাদের এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের উপর নির্ভর করতে হত। এরা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হত। তৃতীয়ত, এদেশে ও এশীয় দেশগুলিতে রাজনৈতিক অশান্তি ও জবরদস্তি শুল্ক আদায় অনেক সময় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ক্ষতির কারণ হত। এসব ঝুঁকি নিয়েও ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে ব্যক্তিগত ব্যবসায় আগ্রহী হত কারণ এদেশের ব্যবসায়ে লাভ হত অনেক বেশি। ১৭৭৬-এ এ্যাডাম স্মিথ বাণিজ্যে ৮ থেকে ১০ শতাংশ লাভকে যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন। ১৭৬৭-তে বাংলা দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সাধারণভাবে লাভের অংক ২০ থেকে ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল।[৫] এ সময়ে বাংলাদেশে চালের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ হল ২৫ শতাংশ। অন্য অনেক জিনিসে বিভিন্ন সময়ে লাভের পরিমাণ আরো বেশি হত। ১৭৬৪তে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ ১০০ শতাংশ হবে বলে আশা করা হয়েছিল, ষাটের দশকে তিনটি প্রধান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণ, সুপরি ও তামাকের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ দাঁড়াত ৭৫ শতাংশ। সমুদ্র বাণিজ্যেও অনুরূপ লাভের অংক দাঁড়াত। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা পারস্যের সঙ্গে যে ব্যবসা করত তাতে লাভ হত ৫০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ।[৬]

ষাটের দশকে দুজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লাভের অংক উল্লেখ করলে সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। মুর্শিদাবাদ দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইকস্ (Sykes) সোরা, সিল্ক ও কাঠের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুবছরে ব্যবসায় ও সালামি থেকে তিনি বারো থেকে তেরো লক্ষ টাকা আয় করেছিলেন। উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী কর্মচারীরা একালে বিনা পুঁজিতে ব্যবসা করতেন। হেস্টিংসের বন্ধু বারওয়েল ১৭৬৭-তে একখানি চিঠিতে স্বদেশে তাঁর পিতাকে লিখছেন: 'সোরার ব্যবসা থেকে তাঁর ৫০,০০০ টাকা আস্ছে অথচ এক টাকাও দাদন দিতে হচ্ছে না; কাঠের ব্যবসায়ে ঐ একই অবস্থা। শুধু সিল্কের ব্যবসায়ে তাঁকে অগ্রিম দিতে

৫। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ৪৯।
৬। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ৪৯।

হচ্ছে। এ তিনটি ব্যবসায়ে তিনি সরকারি প্রভাব খাটাচ্ছেন এবং অব্যর্থভাবে তাঁর বার্ষিক মোট আয় দাঁড়াচ্ছে ২,৫০,০০০ টাকা।'[৭]

আলোচনার সুবিধার্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর বেসরকারি বাণিজ্যকে চারভাগে ভাগ করা যায়—(১) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের অংশ গ্রহণ, (২) আন্তঃপ্রাদেশিক ও উপকূল-ভাগের সঙ্গে বাণিজ্য, (৩) এশিয়ার বিভিন্ন দেশের (পশ্চিম, পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের চীন) সঙ্গে বাণিজ্য ও (৪) ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য। প্রথম তিন শ্রেণীর বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা নির্ভয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারত। ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা চলত সাধারণত মূল্যবান পাথর, হীরা, জহরত, মণিমুক্তো ইত্যাদির মাধ্যমে। অন্য-দেশের জাহাজে কিছু কিছু পণ্য আমদানি রপ্তানিও চলত।

বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাক্-পলাশী যুগে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত এবং তাদের বেসরকারি বাণিজ্যের জন্যে কোম্পানির দস্তক ব্যবহার করে এদেশীয় সরকারকে বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিত। এতে এদেশীয় বণিকরা এদের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এযুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের অপর বৈশিষ্ট্য হল বাংলার নবাবরা কয়েকটি বিশেষ পণ্য যেমন লবণ, সুপারি, তামাক, চুন ইত্যাদি কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তিকে ইজারা দিয়ে রাজস্ব নিতেন। এ পণ্যগুলি এদেশের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সেজন্য এগুলিতে লাভও বেশি হত। পলাশীর আগেই এ পণ্যগুলির ব্যবসায়ের সঙ্গে ইংরাজরা যুক্ত হলে বাংলার রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ দেখা দেয়। ১৭২৭ থেকে ১৭৪৯-এর মধ্যে অন্ততঃ সাতবার বিরোধ দেখা দেয় (এর মধ্যে আবার প্রধান বিরোধীয় বিষয় হল লবণের ব্যবসা) এবং প্রতিবারই নবাবকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে ইংরাজদের বিরোধ মেটাতে হয়।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার এজেন্ট ও গোমস্তাদের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় শুরু করে। এর ফলে কোম্পানির সরকারি ব্যবসা ও কোম্পানির কর্মচারীদের বেসরকারি ব্যবসা একত্রিত হওয়ার ফলে বেসরকারি ব্যবসা আরো প্রসার লাভ করে। এ পর্বে কোম্পানির দস্তক এদেশীয় বণিক ও স্বাধীন ইউরোপীয় বণিকদের কাছে বিক্রি শুরু হয়। এদেশীয় বণিকদের কলকাতায় বিক্রির জন্যে নিয়ে আসা পণ্য কোম্পানির বলে ঘোষিত হত, ফলে বাংলা সরকার কোনো শুল্ক পেত না। আবার কলকাতা থেকে এদেশীয় ব্যবসায়ীদের জেলায় জেলায় কিনে আনা পণ্যও দস্তকের সুবিধা পেত। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও কর্মচারীরা কমদামে পণ্য কিনতে পারত এবং ইউরোপ থেকে আমদানি করা জিনিস বেশি দামে বিক্রি হত।[৮] অর্থাৎ ইংরাজদের কাছে পণ্য

৭। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৩।

৮। এস. সি. হিল, বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩৮৪। ক্যাপ্টেন ডেভিড রেণী (Rannie), রিফ্লেকশনস্ অন দি লজ অব ক্যালকাটা, জুন ১৭৫৬।

বিক্রি করলে বা তাদের পণ্য কিনলে সরকারি শুল্ক লাগত না বলে বণিকরা এ সুবিধা ভোগ করত। দস্তকের এরূপ অপব্যবহারে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা নিয়মিতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে এবং ১৭৫৮তে এর অপব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ পাঠায়।[৯] কলকাতার কাস্টমস্ মাস্টারকে দস্তক ব্যবহারকারীর হিসেব রাখতে বলা হয় এবং ইংরাজ স্বাধীন বণিক, এদেশীয় ব্যবসায়ী বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দস্তক দিতে নিষেধ করা হয়। কোম্পানির কর্মচারীরা শপথ নিয়ে শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে দস্তক ব্যবহার করার অনুমতি পায়। প্রকৃতপক্ষে ১৭০০ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি তার কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশীয় সরকারের কাছে কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য অনেকটা গোপন ব্যবসা। নবাব মীরকাশিমের সময় থেকে এ ব্যবসা প্রকাশ্যে ও ব্যাপকরূপে দেখা দেয়।

**প্রতিক্রিয়া ঃ** পলাশী-উত্তর কালে ইংরাজ বণিকরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—বিশেষ করে লাভজনক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি—নিজেদের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য গ্রাস করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বাংলার নবাবের অধিকার ও এক্তিয়ারের উপর আঘাতস্বরূপ দেখা দেয়। এ সম্পর্কে নবাব মীরকাশিম ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখছেন ঃ 'এই হল আপনার ভদ্রলোকদের ব্যবহার। আমার দেশের সর্বত্র তারা উপদ্রব করে, জনগণকে লুন্ঠন করে আর আমার কর্মচারীদের অপমান ও জখম করে...প্রত্যেক পরগনা, গ্রাম ও ফ্যাক্টরিতে তারা লবণ, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক; আফিম এবং অন্যান্য অনেক জিনিস বেচাকেনা করে। আমি আরো অনেক বস্তুর নাম করতে পারি, অপ্রয়োজনবোধে বিরত হলাম। তারা বল প্রয়োগে কৃষক ও বণিকের বিভিন্ন পণ্য এক চতুর্থাংশ দামে ছিনিয়ে নেয়; আবার জবরদস্তি ও অত্যাচারের মাধ্যমে এক টাকার জিনিসের জন্য কৃষককে পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য করে। আবার পাঁচটি টাকার জন্যে তারা এমন একজন লোককে অপমান ও আটক করে যে একশ টাকা ভূমিরাজস্ব দেয়। তারা আমার কর্মচারীদের কোনোরকম কর্তৃত্ব করতে দেয় না......প্রতি জেলাতে আমার কর্মচারীরা সমস্ত রকম কাজকর্ম থেকে বিরত আছে; সমস্ত শুল্ক থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমার বার্ষিক মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা'।[১০]

বাখরগঞ্জ থেকে সার্জেন্ট ব্রেগো-র (Sergent Brego) ১৭৬২-র ২৬শে মে লেখা চিঠিতে ঠিক মীরকাশিমের চিঠিতে বর্ণিত ইংরাজ ও গোমস্তাদে কার্যকলাপের অনুরূপ বর্ণনা আছে। ব্রেগো লিখেছেন ঃ 'একজন ভদ্রলোক (ইংরাজ) বেচাকেনার জন্য এখানে একজন গোমস্তা পাঠান। ঐ লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় প্রতিটি

৯। লেটার ফ্রম কোর্ট, ৩ মার্চ ১৭৫৮।
১০। রমেশচন্দ্র দত্ত, ঐ। ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩।

স্থানীয় অধিবাসীকে বলপ্রয়োগে তার জিনিস কিনতে এবং তাকে জিনিস বেচতে বাধ্য করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তার আছে। যদি কেউ অক্ষমতাবশত অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাত বা কয়েদ করা শুরু হয়। তারা রাজী হলেও যথেষ্ট নয়। এরপর দ্বিতীয় শক্তির ব্যবহার শুরু হয়। বিভিন্ন পণ্যে বাণিজ্য তারা কুক্ষিগত করে এবং এসব পণ্যে কেউ বেচাকেনা করতে পারে না। স্থানীয় কেউ যদি একাজ করে তাহলে তাদের ক্ষমতার পুনর্ব্যবহার হয়। আবার তারা যে জিনিস কেনে তার জন্য অন্য বণিকদের চেয়ে বেশ কম দাম দেয় এবং প্রায়ই ঐ দামও দেয় না। আমার হস্তক্ষেপ ঘটলে তারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়। গোমস্তাদের এরকম আরো অনেক বর্ণনাতীত অত্যাচারের ফলে এই স্থানটি (সমৃদ্ধ বাখরগঞ্জ জেলা) ক্রমশ জনশূন্য হচ্ছে। অধিবাসীরা প্রতিদিন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শহর ছাড়ছে। যে সমস্ত বাজার ছিল আগের দিনে প্রাচুর্যে ভরা এখন সেগুলিতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। তাদের পিওনরা গরীবদের লুণ্ঠন করায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। যদি জমিদার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে তার সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে বলে ভয় দেখানো হয়। আগের দিনে সরকারি কাছারিতে বিচার হত। এখন প্রত্যেক গোমস্তাই একজন বিচারক এবং তার গৃহ কাছারি। এমনকি তারা জমিদারদেরও বিচার করে শাস্তি দেয়। তাদের পিওনের সঙ্গে ঝগড়া এবং চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে তারা জমিদারদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করে।[১১] রানী ভবানীর জমিদারি ও রাজশাহীর অন্যান্য স্থানে কয়েকজন ইংরাজ বণিকের জবরদস্তিতে ব্যবসা ও অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট (১৭৬০-৬৫) ঐ অঞ্চলে অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে গঙ্গারাম মিত্রকে বরকন্দাজসহ পাঠিয়েছিলেন।[১২] অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এলাহাবাদ অঞ্চলে কোম্পানির কর্মচারীদের জবরদস্তি ব্যবসার বিরুদ্ধে কলকাতা কাউন্সিলের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।[১৩]

মীরকাশিমের অভিযোগ থেকে আরো জানা যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা সারা বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে চারশ থেকে পাঁচশ ফ্যাক্টরি বানিয়েছিল। নবাব ৯ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্কের বিনিময়ে কোম্পানির কর্মচারীকে অভ্যান্তরীণ বাণিজ্যাধিকার দিতে চেয়েছিলেন (এসময়ে এদেশীয় বণিকদের দেয় বাণিজ্য শুল্কের হার হল ২৫ শতাংশ)। কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু লবণের উপর ২½ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক ছাড়া আর কোনো পণ্যের উপর শুল্ক দিতে রাজী হল না। নবাব বিরক্ত হয়ে দুবছরের জন্য বাংলার অভ্যান্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক মুক্ত বলে

১১। রমেশ চন্দ্র দত্ত, ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪।
১২। প্রসিডিংস্, ১৭ জানুয়ারী ১৭৬৩।
১৩। প্রসিডিংস, সিক্রেট ডিপার্টমেন্ট, ২৬ এপ্রিল ১৭৬৪, জে. লঙ, ঐ, রেকর্ড নং ৮০২, পৃঃ ৫৩৮।

ঘোষণা করলেন।[১৪] মীরকাশিমের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার বণিকদের কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া। বিশেষ সুবিধাভোগী ইংরাজ বণিকরা মীরকাশিমকে তাদের বেসরকারি বাণিজ্য স্বার্থের সবচেয়ে বড় শত্রু ধরে নিয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করল। এ সময়ে ইংরাজ বণিকদের আচরণ সম্পর্কে জেমস্ মিলের অসাধারণ উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারেঃ 'স্বার্থ মানুষের সমস্তরকম বিচারবোধ এমনকি লজ্জাবোধও কেমন করে নষ্ট করে দেয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এসময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ।' মীরজাফর মীরকাশিমের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে (১৭৬৩) কোম্পানির কর্মচারীদের সুবিধাজনক ব্যক্তিগত ব্যবসা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর পুত্র নাজমুদ্দৌলাও (১৭৬৫) এ ব্যবসা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হলেন।[১৫] ১৭৬২তে এ ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬,৭৩,১১৭ পাউণ্ড বা শতকরা ১০০ ভাগ। ১৭৬৬ সনের ১৭ই মে এবং ১লা নভেম্বর কলকাতা কাউন্সিলকে লেখা ডিরেক্টর সভার চিঠিতে কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে মন্তব্য আছেঃ 'অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের আদেশ ও সম্রাটের ফারমান ভঙ্গ করেছে এবং ইদানীং যে যুদ্ধ বিগ্রহ হল (মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধ) তার পেছনে প্রকৃত কারণ হল এটি। এ ব্যবসায়ের ক্ষতি পূরণের (যুদ্ধের দরুন) যে বিশাল অংক তারা দাবী করেছে তাতে তাদের ব্যবসার বিস্তৃতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি খুলেছে। নবাবী রাজ্যের সর্বত্র হতভাগ্য অধিবাসীদের উপর এ ব্যবসা নিয়ে যে অত্যাচার হয়েছে তা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসা এমনিতে অনর্থ সৃষ্টি করে আর যেহেতু ইংরাজরা এমন সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেহেতু তাদের হাতে এ বাণিজ্য আরো দুর্দশা ও অনর্থের সৃষ্টি করতে সক্ষম।' ডিসেম্বরে ডিরেক্টর সভা কোম্পানির কনিষ্ঠতম কর্মচারী রাইটারদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এতে অবশ্য সমস্যার সমাধান হল না। ১৭৬৪র জুনমাসে তারা গভর্ণরকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালনার জন্যে পরিকল্পনা রচনা করতে বললেন। এরই ফলশ্রুতি হল ক্লাইভের তিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে— লবণ, সুপারি ও তামাক একচেটিয়া ব্যবসায়ের পরিকল্পনা (আগস্ট, ১৭৬৫), এর লভ্যাংশ কোম্পানির ষাটজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে (সোসাইটি অব ট্রেড) বন্টন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পছন্দ হল না। তারা সরকারি তত্ত্বাবধানে এ ধরনের একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

১৪। রমেশচন্দ্র দত্ত, ঐ, ১ম খণ্ড. পৃঃ ৩০।
১৫। এন. কে. সিংহ, ঐ ১ম খণ্ড. পৃঃ ৮১।

কারণ এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।[১৬]

**প্রতিকার**ঃ সোসাইটি অব ট্রেড তুলে দিয়েও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানো গেল না। কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে বেসরকারি ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকল। ১৭৭৩-এ হেস্টিংস এ দস্তক তুলে দিয়ে এবং সবার জন্যে ২½ শতাংশ শুল্ক ধার্য করে সমস্যার আংশিক সমাধান করেছিলেন।[১৭] ঐ বছর ১৬ ফেব্রুয়ারী এক আদেশ জারি করে তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্যাধিক্যার বজায় রেখেও দস্তকের অপব্যবহার ও সরকারের শুল্ক ফাঁকি বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় প্রত্যেককে প্রথমে ২½ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক দিতে হত। পরে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত পেত ( drawback system )। এ ব্যবস্থায় এদেশীয় বণিকদের কাছে কোম্পানির দস্তক বিক্রি করে সরকারি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার প্রথা বন্ধ হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্টে রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ ছিল। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, স্বনামে ও বেনামে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ-ভাবে লবণ, সুপারি, তামাক ও চালের ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ বেআইনি ঘোষিত হয়। ১৭৮৮তে কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার রহিত করেন। অবশ্য তিনি তাদের বেতন ও কমিশন অনেকখানি বাড়িয়ে দেন। শুধু বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীদের কতকগুলি শর্তাধীনে এ অধিকার বজায় রাখা হয়। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) কোম্পানির কমার্সিয়াল এজেন্ট কোম্পানির পণ্য কিনে তবেই নিজের ব্যবসায়ের পণ্য কিনতে পারবেন,

(খ) তিনি উৎপাদকদের কাছে কোম্পানি ও তার নিজের ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন।

(গ) কোম্পানির পণ্যের ক্রয়মূল্যকে মাপকাঠি করে তিনি নিজের পণ্য কিনতে পারবেন না।

(ঘ) তিনি কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে অন্য বণিকদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবেন না।

১৬। লেটার ফ্রম কোর্ট, ১৭ই মে, ১৭৬৮ ও উইলিয়ম বোল্টস, ঐ, পৃঃ ১৭০—১৮৮। 'the Court of Directors evidently aim at diffusing this traffic ( inland trade ) in the most extensive and equitable manner amongst the natives themselves, so as to prevent a monopoly of it in the hands of ministers, favorites and dependants of the Govt. to the injury and oppression of the industrious merchant and laborer'. সিলেক্ট কমিটি প্রসিডিংস, ৪ আগষ্ট, ১৭৬৭।

১৭। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ১৫৮

(ঙ) অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে সমপর্যায়ে আইনানুগভাবে তার বাণিজ্য বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে।

(চ) তিনি কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনায় কোনোরকমে কমিশন নেবেন না ; নিজের পুঁজির উপর নির্ভর করে বাণিজ্য করবেন।

(ছ) নিজের আড়ঙে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে তিনি ব্যবসা করতে পারবেন না।

(জ) তিনি আড়ঙে যে পণ্য কিনবেন তা সেখানে বিক্রি করা চলবে না বা অন্য কোনো বিদেশী কুঠিতে পাঠানো যাবে না। যদি কলকাতা বা উত্তর ভারতে পাঠানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শুল্ক চৌকিতে তার নামে নথিবদ্ধ করতে হবে।

(ঝ) প্রতিবছর ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তার ব্যবসায়ের সম্ভাব্য বার্ষিক হিসাব—১লা মে থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বোর্ড অব ট্রেডের নিকট দাখিল করতে হবে। বোর্ড ঐ হিসেব তাদের মন্তব্যসহ গভর্ণর জেনারেলের বিবেচনার জন্য পাঠাবেন।[১৮]

ইতিপূর্বে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়নি। কর্ণওয়ালিশ শুধু কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বৃটিশ বণিকদের ব্যবসা ও কাজকর্মও অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে ১৭৯৩-এ কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এগুলি হলঃ (১) ১৭৯৩ সনের ৩১ নং রেগুলেশনে তাঁতিদের সঙ্গে জবরদস্তি চুক্তি নিষিদ্ধ হয়। (২) ঐ বছরের ৩৮ নং রেগুলেশনে ইউরোপীয়দের এদেশে জমি কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। (৩) ২৮ নং রেগুলেশনে প্রেসিডেন্সি শহরের দশ মাইলের বাইরে ইউরোপীয়দের অবস্থিতির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।[১৯]

শতাব্দীর শেষ দশকে স্বাধীন বণিকরা নিজেদের এজেন্সি হাউস ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। নীল, চিনি, রেশম, তুলা, সুতীবস্ত্র ও খাদ্যশস্য রপ্তানি করে স্বাধীন বৃটিশ বণিকরা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এমনকি কোম্পানির সরকারি ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এর প্রধান কারণগুলি হলঃ (১) বৃটিশ স্বাধীন বণিকরা কোম্পানির চেয়ে বেশি দামে রপ্তানি পণ্য কিনত। (২) কোম্পানিকে ইংল্যাণ্ডে উচ্চহারে শুল্ক দিতে হত এবং কোম্পানির পণ্য দেরিতে বিক্রি হত। (৩) স্বাধীন বণিকরা ইউরোপে খুব সহজেই পণ্য বিক্রি করতে পারত এবং তাদের নামমাত্র শুল্ক দিতে হত। (৪) এরা বিদেশী বন্দর ও জাহাজ ব্যবহার করত। এই সব সুবিধা থাকার জন্যে বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্য ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। আশির দশকে ঢাকা অঞ্চলে কোম্পানি ও বৃটিশ বণিকদের মধ্যে সুতীবস্ত্র কেনার প্রশ্নে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছিল।

১৮। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯।
১৯। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃ, ২০।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেসরকারি ব্যবসায়ের অপর উল্লেখযোগ্য দিকটি হল বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যে সহযোগিতা। উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আসার পর বিভিন্ন দেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকত ঠিকই তবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিত দেখা যেত। প্রাক্‌-পলাশী যুগে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অসংখ্য সহযোগিতার দৃষ্টান্ত আছে। কাশিম-বাজারের ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ মঁশিয়ে ল এবং কলকাতার উইলিয়ম ব্যাটসনের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা দেখা যায়। ইংরাজরা ফরাসি ও ওলন্দাজদের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাত। পলাশী-পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর অল বাই (Ole Bie) ইংরাজদের বেসরকারি ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। হেস্টিংসের সময়ে (১৭৭২-৮৫) চন্দননগরের ফরাসি গভর্ণর শেভালিয়র (Chevalier) এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর রস (Ross) ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতায় ব্যক্তিগত ব্যবসা করতেন।

এযুগের বেসরকারি ব্যবসায়ের অপর বৈশিষ্ট্য হল কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যবসা কোম্পানির সরকারি ব্যবসায়ের ক্ষতি করত। কোম্পানির ব্যবসায়ের ক্ষতি করে নানা অবৈধ উপায়ে কর্মচারীরা অর্থোপার্জন করত। (১) নিম্নমানের পণ্য কোম্পানির কাছে বেশি দামে বিক্রি করত; (২) কোম্পানির মূলধন উৎপাদকদের আগাম দেওয়ার সময় তার একাংশ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা ছিল; (৩) কোম্পানির পুঁজি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লগ্নি করা হত; ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লোকসান দেখা দিলে অনেক সময় কোম্পানির পুঁজিও নষ্ট হত; (৪) জবরদস্তি করে উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানির সুনাম ও এদেশের উৎপাদন দু'ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৫) ইংরাজদের বাণিজ্য হস্তগত করার চেষ্টার ফলস্বরূপ বাংলায় অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়। কোম্পানির কর্মচারীদের এরকম কাজকর্মের ফলে দেখা গেল যে পণ্যে ব্যবসা করে কোম্পানির লোকসান হয় ঠিক সেই পণ্যেই বেসরকারি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লাভ দেখা দেয়। ১৭৭১-৮৬ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশম ব্যবসায়ে লোকসান হয়েছিল অথচ ঐ সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের ঐ পণ্যে লাভ হত।[২০]

কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমস্ত বন্দরের সঙ্গে—বালেশ্বর, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরি, রাজমুন্দ্রি, নেগাপতম, বিশাখাপতম, কালিকট, কোচিন, মাহে, সুরাট, বোম্বে, গোয়া প্রভৃতি—বাণিজ্য করত। স্থলপথে আগ্রা, দিল্লী, মির্জাপুর, বারাণসী, অযোধ্যা, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, আসাম, তিব্বত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। চন্দননগরের শেভালিয়র তূলা, চুন, তামাক, সোনার সুতো, মুগাধুতী, শাঁখ, হাতির দাঁত প্রভৃতি পণ্যে ব্যবসা করতেন। কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাত লবণ, চিনি, চাল, চট, আদা, হলুদ, তামাক, সুপারি, রেশম, মস্‌লিন ও সুতীবস্ত্র। আর

২০। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল ও স্থলপথে বাংলায় আনত তুলা, নীল, আফিম, কাঠ, লংকা, মশলা ও লবণ। নীল, আফিম ও উপকূল বাণিজ্যে বেসরকারি ব্যবসায়ে বেশ লাভ হত। শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোম্পানির কর্মচারীরা কলকাতার এজেন্সি হাউসগুলিতে টাকা লগ্নি করে লভ্যাংশ পেত আর বৃটিশ স্বাধীন বণিকরা বেসরকারি ব্যবসা পরিচালনা করত।

**এশিয় বাণিজ্য:** এশিয়ার পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে—পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, আরব, ইয়েমেন, ওমান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, ফিলিপিন, চীন, শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ ও মালদ্বীপপুঞ্জ—বাংলার ইউরোপীয় বণিকরা বেসরকারি বাণিজ্য সম্পদ গড়ে তুলেছিল। এ বাণিজ্যে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির কর্মচারীরা অনেকগুলি জাহাজের মালিক। শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় ৫৬ খানি জাহাজ ও ৯০ খানি স্নো (Snow) তৈরি হয়েছিল। এর মোট পণ্য পরিবহন ক্ষমতা হল ৩৯,০৮০ টন। এ যুগে জাহাজ ভাড়া দেওয়ার ব্যবসাও বেশ লাভজনক হত। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে কোম্পানির কর্মচারীরা চাল, রেশমবস্ত্র, চিনি, সুতীবস্ত্র ও মস্লিন নিয়ে যেত আর বাংলাদেশে খেজুর, মদ, গোলাপজল, ঘোড়া ও সোনা রুপো আমদানি করত। চল্লিশের দশকে এ ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়, তবে সত্তরের দশকে পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য জোরালো হয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। এ অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকরা প্রধানত নিয়ে যেত সুতীবস্ত্র ও আফিম আর নিয়ে আসত টিন, লংকা, মশলা, দস্তা, ও তুতেনাগ (দস্তা ও তামার সঙ্কর ধাতু)। বেসরকারি বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশ থেকে টিন ও কাঠ, মালদ্বীপ থেকে কড়ি ও শাঁখ বাংলায় আসত। চীনের ক্যান্টন বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য এ যুগে বেসরকারি বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। কোম্পানির কর্মচারীরা চীনদেশে আফিম পাঠাত। আফিম বিক্রির টাকা কোম্পানির ক্যান্টন ট্রেজারিতে জমা দিয়ে বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে পারত। কোম্পানি এই টাকায় চীনদেশ থেকে চা কিনত। সারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ ব্যবসা চালু ছিল। চীনদেশ থেকে বাংলায় আসত তুতেনাগ, ফিটকিরি, চিনি (Sugar candy), চা ও পোর্সলেনের তৈজসপত্র।[২১]

**ইউরোপীয় বাণিজ্য:** প্রাক্-পলাশী যুগে কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যাধিকার ছিল না। এ বাণিজ্য কোম্পানিগুলির একচেটিয়া অধিকার (Monopoly right)। শুধুমাত্র মূল্যবান পাথর, হীরা, জহরত, মণিমুক্তো তারা ইউরোপে পাঠাতে পারত। তবে কোম্পানির প্রতি জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্মচারীরা পঞ্চাশ টন পণ্য নিজেদের জন্য নিয়ে যেতে পারত। এই সুবিধাজনক বাণিজ্যাধিকার (Privileged trade) তারা কোম্পানির কর্মচারী ও

২১। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ২৯, ৩৮।

স্বাধীন বণিকদের কাছে বিক্রি করত। এভাবে বছরে ৭০০-৭৫০ টন রেশম ও সুতীবস্ত্র ইউরোপীয় বণিকরা স্বদেশে পাঠাতে পারত। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এরা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যে অংশ নিতে শুরু করে। বিদেশী জাহাজে বাংলার পণ্য লিসবন, কোপেনহেগেন, আমস্টারডাম, অস্টেণ্ড, কালোন ও হামবুর্গ পৌঁছাত। অবশ্য এ ব্যবসা গোপন ও অপ্রকাশিত থাকত। ১৭৯৩-এর চার্টার এ্যাক্টে কোম্পানির জাহাজে বৃটিশ বণিকদের ৩০০০ টন আমদানি-রপ্তানি পণ্য বহন করার অধিকার দেওয়া হয়। একদিকে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অন্যদিকে বৃটিশ বণিকদের স্বাধীন বাণিজ্যের দাবী (Monopoly vs Free Trade) নিয়ে বিতর্ক ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। ইংল্যাণ্ডের শিল্পপণ্য ভারতে বিক্রি করা এবং এদেশ থেকে শিল্পের উপযোগী কাচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতি ও বণিক গোষ্ঠী কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের অবসান দাবী করতে থাকে। ১৭৯৩-এর চার্টার এ্যাক্টে পিট ও ডাণ্ডাস (প্রধানমন্ত্রী ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট) কোম্পানির হাতে নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া বাণিজ্য (regulated monopoly) বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতী ও রেশম-বস্ত্র, তামা, গোলাবরুদ, সমরসম্ভার, মস্‌লিন প্রভৃতি কয়েকটি পণ্যে কোম্পানির অধিকার রক্ষা করা হয়েছিল। শতাব্দীর শেষ দশকে বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্য অসাধারণ বৃদ্ধি পায়। বছরে তারা গড়ে প্রায় দুকোটি টাকার পণ্য ইউরোপে পাঠাত। ১৭৯৫-৯৬ সনে তারা ২,০৪,৫০,১৩১ টাকার পণ্য রপ্তানি করেছিল। এদের ইউরোপে পাঠানো পণ্যগুলি হল নীল, চিনি, সুতীবস্ত্র, রেশম, খাদ্যশস্য ও তুলা।[২২] শতাব্দীর শেষ দিকে সামগ্রিকভাবে বাংলার অর্থনীতির উপর ইউরোপীয় বণিকদের বেসরকারি বাণিজ্যের প্রভাব অনেক বেড়েছিল। জাহাজ পরিবহন ব্যবসা, সরকারি ঋণপত্র ক্রয়, ব্যাঙ্কিং, ইনস্যুরান্স, কমিশনে ব্যবসা, এক্সচেঞ্জের কাজ সবই ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস ও ব্যাঙ্কারদের হাতে অনেকখানি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের সংগৃহীত অর্থ এসব প্রতিষ্ঠানে লগ্নি করে লভ্যাংশ পেত। বাংলার অর্থ ও বাণিজ্যের সিংহভাগ বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বণিকদের বেসরকারি ব্যবসা বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রথমত, বৃটিশ বণিকরা বাংলার কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে—লবণ, আফিম, চুন ও সুপারি—একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। এগুলিতে পাইকারি ব্যবসা ইংরাজদের হাতে থাকত আর খুচরো ব্যবসা পরিচালনা করত এদেশীয় বণিকরা। এগুলি ছাড়া অন্যসকল পণ্য যেমন খাদ্যশস্য, তুলা ও মোটাকাপড় ইত্যাদির ব্যবসা মুক্ত ছিল।[২৩]

২২। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৭৯।
২৩। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ২৬৯।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানি ও কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে লবণ, সুপারি, চুন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছিল। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইংরাজদের অযৌক্তিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য—ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে—ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এসব অঞ্চল থেকে যেসব বণিকদল প্রতিবছর বাংলায় বাণিজ্য করতে আসত তারা নিরুৎসাহিত হয়েছিল।[২৪]

তৃতীয়ত, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয়দের বাড়তি রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন বেড়েছিল কিনা বা শ্রমের নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল কিনা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে যা নিশ্চিত করে বলা যায় তা হল লবণ উৎপাদক মালঙ্গিরা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পেত না। ঢাকার তাঁতিদের সত্তরের দশকের পারিশ্রমিক চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হয়েছিল। বিহারের আফিম চাষীদের ভাগ্যে ঐ একই দশা হয়েছিল।

চতুর্থত, এদেশের রেশম শিল্প, চিনি ও নীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারী ও সাধারণ বণিকরা আগ্রহ দেখিয়েছিল। এ তিন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগও হয়েছিল। এছাড়া জাহাজ নির্মাণ, ব্যাঙ্কিং ও বীমার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও সংগঠনের আবির্ভাব হয়। বাংলার সমুদ্র বাণিজ্যে জাহাজ পরিবহন বৃটিশ ও ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে যায় ঠিকই, তবে এতে এদেশীয় বণিকদের এশীয় বাণিজ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। এ বাণিজ্যের পরিমাণ বরং বেড়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

পঞ্চমত, ইউরোপীয়দের বেসরকারি বাণিজ্যের জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বণিকসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে প্রাক্-পলাশী যুগের সঙ্গে তুলনায় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বণিকরা যে স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারিয়েছিল (প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসে) একথা বলা যায়।

ষষ্ঠত, বেসরকারি ব্যবসায়ের এক উল্লেখযোগ্য দিক হল শতাব্দীর শেষ তিন দশকে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং ও এজেন্সি হাউসের উদ্ভব। এর ফলে এদেশের স্রফ ও ব্যাঙ্কারদের কাজকর্ম কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পলাশীর পর থেকে নবাবদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক জগৎশেঠ পরিবারের অবক্ষয় শুরু হয়। ১৭৭২-এ রাজস্ব দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে তাদের পতন আসন্ন হয়ে উঠে। তবে কলকাতা ও বারাণসীর ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলি—গোপালদাস, হরিকিষেণদাস, বুলাকি দাস, মনোহর দাস—দ্বারকাদাস, শেঠ ও বসাক—শতাব্দীর শেষ অবধি আর্থিক লেনদেনের ব্যবসায়ে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল।

২৪। এন. কে. সিংহ, ঐ. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।

# ১০

# আর্থিক নিষ্ক্রমণ

## (Economic Drain)

অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী বাংলার সম্পদ নিয়মিতভাবে দেশের বাইরে বিশেষ করে ইউরোপে চালান যায়। পলাশীর পর থেকে রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে সম্পদের বহির্গমনের হার বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে এই সম্পদ চলে যাওয়ার ঘটনাকে সমাজবিজ্ঞানীরা আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা 'economic drain' নামে অভিহিত করেছেন। এই শতাব্দীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে হ্যারি ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন শোর, জেমস্ গ্রান্ট এবং এসময়কার ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক এডমণ্ড বার্ক বিভিন্ন সময়ে বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ ও তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভেরেলস্ট লিখেছেন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চীনদেশে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্যে বাংলা থেকে সোনা ও রুপো রপ্তানি শুরু হয়।[১] ষাটের দশকে এর বার্ষিক পরিমাণ হল চব্বিশ লাখ টাকা; সত্তরের দশকে কুড়ি লাখ টাকা। ফিলিপ ফ্রান্সিস মন্তব্য করেছেন 'কোম্পানির কর্মচারীদের উদ্দেশ্য হল দ্রুত সম্পদ আহরণ করা এবং সেই সম্পদ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া। এভাবে সম্পদ আহরণের ফলে এদেশের সম্পত্তির উপরে স্বল্পকালীন চাপ সৃষ্টি হয় এবং এগুলি, ভগ্নদশাগ্রস্ত ও নিঃশেষিত বলে মনে হয়।' সুয়েজ বাণিজ্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রান্সিস আরো জানিয়েছেন বাংলা থেকে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অফিসাররা পণ্য নিয়ে যায় না কারণ এখন বাংলাদেশে জিনিসের দাম বেশি অথচ পণ্যের দাম নিম্নমুখী। এজন্য তারা বাংলা থেকে সোনা ও রুপো নিয়ে যায় এবং তাঁর হিসাবমত এর পরিমাণ বার্ষিক বারো লাখ টাকার কম নয়।[২]

১৭৮০ খ্রীঃ ২৩ নভেম্বর বাংলা থেকে সোনা রুপো বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস মন্তব্য করেছেন 'প্রতিবছর প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার সোনা রুপো দেশে (ইংল্যাণ্ডে) পাঠানো হয়; এটা হল বাংলা থেকে প্রতি বছর মোট রপ্তানি করা সোনা রুপোর ৪০ শতাংশ।' অবশ্য তিনি জানিয়েছেন এ হিসাব একেবারে নির্ভুল নয় বা অভ্রান্ত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ১৭৮৯-এর ১৮ জুনের প্রতিবেদনে জন শোর লিখছেনঃ 'অনেকে ব্যক্তিগতভাবে

১। এন. কে. সিংহ, ঐ. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।
২। কনসালটেশনস, ৪ নভেম্বর ১৭৭৬।

ইউরোপে রুপো চালান করে। এর পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না; তবে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে এর পরিমাণ যথেষ্ট বলা যায়'। 'মোট কথা আমার বলতে অসুবিধা নেই যে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। আগের দিনে বিভিন্ন পথে আমদানির মাধ্যমে এ শূন্যতা পূরণ করা হত। সে পথগুলি এখন প্রায় বন্ধ। চীন, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে টাকার যোগান এবং ইউরোপীয়দের ইংল্যাণ্ডে টাকা পাঠানোর ফলে ভবিষ্যতে এদেশ থেকে রুপোর নিষ্ক্রমণ চলতে থাকবে।'[৩] জন শোর তাঁর মিনিটে আরো জানিয়েছেন বিদেশী কোম্পানিগুলি বাংলাদেশে আর সোনা রুপো আনে না বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সোনা-রুপো আর বাংলাদেশে আসে না। তার ফলেই রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রা সংকট। সি. জে. হ্যামিলটনের মতে বাংলা থেকে রপ্তানি করা সোনা রুপোর বেশির ভাগ যেত চীনদেশে—ইংল্যাণ্ডে নয়। ইংল্যাণ্ডে যে সম্পদ যেত তার মাধ্যম হল পণ্য সম্ভার, সোনা রুপো নয়। তাঁর এ মন্তব্যের মধ্যে সত্য আছে কারণ সিলেক্ট কমিটির ১৭৭২-৭৩ ও ১৭৮২-৮৩-র প্রতিবেদনে সোনা রুপোর মাধ্যমে আর্থিক নিষ্ক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শেষোক্ত রিপোর্টে রপ্তানি পণ্যের মাধ্যমে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। তাছাড়া এসময় বাংলার বাজারে সোনা রুপোর দাম ইংল্যাণ্ডের বাজার দরের তুলনায় বেশি। আর্থিক রীতি অনুযায়ী চড়া বাজার থেকে মন্দা বাজারে পণ্য রপ্তানি স্বাভাবিক-ভাবে হয় না।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় স্বাধীন বণিকরা বাংলার আর্থিক সম্পদের নিষ্ক্রমণে অংশীদার হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কোম্পানির কর্মচারী জন বেবের (John Babb) মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ: 'সুদূর এক দেশের অধীন থেকে এদেশে প্রতিনিয়ত ও অনিবার্যভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ ঘটছে; এই লোকগুলি (ইউরোপীয় স্বাধীন বণিক) নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। এদের কেহই বাংলাদেশে সংগঠন চায় না। যে মুহূর্তে তাদের সম্পদ অর্জিত হয় তারা দেশে পাঠায় এবং সেই পরিমাণে নিষ্ক্রমণ চলতে থাকে। এদেশ থেকে তারা যা আয় করে তার বিনিময়ে এদেশে কোনো সাহায্য, কোনো অনুদান তারা রাখে না। যদি একজন বাঙালী বা আর্মেনীয় বণিক তাদের মত বিশাল সম্পত্তি অর্জন করে তাহলে সে বা তার পুত্ররা সংগঠন আরো বাড়িয়ে তোলে এবং এদেশের সম্পদ এদেশের উন্নতিতে ব্যবহৃত হয়।'[৪] স্বাধীন বণিকদের সম্পর্কে জন বেব-এর মন্তব্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এদেশ থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণে তাদের ভূমিকা ও মানসিকতা স্বাধীন বণিকদের অনরূপ। এডমণ্ড বার্ক ১৭৮৩র সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টটি রচনাকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য

৩। জন শোর, মিনিট, ১৮ জুন ১৭৮৯।
৪। এন. কে. সিংহ, ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

রেখেছেনঃ কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাংলাকে লুণ্ঠন করে ধ্বংস করছে। ঐ প্রতিবেদনে তিনি বার্ষিক লুণ্ঠনের (annual plunder) কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি।[৫]

পার্সিভাল স্পীয়ার তাঁর 'ইন্ডিয়া—এ মডার্ণ হিস্ট্রি' গ্রন্থে বেসরকারি বণিকদের আর্থিক লোভ (Private financial greed) এবং কোম্পানির সরকারি নীতি (public policy) বাংলার ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] অর্থাৎ বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ দুটি প্রধান ধারায় হয়েছে বলে ধরা যায়—বেসরকারি বণিকদের ব্যবসায় এবং কোম্পানির অনুসৃত বাণিজ্য ও অর্থনীতি। বেসরকারি বণিকদের মাধ্যমে যে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছে তাকে চারভাগে আলোচনা করা যায়। (১) হীরা, জহরত, মণিমুক্তো কিনে ইউরোপে পাঠানো, (২) ইউরোপ ও ইংল্যান্ডে বাংলার রপ্তানি পণ্য ও সোনা রুপো পাঠানো, (৩) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে, (৪) অন্যান্য বিদেশী কোম্পানির—ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি—বিল কিনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশে নানাউপায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিল।

(ক) পলাশী থেকে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে নবাবদের সঙ্গে নানারকম চুক্তির মাধ্যমে (business of making and unmaking Nawabs) কোম্পানির কর্মচারীরা মোট পাঁচকোটি চালানি টাকা পেয়েছিল।[৭] সমকালীন কাগজপত্রে যে হিসাব আছে তা থেকে এরকম অংশ পাওয়া যায়। ১৭৬৫র ফেব্রুয়ারী মাসে নবাব মীরজাফর মারা গেলে কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসাররা মীরণের শিশুপুত্রের সিংহাসনের দাবী নস্যাৎ করে মীরজাফরের বিবাহবহির্ভূত পুত্র নাজমুদ্দৌলাকে সিংহাসন দেন। ঐ সময় কোম্পানির চারজন উচ্চপদস্থ অফিসার জনস্টন (Johnstone), লিসেস্টার (Leycester), সিনিয়র (Senior) ও মিডলটন (Middleton) নতুন নবাবের কাছ থেকে ৬২,৫০,০০০ টাকা উপহার হিসাবে নিয়েছিলেন। স্বয়ং রেজা খাঁ এদেরকে উপহার দিয়েছিলেন ৪,৭৬,০০০ টাকা। অবৈধ অর্থোপার্জনের অসাধারণ লোভ (inordinate love of unmerited wealth) এ ঘটনায় যথার্থভাবে প্রতিফলিত।[৮] যে টাকা প্রমাণ ছাড়া তাঁরা নিয়েছিলেন তার কোনো হিসেব করা যায় না।

(খ) ১৭৫৭-১৭৭১ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে এবং কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসা করে তারা বেশ ভালরকম অর্থোপার্জন করেছিল। ফ্রান্সিস সাইকস্, বারওয়েল, ভেরেলস্ট প্রভৃতি কর্মচারীরা এ ধরনের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থলাভ করেছিলেন বলে প্রমাণ

৫। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ২৬১।
৬। প্যার্সিভাল স্পীয়ার, ইন্ডিয়াঃ এ মডার্ণ হিস্ট্রি. পৃঃ ১৯৭-১৯৮।
৭। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১।
৮। লেটার টু কোর্ট, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫।

আছে। বারওয়েলের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে থাকাকালীন তিনি মোট আশি লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। (গ) নানারকম লাভজনক চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা টাকা রোজগার করত। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়কালে এ প্রথায় অর্থলাভের পথ প্রশস্থ হয়। গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে এরকম লাভজনক ইজারা দিয়ে অর্থোপার্জনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে অভিযোগ করা হয়েছিল। বন্ধু ও অনুরাগীদের হেস্টিংস এরকম সুযোগ করে দিতেন। স্টিফেন সুলিভান, চার্লস ক্রফট্স্, চার্লস ব্লাণ্ট (Blunt) ও জন বেলি প্রমুখ সকলেই কিছু না কিছু লাভজনক চুক্তি বা ইজারা পেয়েছিলেন। বাঁধ নির্মাণ, আফিম, ষাঁড়, ঘোড়া, সামরিক দ্রব্যসম্ভার প্রভৃতি সরবরাহ করার জন্য চুক্তি হত। মার্কসের লেখায় এ যুগে এরকম চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থোপার্জন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে। মার্কস লিখেছেন; 'আলকেমিস্টদের চেয়েও বুদ্ধিমান এই প্রিয়পাত্ররা শূন্য থেকে সোনা বানাত।[৯]

(ঘ) বোর্ড অব ট্রেডের সদস্যারা গোপন চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি ও উৎপাদকদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করত। ডিরেক্টর সভা এদের উপর এত চটেছিলেন যে দেশে ফেরার পর এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করা হয়। কোম্পানির কর্মচারীরা পণ্য কেনার সময় উৎপাদক ও বণিকদের কাছ থেকে পণ্যমূল্যের একাংশ দস্তুরি হিসেবে নিত। এর হার হল টাকায় ৫ গণ্ডা থেকে ৩০ গণ্ডা।

কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা হীরা, জহরত, মণিমুক্তো কিনে ইউরোপে পাঠানোর অধিকার পেয়েছিল। বাংলাদেশে এগুলি পাওয়া যেত না বলে ভারতের বিভিন্ন স্থান যেমন হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও কাশী থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হত। বাংলার নবাবরা এগুলি অন্য প্রদেশ থেকে কিনে এনে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপঢৌকন দিতেন। এজন্যে প্রতিবছর বেশ মোটা টাকা বাংলার বাইরে চালান যেত। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও বারওয়েল তাদের সঞ্চিত অর্থের একাংশ এভাবে দেশে পাঠিয়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে হীরা ও মণিমুক্তোর চাহিদা এত বেশি ছিল যে অন্য বণিকরা এ পণ্য সামান্য পরিমাণেও নিতে পারত না। কাশীর জুয়েলারি বাজারে কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের লোক নিযুক্ত করে এগুলি সংগ্রহ করত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ থেকেও মূল্যবান পাথর ও হীরা সংগৃহীত হত। ১৭৮৬র ৪ অক্টোবর কলকাতা কাউন্সিল মিঃ লায়ন প্রাজার (Lyon Prager) নামে এক ব্যক্তিকে কাশীতে গিয়ে মণিমুক্তো হীরা জহরতে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিল। উদ্দেশ্য হল কোম্পানির কর্মচারীদের সহজে দেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা।[১০]

ওয়ারেন হেস্টিংস ও জন শোর উভয়েই কোম্পানির কর্মচারীদের ইউরোপে সোনা রুপো রপ্তানি করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের ধারণা এজন্যে

৯। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪।
১০। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৪৬।

বাংলাদেশে মুদ্রা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটত। কোম্পানির জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের সুবিধাজনক ব্যবসার ( Privilege trade ) সুযোগ নিয়ে কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা বছরে প্রায় ৭৫০ টন সিল্ক ও সুতীবস্ত্র ইংল্যাণ্ডে পাঠাত। এভাবে দেশে টাকা পাঠানোর পরিমাণ অবশ্য বেশি নয়। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীরা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির উপর বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে শুরু করে দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর সভা প্রথম দিকে বিলের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীদের টাকা ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর সম্মতি দেয়নি। যখন তারা দেখলেন এভাবে বিদেশী কোম্পানিগুলি লাভবান হচ্ছে তখন তারা কর্মচারীদের কোম্পানির উপরে বিলের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ দিলেন। বাংলার টাকা ও পাউণ্ডের মধ্যে বিনিময় হার এমনভাবে ধার্য করা হল যে কর্মচারীরা এ সুযোগ নিতে বিশেষ আগ্রহী হল না। ১৭৬৫র ২৮ নভেম্বর ক্লাইভ ডিরেক্টর সভাকে লিখছেন: 'বিল দিতে অস্বীকার করলে বিদেশী বিশেষ করে ওলন্দাজদের হাতে প্রচুর টাকা চলে যাবে—এর কারণ হল সম্প্রতি অনেক ধনসম্পদ ( immoderate riches ) অর্জিত হয়েছে।'[১১] ডিরেক্টর সভা শেষ পর্যন্ত তাদের নির্বুদ্ধিতা বুঝলেন এবং কোম্পানির কর্মচারীদের বছরে ৭০,০০০ পাউণ্ড বিলের মাধ্যমে দেশে পাঠানোর অনুমতি দিলেন।[১২] বাংলাদেশে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই সীমারেখা কখনো মানেননি এবং বছরে অনেক বেশি টাকা বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লণ্ডনে পাঠানো হত। ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ পর্যন্ত বাংলা থেকে বিলের মাধ্যমে যে টাকা লণ্ডনে পাঠানো হয়েছিল তার পরিমাণ হল ২৫,৯৮,৯৩১ পাউণ্ড।

পলাশী-পরবর্তীকালে কোম্পানির কর্মচারীরা ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের বাংলা বাণিজ্যের মলধন সরবরাহ করেছিল। সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্ট ( ১৭৮৩ ) অনুযায়ী এর বার্ষিক পরিমাণ হল দশ লক্ষ পাউণ্ড। কোম্পানির কর্মচারীরা এ পথে টাকা পাঠানোর খুব বেশী আগ্রহী হত কারণ তাদের অবৈধ টাকার হিসাব এভাবে গোপন রাখা সম্ভব হত। ১৭৬৮ সনে বিদেশী কোম্পানিগুলির হাতে সঞ্চিত পুঁজি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের মন্তব্য হল ফরাসি ও ওলন্দাজদের হাতে এত টাকা মজুদ আছে যে তা দিয়ে আগামী তিনবছরে তাদের পক্ষে রপ্তানি পণ্য কেনা বা অন্য খরচ চালানো সম্ভব হবে। ১৭৬৭-তে বারওয়েল কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে লিখছেন: '১৭৬৫ থেকে ( যখন কোম্পানি বিল দিতে অস্বীকার করে ) ১৭৬৭ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীরা ফরাসি ও ওলন্দাজদের মাধ্যমে কমপক্ষে বারো লক্ষ পাউণ্ড ইউরোপে পাঠিয়েছে।' অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্য দিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা বছরে অন্ততঃ ছয় লক্ষ পাউণ্ড ইউরোপে পাঠাত। অপর একটি মত হল বেসরকারি খাতে প্রতি বছর বাংলা থেকে ৫,০০,০০০ পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডে চলে যেত।[১৩]

১১। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৪৬
১২। লেটার ফ্রম কোর্ট, ১১ নভেম্বর. ১৭৬৮।
১৩। পি জে. মার্শাল, ঐ পৃঃ ২৬২

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানি খাতে আর্থিক নিষ্ক্রমণ শুরু হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর কোম্পানি বাংলাদেশে কোনো সোনা রুপো আনেনি। বাংলার সংগৃহীত রাজস্ব থেকেই তার বাণিজ্য চলত। সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্ট (১৭৮৩) অনুযায়ী বাংলা থেকে এভাবে কোম্পানি মারফত আর্থিক নিষ্ক্রমণ ১৭৮০তে বন্ধ হয়ে যায়। আধুনিক মত হল এভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ ১৭৮০ সনের পরেও চলেছিল।[১৪] কোম্পানি খাতে আর্থিক সম্পদের বহির্গমনকে চারভাগে আলোচনা করা যায়ঃ (১) এদেশীয় সম্পদের মাধ্যমে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য ক্রয় (Investment), (২) বাংলার রাজস্ব থেকে চীনদেশে কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনা, (৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক ব্যয়ের ঘাটতি মেটানো ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্যে পুঁজি সরবরাহ, (৪) যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে টাকার যোগান। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি এদেশীয় রাষ্ট্রশক্তিকে সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে যে অর্থলাভ করেছিল তার উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে রপ্তানি পণ্য ক্রয় শুরু করে দেয়। এর ফলে ১৭৫৭ থেকেই কোম্পানি খাতে এদেশ থেকে পণ্যের মাধ্যমে আর্থক নিষ্ক্রমণ শুরু হয়ে যায়। যোগেশচন্দ্র সিংহ এ সময়ের (১৭৫৭-১৭৬৫) কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড বা দু কোটি টাকা এ পথে বিদেশে চালান হয়ে যায়।

১৭৬৫ থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত এদেশ থেকে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সম্পদ দেশের বাইরে চলে যায়। দেওয়ানি লাভের পর থেকে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব—প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর ব্যয় মেটানোর পর যে অর্থ হাতে থাকে (গ্রাণ্টের হিসেব মত ১৮০,০০,০০০ টাকা; শতকের শেষে ১,৯৮,৬০,৮০০ টাকা)—কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কেনার জন্য ব্যয় করা হত। কোম্পানির ডিরেক্টর সভা ও শেয়ার মালিকরা বাংলার অপরিমেয় সম্পদের (অন্ততঃ এরকম অতিরঞ্জিত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল) ভাগ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকারও এসম্পদের অংশীদার হওয়ায় বাসনা প্রকাশ করলেন। ফলে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বার্ষিক চার লক্ষ পাউণ্ড, শেয়ার মালিকরা আরো দুলক্ষ পাউণ্ড, আগের ডিভিডেণ্ড এবং অন্যান্য সব আর্থিক দায়িত্ব সহ ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির বার্ষিক দেয় টাকার পরিমাণ দাঁড়ালো আট লক্ষ পাউণ্ড, ইংল্যাণ্ডের সরকার, শেয়ার মালিক ও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিবছর বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্বের একাংশ পণ্যের মাধ্যমে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এভাবে বাংলা থেকে ইংল্যাণ্ডে মোট এক কোটি পাউণ্ড পাঠানো হয়েছিল।[১৫]

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চীনের মধ্য দিয়ে আরো একপ্রকার আর্থিক নিষ্ক্রমণ শুরু হয়। ডিরেক্টর সভায় ১৭৬৩র ২ এপ্রিলের চিঠিতে কোম্পানির চীনবাণিজ্যের

১৪। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৫০-৫১।
১৫। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৫১।

উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ চিঠিতে ডিরেক্টর সভা কলকাতা কাউন্সিলকে লিখছেন : the China trade is a branch of the utmost importance to the company, and must be promoted to the utmost of the ability of our several presidencies.' শতাব্দীর তৃতীয় পাদে কোম্পানির কর্মচারীদের চীনের সঙ্গে গোপন আফিম ব্যবসা তেমন জোরালো হয়নি। এ সময় কোম্পানির চীনদেশের ব্যবসা পরিচালনা করার জন্যে বাংলাদেশ থেকে সোনা রুপো পুঁজি হিসেবে নিয়মিতভাবে পাঠানো হত। ষাটের দশকে এর বার্ষিক পরিমাণ হল গড়ে প্রায় চব্বিশ লাখ টাকা, সত্তরের দশকের প্রথম দিকে কুড়ি লাখ টাকা, নব্বুই-এর দশকে সতেরো বা আঠারো লাখ টাকা।[১৬] এ সময় থেকে আর সোনারুপো পাঠানোর দরকার হত না ; আফিম রপ্তানি করে চীনদেশ থেকে কোম্পানির চা কেনার পুঁজি সংগ্রহ করা হত। ১৭৬৬র ১১ জানুয়ারী কলকাতার সিলেক্ট কমিটি ঐ বছর চীনদেশে ব্যবসার জন্যে তিন লক্ষ পাউণ্ড বা তিরিশ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করে রেখেছিল বলে জানা যায়। হাউস অব কমন্‌সের সিলেক্ট কমিটির নবম প্রতিবেদনে (১৭৮৩) চীনের ব্যবসার জন্যে প্রতিবছর একলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭৭২এ জেমস্ স্টুয়ার্ট (James Steuart) লিখছেন : 'চীনদেশে ব্যবসার জন্যে কোম্পানি বাংলা থেকে তিনবছরে যে সোনা রুপো নিয়ে গেছে তার পরিমাণ হল সাতলক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ড।'[১৭] এছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা চীনদেশে যে পণ্য বিশেষকরে আফিম নিয়ে যেত তার মূল্য কোম্পানির মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে চালান হয়ে যেত। বেঙ্কুলীন (সুমাত্রা) ও পেনাঙে ব্যবসার জন্যে বাংলা থেকে প্রতিবছর পাঁচলক্ষ টাকা যেত।

দেওয়ানি লাভের পর কলকাতা থেকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রতিবছর গড়ে পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ টাকা পাঠানো হত।[১৮] এর একাংশ যেত প্রশাসনিক ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে, অপরাংশ রপ্তানি পণ্য ক্রয়ে ব্যয় করা হত। কমিটি অব সিক্রেসির (১৭৭৩) হিসেব মত বাংলা থেকে অন্য দুটি প্রেসিডেন্সিতে ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ পর্যন্ত পণ্য, বিল ও সোনা রুপো মিলিয়ে মোট ২৩,৫৮,২৯৮ পাউণ্ড পাঠানো হয়েছিল।[১৯] সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানিকে মহীশূরের সঙ্গে চারবার (১৭৬৭-৯৯) এবং মারাঠাদের সঙ্গে একবার (প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১৭৭৫-১৭৮২) যুদ্ধ করতে হয়। কোম্পানি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্র ধরে (১৭৭৮ থেকে ১৭৮৩ পর্যন্ত) ফরাসি ও ওলন্দাজদের উপনিবেশগুলি পণ্ডিচেরি, মাহে, চুঁচুড়া এবং ফরাসি বিপ্লবী যুদ্ধের সূত্র ধরে শতাব্দীর শেষে এ্যাডমিরাল রায়নিয়ের (Rainier) নেতৃত্বে ওলন্দাজদের শ্রীলংকা, মালক্কা, বান্দা ও এ্যামবোইনা (Amboina) দখল করে নেয়। এ সব যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে কোম্পানির আর্থিক

১৬। এ, ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৫।
১৭। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৪৯ পাদটীকাসহ।
১৮। এ, ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৫।
১৯। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৪৯।

দায় দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে যায়। এদেশের বাজার থেকে চড়াসুদে ঋণসংগ্রহ করে যুদ্ধের খরচ মেটাতে হয়। ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ পর্যন্ত কোম্পানির বাংলাদেশে ঋণের পরিমাণ হল ১৩,৩৭,৭৩১ পাউণ্ড বা ১,৩৩,৭৭,৩১০ চালানি টাকা; ১৭৮৬ সনে ঋণের পরিমাণ ৩,৬২,০০,০০০ চালানি টাকা। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের পর ১৭৯২-এর জানুয়ারীতে এর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৫,৯০,৫৪,৩৪৪ চালানি টাকা।[২০] কোম্পানি যুদ্ধ খাতে মোটা টাকা খরচ করার ফলে বাংলাদেশ আর্থিক দিক দিয়ে দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। প্রথমত, কোম্পানি বেশ কিছু পরিমাণ টাকা বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে বাজারে সুদের হার বেড়ে যেত। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ খাতে এত বেশি ব্যয় করার জন্য আর্থিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় কোম্পানির পক্ষে টাকা ব্যয় করা সম্ভব হত না। এতে দেশের আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হত।

আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। থিয়োডর মরিসন তাঁর 'দি ইকনমিক ট্রানজিশন ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে আমদানি থেকে রপ্তানি বেশি হলে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয় এরকম ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। হোল্ডেন ফারবার শুধু বাংলাদেশের আর্থিক নিষ্ক্রমণ পরিমাপ করার অসুবিধা ও ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সাবধান করেছেন। মরিসন ও অন্যান্য অনেকে নিষ্ক্রমণ পরিমাপ কালে বিদেশের অদৃশ্য সেবা ও আমদানি (invisible services and imports) হিসেব করতে বলেছেন। এই অদৃশ্য সেবা বা আমদানি হল উন্নত ধরনের সেনাবাহিনী ও প্রশাসন, আর্থিক পরিচালন সংস্থাসমূহ—ব্যাঙ্কিং, বীমা, এজেন্সি হাউস, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পরিবহন, ইউরোপীয় প্রযুক্তি কৌশলের প্রয়োগ (জাহাজ নির্মাণ, রেশম ও চিনি শিল্প) ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এ দিকটিতে আরো বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।[২১] পি. জে. মার্শাল বেসরকারি খাতে আর্থিক নিষ্ক্রমণ আলোচনা প্রসঙ্গে পলাশী থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত বার্ষিক পাঁচলক্ষ পাউণ্ড আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিবর্তে বাংলার লাভের দিকটির উপর জোর দিয়েছেন।

প্রথমত, বাংলাদেশে কোম্পানির কর্মচারীরা ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি কোম্পানিগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করত বলে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এ পুঁজির সরবরাহ না থাকলে বিদেশী কোম্পানিগুলি বাংলার সঙ্গে ঐ পরিমাণ বাণিজ্য করত না এবং বাংলার রপ্তানি পণ্য সিল্ক, সুতীবস্ত্র, সোরা, আফিম ইত্যাদিতে চাহিদাও কমে যেত। এ সমস্ত পণ্যে বর্ধিত চাহিদার জন্যে বর্ধিত কাজের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এদেশের আরো বেশি লোক ঐ সমস্ত পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত করাও অসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানির উন্নত সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে মারাঠা ও অন্যান্য বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। ইউরোপীয়দের নেতৃত্বে উন্নত প্রশাসন ও

২০। এ. ত্রিপাঠী. ঐ পৃঃ ৫।

২১। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ২৬১-৬৩। তাঁর মতে ১৭৫৭ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে বার্ষিক আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ হল ৫,০০,০০০ পাউণ্ড বা ৫০,০০,০০০ টাকা।

নতুন ধরনের আর্থ পরিচালন সংস্থাও গড়ে উঠেছিল। এগুলি নিঃসন্দেহে এদেশীয় ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত ছিল।

তৃতীয়ত, ইউরোপীয়রা এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য পরিচালনা করত। ইউরোপীয়রা ধনবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও একটি নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতার নব্য ধনীসম্প্রদায়ের উৎপত্তি এভাবেই সম্ভব হয়।

চতুর্থত, দেশে পাঠানো টাকার একাংশ এদেশের বেসামরিক ও সামরিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হত। মার্শালের মতে বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছিল ঠিকই তবে তার প্রভাব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষতিকারক হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার মত যথেষ্ট পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। বরং এরকম আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল— বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্য, বর্ধিত উৎপাদন, অধিক কর্ম সংস্থান, নতুন ও উন্নত আর্থিক সংস্থাসমূহ, আধুনিক ও উন্নত প্রশাসন ও সেনাবাহিনী, ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞান এবং ইউরোপীয়দের এদেশীয় সহযোগীদের হাতে ধন সমাগম।

গ্রান্ট ও মার্শাল উভয়েই বাংলা থেকে মুঘল সম্রাটদের প্রাপ্য রাজস্ব (Imperial tribute) পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। মুর্শিদকুলি বার্ষিক এককোটি টাকা রাজস্ব বাংলার সিক্কা টাকায় দিল্লীতে পাঠাতেন। সুজাউদ্দিন বার্ষিক এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব হিসেবে পাঠাতেন। তাঁর বারো বছর রাজত্বকালে (১৭২৭-১৭৩৯) সুজাউদ্দিন মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা সম্রাটের রাজস্ব হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বলে গ্রান্ট হিসাব করেছেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুজাউদ্দিনের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত জগৎশেঠদের দিল্লী শাখার মাধ্যমে হুণ্ডিতে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো হত। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আলিবর্দি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দেন। রবার্ট ওরমের সাক্ষ্য থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব বাবদ মোট দুকোটি টাকা পেয়েছিলেন। গ্রান্টের মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাটদের উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্রাটদের প্রাপ্য রাজস্ব বাংলার উৎপন্ন পণ্যে গ্রহণ করত। তবে কোম্পানির গৃহীত রাজস্ব সম্রাটদের প্রাপ্য রাজস্ব থেকে অবশ্যই পরিমাণে অনেক বেশি হত।

কোম্পানির কর্মচারীদের চীনদেশে ব্যবসার জন্যে পাঠানো সোনারুপো ও আফিমের রপ্তানি বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত টাকা কোম্পানির বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো টাকার হিসেব বাদ দিয়ে যোগেশচন্দ্র সিংহ পলাশী থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণের যে হিসেব করেছেন তাতে দেখা যায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট চার খাতে [(১) বিদেশী কোম্পানির বিল (১৭৫৭-১৭৮০) ২·৪০,০০,০০০ পাউণ্ড (২) কোম্পানির উপর বিল (১৭৫৭-৬৫) ২০,০০,০০০ পাউণ্ড, (৩) চীনদেশে পাঠানো কোম্পানির সোনারুপো (১৭৫৭-৮০)

২৪,১০,০০০ পাউণ্ড, (৪) উদ্বৃত্ত রাজস্ব ও কোম্পানির উপর বিল থেকে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য ক্রয় (১৭৬৬-৮০) ১,০০০,০০০০ পাউণ্ড] ৩,৮৪,০০,০০০ পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডে চালান হয়ে যায়।[২২] ১৭৮৬ সনে জেম্‌স্ গ্রান্ট 'এ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গলে' ঐ বছরে তিনখাতে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ দিয়েছেন ১,৮০,০০,০০০ টাকা ((১) কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্য ১,০০০০,০০০ টাকা, (২) চীনদেশে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্যে যোগান ২০,০০,০০০ টাকা, (৩) অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি ও বণিকরা ৬০,০০,০০০ টাকা)। গ্রান্টের হিসেবে অন্যান্য প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো টাকার উল্লেখ নেই। হোল্ডেন ফারবার সারা ভারতের হিসেব উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ একই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে ১৭৮৩-৯৩ পর্যন্ত নিষ্ক্রমণের পরিমাণ হল ১৮,০০,০০০ পাউণ্ড। আগের দুই দশকে আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ আরো বেশি ছিল বলে ধরা যেতে পারে। কারণ ঐ সময়ে অভ্যন্তরীণ বেসরকারি ব্যবসা, উৎকোচ, উপহার, পারিতোষিক ইত্যাদি গ্রহণের ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে অভাবনীয় সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল।[২৩] কোম্পানির কাগজপত্রে ১৭৬৭ থেকে ১৭৯১ পর্যন্ত বাণিজ্য খাতে আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৩,৫৪,৩৩,৪৮৪ পাউণ্ড আর বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রতিবছের পাঠানো অর্থের পরিমাণ হল আড়াই লক্ষ পাউণ্ড।[২৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) পলাশী থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে প্রতিনিয়ত আর্থিক নিষ্ক্রমণ হত—তার পরিমাণ যাই হোক না কেন।

(২) যথেষ্ট পরিসংখ্যানের অভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণের সঠিক পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব নয় বলে অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন। এর একটা আনুমানিক হিসাব করা যায় মাত্র।

(৩) কোম্পানির সরকারি রপ্তানি বাণিজ্য, বিদেশী কোম্পানিগুলির বাণিজ্য, কোম্পানির কর্মচারীদের হীরা মণিমুক্তোর রপ্তানি বাণিজ্য, কোম্পানির জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের সুবিধাজনক ব্যবসা, চীনদেশে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বাণিজ্য, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য, স্বাধীন বণিকদের ইউরোপীয় বাণিজ্য ইত্যাদি মিলিয়ে বাংলা থেকে মোট আর্থিক নিষ্ক্রমণের একটি সম্ভাব্য হিসাব করা যেতে পারে। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের হিসেব অনুযায়ী বার্ষিক মোট এক কোটি ষাট লক্ষ টাকার পণ্য দেশের বাইরে যেত আর মাত্র নয় লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি করা হত।[২৫] রপ্তানি থেকে আমদানি

২২। জে. সি সিংহ, ঐ, পৃঃ ৫২।
২৩। এন কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।
২৪। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ২৫৬।
২৫। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

বাদ দিলে আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক এককোটি একান্ন লক্ষ টাকা। অন্ততঃ এভাবে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিবছর বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছিল বলে সমাজবিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেন।[২৬]

শতাব্দীব্যাপী আর্থিক নিষ্ক্রমণ বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রথমত বাংলার মুদ্রাসংকট। বাংলার সিক্কা টাকা প্রতিনিয়ত দেশের বাইরে চালান যাওয়াতে (বোম্বাই, মাদ্রাজ, চীন, সুমাত্রা মালয়, পেনাং, হায়দ্রাবাদ, কাশী, অযোধ্যা ইত্যাদি) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমে যেত। এর ফলে আর্থিক কাজকর্ম ও বাণিজ্যিক লেনদেনে নানারকম অসুবিধা দেখা দিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের মূলধন বাংলা থেকে সংগৃহীত হত বলে এরা আর বাংলাদেশে সোনা রুপো নিয়ে আসত না। বাংলায় এ দুই ধাতুর সরবরাহ কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমে যায়। এ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশকে মুদ্রা নীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের নানারকম ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বিরাট অংকের টাকা সোনা রুপো ও পণ্যের মাধ্যমে দেশ থেকে প্রতিবছর বেরিয়ে যাওয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে গতিহীনতা (stagnation) দেখা দেয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম আশানুরূপভাবে বাড়েনি। শতাব্দীর শেষ দিকে কোম্পানি ঋণপত্র বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতে থাকায় বাজারে সরবরাহযোগ্য বাণিজ্যিক মূলধনের সুদ বাড়ে এবং টাকার বাজারের উপর (money market) চাপ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলার রপ্তানি যোগ্য পণ্যের চাহিদা বেড়েছিল এরকম অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে এই বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্যের চাহিদা থেকে বাংলার উৎপাদক ও বণিকসমাজ লাভবান হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় উচিত হবে না। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানির নিজস্ব একচেটিয়া ব্যবসা, কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ঝোঁক, উৎপাদকদের উপর উৎপীড়ন, দালাল, পাইকার ও গোমস্তাদের অতিমুনাফার ঝোঁক অভ্যন্তরীণ বাজারে শান্তি ও স্বাধীনতা নষ্ট করেছিল। জেমস্ স্টুয়ার্টের মতে বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে এদেশ ধনশালী হয়নি।[২৭]

চতুর্থত, সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে এ সময়ে বাংলার লোকসংখ্যা, মোট উৎপাদন, আয় ব্যয়, মোট বাণিজ্যের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তার ফলে বাংলা থেকে বার্ষিক আর্থিক নিষ্ক্রমণ তার অর্থনীতির কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

২৬। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ২৫৫।
২৭। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃ. ৫৪

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কঠোর সমালোচক ব্রুকস্ এ্যাডামস্ মন্তব্য করেছেন যে ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্রিটিশ জাতি নিজেদের দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ভারত থেকে আর্থিক শোষণ পলাশী থেকে শুরু হয়েছিল বলে তিনি অষ্টাদশ শতকের শোষণ পর্বকে 'Plassey plunder' বলে অভিহিত করেছেন। এ্যাডামসের সংগৃহীত তথ্য খুব কম এবং যুক্তি খুব জোরালো নয়। পরবর্তীকালে তাঁর এই মন্তব্যকে ভিত্তি করে ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্‌রা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক বনিয়াদের উপর আঘাত হেনেছেন।[২৮] আর্থিক নিষ্ক্রমণের উপর কার্ল-মার্কসের অভিমত হল ভারত থেকে নিষ্ক্রান্ত সম্পদ ইংল্যান্ডে গিয়ে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[২৯] এ মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য। এ দেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত অর্থ বা পণ্যসম্ভার ইংল্যান্ডের একশ্রেণীর হাতে (বণিক, কর্মচারী, জাহাজ ব্যবসায়ী, শেয়ার মালিক) বাড়তি টাকা এনে দেয়। তারা এ টাকা আবার ব্যবসায়ে লগ্নী করে। তবে বাংলা বা ভারতের সম্পদ থেকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হয়েছিল এ মত পণ্ডিত মহলে গ্রাহ্য নয়।

২৮। এ. ত্রিপাঠী. ঐ, পৃঃ ২৫৫।
২৯। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।

# ১১

# মুদ্রা ব্যবস্থা

মুঘল আমলে সম্রাট আকবর সারা দেশে নিয়মিত মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেছিলেন।[১] ১৭০১ খ্রীঃ মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন তখন পাটনা ও রাজমহলে তিনটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৮-এর পর তিনি রাজমহলের টাঁকশাল নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার টাঁকশালে তিন রকমের মুদ্রা তৈরি হত—সোনা, রুপো ও তামা। সোনার টাকা মোহর নামে পরিচিত। মোহরের (ওজন ১৯০·৭৭৩ গ্রেন) সঙ্গে রুপোর সিক্কা[২] টাকার বিনিময় হার হল চোদ্দ বা ষোল সিক্কা টাকা। মোহর সাধারণত বাজারে লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হত না। এগুলি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব, উপঢৌকন, উপহার বা সঞ্চয়ের জন্য টঙ্কন করা হত। রুপোর টাকা সিক্কার ওজন হত ১৭২$\frac{১}{২}$ থেকে ১৭৫ গ্রেন এবং এতে ৯৮ থেকে ১০০ ভাগ খাঁটি রুপো থাকত। সিক্কা টাকা সরকারের স্বীকৃত বৈধ মুদ্রা এবং বাজারে লেনদেনে এ টাকা ব্যবহৃত হত। প্রধান তাম্রমুদ্রা 'দাম' ধনীদরিদ্র সকলের খুচরো বেচাকেনায় কাজে লাগত। চল্লিশ দামে একটাকা—বিনিময় হার ছিল। শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে তামার পয়সা দাম আস্তে আস্তে উঠে যায় এবং এর স্থান গ্রহণ করে কড়ি। মানুচ্চি জানিয়েছেন মালদ্বীপ থেকে বাংলায় প্রচুর কড়ি আসত এবং বাজারে খুচরো বেচাকেনায় কড়ি ছিল বৈধ মদ্রা। অনেক সময় কড়ির মাধ্যমে বড় বড় আর্থিক লেনদেনও হত। শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কড়ি বাংলাদেশে বৈধ মুদ্রা হিসাবে টিকে ছিল।[৩] টাকার সঙ্গে কড়ির বিনিময় হার প্রতি বত্রিশ পণে (কুড়ি গণ্ডায় একপণ) কড়ির একটাকা। একালে বাংলার টাঁকশালে টঙ্কন করা মুদ্রাগুলি সবই আসল টাকা—অর্থাৎ তাদের ধাতুমূল্য সরকারি স্বীকৃত মূল্যের সমান। এযুগে প্রতীক মুদ্রার (token currency) চলন ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বা বাংলাদেশে টাঁকশাল এবং মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না।[৪] বিভিন্ন টাঁকশাল ও বিভিন্ন বছরের মুদ্রার মধ্যে আকৃতি, ওজন ও বিশুদ্ধতায় সমতা থাকত না। মুদ্রার উপর ছাপ মারার পদ্ধতি ও পাশে খাঁজ কাটার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ তখন উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মুদ্রা সুগোল, পরিচ্ছন্ন বা চক্‌চকে হত না। এবং মুদ্রা ঘষে ঘষে বা তা

১। সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল, ১৭০৪-১৭৪০, পৃঃ ৯৬।

২। দ্রঃ পরিশিষ্ট (ক)।

৩। ১৭৯১ খ্রীঃ শ্রীহট্ট জেলার রাজস্ব কড়িতে জমা দেওয়া হয়।

৪। হরিশ চন্দ্র সিংহ, বাংলার ব্যাঙ্কিং, পৃঃ ৯-১০।

থেকে সামান্য কেটে সোনা, রুপো একটু বার করে নেওয়া খুবই সহজ ছিল।[৫] বেশির ভাগ মুদ্রা সহজেই নকল করা যেত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। দেশী বিদেশী বণিকদের বাংলার বাজার থেকে প্রচুর জিনিস কেনার ফলে সারা ভারতের বহু রকমের টাকা এখানে আসত। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) সারা ভারতে একাধিক স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীন রাজা বা সলতানরা সকলেই নিজ নিজ মুদ্রা চালু করেছিলেন, কারণ তাঁদের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিল নিজস্ব মুদ্রা। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ভারতের বাজারে কয়েক প্রকারের মুদ্রার আবির্ভাব। যদুনাথ সরকার লিখেছেন: '১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১৩৯ রকমের মোহর, ৬১ রকমের হুন অর্থাৎ দক্ষিণাপথের স্বর্ণমুদ্রা, ৫৫৬ রকমের টাকা এবং এছাড়া আরও ২১৪ রকমের বিদেশী মুদ্রা প্রচলিত ছিল।'[৬] বলা বাহুল্য এগুলি নানান মাপের, দামের ও ওজনের। আগেকার মুঘল সম্রাটদের বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও পরিমাপে সঠিক মুদ্রা বাজারে কম হয়ে গেল। শেষ দিককার মুঘল সম্রাটদের টাকাও ওজন ও আকৃতিতে ক্রমশ ছোট হতে থাকল।

মুঘল সম্রাটরা বিদেশী বণিকদের মুদ্রা তৈরির অধিকার দিয়েছিলেন। বিদেশী ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে (মাদ্রাজ, বোম্বাই, পণ্ডিচেরি ও নেগাপত্তম) নিজেদের টাঁকশালে মুঘলদের অনরূপ টাকা তৈরি করত। এগুলি ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ আর্কট নামে পরিচিত। আর্কটের নবাবের নিজস্ব আর্কট টাকা, সুরাট, কাশী, অযোধ্যা (ভিজিয়ারি) ও কুচবিহারের নারায়ণী টাকা বাংলার বাজারে পাওয়া যেত। শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বাজারে বত্রিশ রকম মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। শতাব্দীর শেষে কর্ণওয়ালিশের সময় বাংলার বাজারে সাতাশ রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এদের আকৃতি, ওজন, ধাতুগত বিশুদ্ধতা ও মূল্য বিভিন্ন রকমের। এযুগে আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের পর লাভের অংক বাংলার পক্ষে (favourable balance of trade) থাকত বলে আর্থিক লেনদেনের জন্য এগুলি বাংলায় আসত। ১৭৫০-এ ম্যাণ্ডেভিলে (Mandeville) কলকাতায় যে মুদ্রাগুলি দেখেছিলেন তার একটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছেন। এগুলি হল মুর্শিদাবাদ সিক্কা, সুরাট টাকা, মাদ্রাজ ও আর্কট টাকা এবং ইলি (Ely) বা পাটনা টাকা 'যদিও এদের সকলের ওজন দশমাসা (হওয়া উচিত) তবুও এদের আকৃতি ও সৌকর্যে পার্থক্য আছে। বাংলার সিক্কা সবচেয়ে ভাল......আর্কট সাধারণত খারাপ এবং ইলি টাকা আরো খারাপ।'[৭] ম্যাণ্ডেভিলের বিবরণে সোনাত টাকার উল্লেখ আছে। বাংলার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং

৫। ঐ, পৃঃ ১০।

৬। যদুনাথ সরকার, ইকনমিকস্ অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া (১৯১৭), পৃঃ ১৮৭-৮৮। হরিশ চন্দ্র সিংহের অনুবাদ।

৭। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

পরিবার জগৎশেঠরা বাংলায় প্রচলিত বহুরকম মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার বা বাট্টা ঠিক করত। শুধু তাই নয়, মুঘলদের বিভিন্ন টাঁকশালে ও বিভিন্ন বছরে মুদ্রিত টাকার মধ্যেও পার্থক্য থাকত। ঢাকা, পাটনা ও কটকে মুদ্রিত টাকা মুর্শিদাবাদ টাকার সমান বলে গণ্য হত না। এদের মধ্যেও বিনিময় হার ছিল। বাংলার অসংখ্য স্রফ ও পোদ্দার মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। গোটা শতাব্দীতে মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল বলে জগৎশেঠ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকে এ ব্যবসা করত।

**চালানি টাকা ঃ** এযুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল চালানি টাকা। কাল্পনিক চালানি টাকা কোনো টাকা নয়—সেজন্য স্থির, অচঞ্চল এবং এর মাধ্যমে অন্য সমস্ত টাকার বিনিময় হার ঠিক হত। সমস্তরকম ব্যবসায়ী কাজকর্ম লেনদেনের হিসাব হত এ টাকাতে যার ক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই। ১৭৪০-এ সিক্কা, মাদ্রাজ ও আর্কট টাকার সঙ্গে চালানির বিনিময় বাট্টা যথাক্রমে ১৫½, ১০ ও ৮ শতাংশ।[8] অর্থাৎ ১০০ সিক্কা সমান ১১৫½ চালানি টাকা। আরো একটি আর্থিক কারণে এরকম একটি কোম্পানির মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল। এযুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার এক বৈশিষ্ট্য হল প্রতি তিন বছরে সিক্কা টাকা পুনরায় টঙ্কন করার ব্যবস্থা (triennial recoinage)। টাঁকশাল থেকে বেরুনোর পর সিক্কা টাকা এক বছর পূর্ণদামে বাজারে চালু থাকত। অর্থাৎ প্রথম বছরে ১০০ সিক্কার দাম ১১৬ চালানি টাকা। দ্বিতীয় বছরে ১০০ সিক্কার দাম তিন শতাংশ কমে হত ১১৩ চালানি টাকা। তৃতীয় বছরে ১০০ সিক্কা আরো দু শতাংশ কমে ১১১ চালানি টাকায় দাঁড়াত। তখন এর নাম হত সোনাত।[9] তৃতীয় বছরের শেষে সোনাত আর বৈধ মুদ্রা থাকত না, কারণ সমস্ত সরকারি লেনদেনে সিক্কা একমাত্র বৈধ মুদ্রা। সুপরিকল্পিতভাবে সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সিক্কার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে একে বাজারে একমাত্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালু রাখা। সোনাত বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃতি পেলে এ মুদ্রা বাজারে আধিপত্য পেত আর সিক্কা কোণঠাসা হয়ে পড়ত। সিক্কার প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যে তিন বছর পর সোনাত সিক্কায় রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা ছিল। এরকম মুদ্রা ব্যবস্থায় সরকারি টাঁকশালের আয়ও ঠিক থাকে। সোনাতের দাম কম বলে ব্যবসায়ীরা এগুলি পুনরায় টঙ্কনের জন্য টাঁকশালে নিয়ে যেত। দু শতাংশ টাঁকশাল কর দিয়েও স্রফ (shroff) ও পোদ্দাররা সোনাতকে সিক্কায় পরিণত করে দু শতাংশ লাভ করত।

প্রাক্-পলাশী যুগে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের টাঁকশালের টঙ্কনের অধিকার লাভের জন্যে মুঘল সম্রাট ও বাংলার নবাবদের কাছে আবেদন করেছিল। বাংলার নবাবরা এ আবেদনে সাড়া দেননি। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে

৮। কনসালেটশন, ৫ ডিসেম্বর ১৭৪০।
৯। দ্রঃ পরিশিষ্ট (ক)।

মুর্শিদকুলির টাঁকশাল কর্মচারী রঘুনন্দন মারা গেলে জগৎশেঠের পরিবার বাংলার টাঁকশাল ও মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পায় এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। এ সময়ে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে যে সোনা রুপো আসত জগৎশেঠ পরিবার ছিল তার একচেটিয়া ক্রেতা। অন্য কোন ব্যবসায়ী বা মহাজন এসময়ে একটাকার সোনারুপোও কিনতে পারত না। বত্রিশ রকম বিদেশী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় বাট্টাও তারাই ঠিক করে দিত। বিনিময় ব্যবসা থেকে এ পরিবার যথেষ্ট রোজগার করল। ল্যুক স্ক্র্যাফ্টনের হিসাব মত বছরের এর পরিমাণ হল সাত থেকে আট লাখ টাকা। এযুগের বাংলাদেশের বাজারে এত বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চালু থাকা সত্ত্বেও বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অরাজকতা দেখা দেয়নি। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিবার জগৎশেঠদের প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য। টাঁকশাল, টাকা ও সোনারুপোর বাজারের উপর এ পরিবারের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। এ আধিপত্য রক্ষায় বাংলার নবাবরা তাঁদের সাহায্য করতেন।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট ফারুখসিয়ারের কাছ থেকে বাংলার টাঁকশাল সপ্তাহে তিন দিন প্রচলিত মাশুল দিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছিল।[১০] বাদশাহী ফারমানে ইংরাজদের মাদ্রাজ টাকার উপর বাট্টা ধার্য না করার আদেশ ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদের বিরোধিতায় এ সুবিধা ও অধিকার কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের রাজধানী দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে বাংলায় মাদ্রাজ ও চালানি টাকার মধ্যে বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় (১৭০৯-এর আগে ছিল ১০০ মাদ্রাজ টাকা সমান ১০৯ চালানি টাকা; ১৭০৯ থেকে ১০০ মাদ্রাজ টাকা সমান ১০৭ চালানি টাকা।[১১] ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কোম্পানি বাংলায় রুপো এনে জগৎশেঠদের কাছে বিক্রি করে বাণিজ্যিক মূলধন সংগ্রহ করত। তাতে ডলার (৮৯½ আউন্স) রুপোর ২৪০ সিক্কা ওজনের জন্য তারা পেত ২০১ থেকে ২০৬¼ চালানি টাকা। অথচ মাদ্রাজে ঐ পরিমাণ রুপোর বিনিময়ে ২১৮ মাদ্রাজ টাকা এবং বাংলার টাঁকশালে টঙ্কন করলে টাঁকশাল কর ও বাট্টা দিয়ে ২৩৩ চালানি টাকা পেতে পারত। জগৎশেঠদের বাধাদানের ফলে তা সম্ভব হল না। ইংরেজরা রুপো আনা অনেক কমিয়ে দিয়ে বেশি করে মাদ্রাজ টাকা বাংলার বাজারে আনতে শুরু করল। এতে নবাব সুজাউদ্দিনের সময় বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় দুরকমের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।[১২] টাঁকশালের রাজস্ব কমে গেল এবং রুপোর অভাবে সিক্কা টাকা তৈরি করার অসুবিধা হল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন এ সমস্যা সমাধানের

১০। সুকুমার ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ১০৪।

১১। ভারতের রাজধানী যতদিন দক্ষিণ ভারতে ছিল আর্কট টাকা বাংলার রাজস্ব পাঠাবার জন্য গ্রহণ করা হত। ১৭০৯-এর পর রাজধানী দিল্লীতে চলে আসায় আর্কট টাকার রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়।

১২। সুকুমার ভট্টাচার্য, ঐ. পৃঃ ১০৬ ; কনসালটেশন, ১৭ অক্টোবর ১৭৩১।

জন্য দুটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলার বাইরের সমস্ত বিদেশী টাকা তিনি অবৈধ ঘোষণা করলেন। শুধু এদের ধাতুগত মূল্য স্বীকার করা হল। দ্বিতীয়ত, সিক্কা টাকা ও আর্কট ও মাদ্রাজ টাকার মধ্যে বিনিময় বাট্টা বাড়িয়ে করলেন ৭৪ শতাংশ।[১৩] আগে এ বাট্টার হার ছিল ৩½ থেকে ৪½ শতাংশ যদিও তাদের মধ্যে ধাতুগত মূল্যে পার্থক্য মাত্র ০·৫৬ শতাংশ। জমিদারদের নির্দেশ দিলেন যেন অন্য কোনো বিনিময় হারে মাদ্রাজ বা আর্কট টাকা গ্রহণ না করা হয়। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার ডেপুটি দেওয়ান আলমচাঁদ ইংরেজদের গত পাঁচ বছরে বাংলায় আনা সোনা রুপোর হিসেব দাখিল করতে বললেন। ইংরেজরা এ হিসেব দাখিল করতে বাধ্য হয়েছিল। নতুন বিনিময় হারে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা আর্থিক অসুবিধায় পড়ল। বাংলার ব্যবসায়ী ও মহাজনরা মাদ্রাজ টাকা নিতে অস্বীকার করায় এর দাম আরো নেমে গেল। ইংরেজরা আবার বেশি পরিমাণে সোনারুপো বাংলায় আনতে বাধ্য হল কারণ নতুন বিনিময় হারে মাদ্রাজ বা আর্কট টাকা এনে লাভ নেই।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসায়ের জন্যে মূলধন হিসেবে যে সোনারুপো নিয়ে আসত তা এদেশীয় টাকায় রূপান্তরিত করার তিনটি পথ তাদের সামনে খোলা ছিল।[১৪] প্রথমত, সোনারুপো এদেশীয় টাঁকশালে দিয়ে মূলধনে পরিণত করা। এপথে একটি প্রধান অন্তরায় হল বাংলার নবাবদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হলে বা কোনো কারণে সংঘর্ষ বাধলে তাদের মূলধন নবাবদের হাতে আটক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া টাকা মুদ্রণের জন্যে অনেক সময় লাগে এবং সেকারণে প্রয়োজনমত টাকার যোগান পাওয়ার ব্যাপারে খানিকটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এযুগে বাংলার নবাবরা এবং টাঁকশাল ও মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ামক জগৎশেঠ পরিবার এ বিভাগে বিদেশী অনুপ্রবেশ পছন্দ করতেন না। এদেশী বণিকরা টাঁকশাল-কর দিয়ে টঙ্কনের অধিকার ভোগ করত অথচ ইংরাজদের এ অধিকার দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, সোনারুপো বাংলায় এনে জগৎশেঠ পরিবারের কাছে তাদের নির্ধারিত দামে বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করা। এটা অনেক সহজ পথ তবে বিনিময় হার নির্ধারণ এদেশীয় ব্যাঙ্কারদের হাতে থাকায় ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। তৃতীয়ত, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের টাঁকশালে মুদ্রিত টাকা মূলধন হিসেবে বাংলাদেশে আনা। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা হল মাদ্রাজ ও এদেশের চালানি টাকার মধ্যে বিনিময় হার এদেশীয় ব্যাঙ্কাররা নিয়ন্ত্রণ করত। ১৭০১ থেকে তৃতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা দ্বৈত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল—অর্থাৎ সোনারূপা ও মাদ্রাজ টাকা বাংলাদেশে মূলধন হিসাবে আনত। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে তারা সোনারুপো আনা কমিয়ে মাদ্রাজ টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তাতে

১৩। সুকুমার ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ১০৯।

১৪। কে. এন চৌধুরী, দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া এ্যান্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, পৃঃ ১৮২-১৮৯।

সুজাউদ্দিন সরকারের সঙ্গে বিরোধ। ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবার দ্বৈত পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) বাংলায় নবাবরা টাঁকশালে যে হারে টাকা তৈরি হত তার আকৃতি, বিশুদ্ধতা, ওজন ও সৌকর্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। এযুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তৈরি টাকার গুণগতমান, আকৃতি, ওজন অপেক্ষাকৃত নীচু মানের। বাংলার মুদ্রাগুলি তুলনামূলকভাবে ভাল। (খ) বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বাট্টার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় বাংলার এদেশী ও বিদেশী বণিকরা নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়ত। বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যের জন্য তাদের বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রয়োজন হত এবং এজন্যে উচ্চহারে বাট্টা দিতে হত। বাট্টা ব্যবসায়ে লাভবান হত স্রফ ও পোদ্দাররা আর ক্ষতিগ্রস্ত হত বাংলার নিরক্ষর কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও কারিগর। টাকার উপর কোন্ বছরের ছাপ আছে এদের অধিকাংশই তা পড়তে পারত না অথচ মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় মুদ্রার উপর মুদ্রিত বছরের ছাপটিই আসল। এর উপর বিনিময় হত। বাংলার মহাজন, বানিয়া, ব্যাঙ্কার, স্রফ ও পোদ্দাররা এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করত। (গ) শতাব্দীর প্রথম দিকে মুদ্রার সাময়িক দুষ্প্রাপ্যতা। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার নবাবরা বাংলার নিজস্ব সিক্কা টাকায় সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠাতেন। এর বার্ষিক গড় পরিমাণ হল এক কোটি টাকা। সম্রাটের রাজস্ব পাঠানোর পর পর বাংলার বাজারে মুদ্রার অভাব দেখা দিত এবং ঐ সময় আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হত। বিদেশী জাহাজ সোনা রূপো নিয়ে এলে বাজারে টাকার সরবরাহ আবার নিয়মিত হত এবং পুরোমাত্রায় আর্থিক লেনদেনের কাজ শুরু করা যেত।[১৫]

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা পুনরায় বাদশাহী ফারমান সংগ্রহ করে বাংলায় টাঁকশাল স্থাপনের চেষ্টা করে। জগৎশেঠদের ভয়ে এবার তারা অত্যন্ত গোপনে তৎপর হয়। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি; টাঁকশাল স্থাপনের অধিকার তারা পায়নি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর আলিনগরের সন্ধিতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরাজদের কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি চন্দননগরে ফরাসিদেরও নবাবের নামে টাকা মুদ্রণের অধিকার দেন। ঐ বছর ১৯শে আগস্ট কলকাতার টাঁকশাল থেকে প্রথম টাকা মুদ্রিত হয়। কলকাতাকে নিয়ে বাংলার টাঁকশালের সংখ্যা দাঁড়ালো চার—ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা। সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে আলিনগরের চুক্তিতে কলকাতার সিক্কা টাকার উপর বাট্টা ধার্য না করার শর্ত ছিল। ১৭৬৩তে নবাব মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের যে নতুন চুক্তি হয় তাতেও এ শর্ত পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেও কলকাতার টাঁকশাল ইংরাজদের খুব কাজে লাগেনি কারণ ঐ সময়ে ইউরোপ

১৫। ম্যান্ডেভিলের চিঠি, ২৭ নভেম্বর, ১৭৫০। জেমস্ স্টুয়ার্ট, প্রিন্সিপলস্ অব মানি এপ্লায়েড টু দি প্রেজেন্ট স্টেট অব দি কয়েন ইন বেঙ্গল, ১৭৭২, পৃঃ ৬৩।

থেকে বাংলাদেশে সোনা রুপো আমদানি ক্রমশ কমতে থাকে এবং বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় জগৎশেঠদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকার দরুন কলকাতার টাকা মুর্শিদাবাদের টাকা অপেক্ষা বাজার দামে কম হয়ে রইল।[১৬] ১৭৬৫র ২০ ফেব্রুয়ারী নাজমুদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদের যে চুক্তি হয় তাতে বাংলাদেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার ও বাট্টা সমস্যার সমাধানে নতুন নবাব ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতায় রাজী হন।

**সংকট:** পলাশী-পরবর্তীকালে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় যে সঙ্কট দেখা দেয় তার (ক) অন্যতম কারণ হল সোনা রুপো বিশেষ করে রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা। প্রাক্-পলাশীযুগে ইংরাজদের বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের ৭৪ শতাংশ হল সোনারুপো পলাশী থেকে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে সোনা রুপো আনা প্রায় বন্ধ করে দেয়। বছরে বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে ৭৮,০০০,০০ টাকার সোনারুপো আসত।[১৭] পলাশীর পর নানাভাবে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে প্রচুর টাকা জমা হতে থাকল আর কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর এদেশে ব্যবসা করার জন্যে উদ্বৃত্ত রাজস্বের অধিকারী হল। লোহিত ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে প্রতিবছর যে পঁচিশ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার সোনা রুপো আসত তাও বন্ধ হয়ে যায়। (খ) অপরদিকে নানাভাবে বাংলা থেকে সোনারুপো বেরিয়ে যেতে থাকে : (১) সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব (১৭৬৫-৭২) প্রায় দু কোটি টাকা, (২) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জন্য আর্থিক অনুদান, (৩) চীন, পেনাং ও বেঙ্কুলীনের ব্যবসার মূলধন, (৪) বাংলা থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে (আনুমানিক হিসাব পাঁচ কোটি টাকা) মীরকাশিমের পলায়ন (১৭৬৩)। একটি আনুমানিক হিসেবে দেখা যায় ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ পর্যন্ত (মীরকাশিমের টাকা বাদে) বাংলাদেশে সোনারুপোর আমদানি ঘাটতি ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাংলার মোট ক্ষতির পরিমাণ আট কোটি টাকা।[১৮] বাংলার বাজারে মুদ্রা সরবরাহের ঘাটতি পলাশী-পরবর্তীকালে আর্থিক লেনদেনে ও বাণিজ্যিক কাজকর্মে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

**প্রতিকার:** ১। **দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থা** -১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এ সমস্যা সমাধান করার জন্যে ক্লাইভ (ক) একইসঙ্গে রুপোর সিক্কা টাকা ও সোনার মোহর বাজারে বৈধ মুদ্রা হিসাবে প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিলেন (bimetallism)। তিনি ১৬ আনা ওজনের মোহর এবং সেই সঙ্গে আধা, সিকি ও দুআনি মোহর তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে এগুলি বাজারে ছোটখাট লেনদেনে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কার মোহরে ১৪৯.৭২ গ্রেন খাঁটি সোনা এবং সিক্কা টাকায় ১৭৫.৯২ গ্রেন খাঁটি রুপো রাখার ব্যবস্থা ছিল। এদের মধ্যে বিনিময় হার হল ১৪ সিক্কা টাকা সমান এক মোহর। ক্লাইভ প্রবর্তিত ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হল সোনার বাজার মূল্যের চেয়ে মোহরের দাম ১৭½ শতাংশ বেশি ধার্য করা হয় (overvaluation of gold

১৬। এন, কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২।
১৭। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ৫৫।
১৮। ঐ, পৃঃ ৫৬।

currency)। ১৭৬৯-এ গভর্ণর ভেরেলস্টের সময় (১৭৬৭-৬৯) সোনার মোহর যখন আবার বাজারে ছাড়া হয় তখনও মোহরের দাম সোনার বাজার দাম অপেক্ষা বেশি করে ধার্য করা হয়। নতুন মোহর হল ১৭ আনার সমান অর্থাৎ ১৯০'৭৭৩ গ্রেন এবং এতে খাঁটি সোনার পরিমাণ ১৯০:০৮৬ গ্রেন। মোহরের দাম ধার্য করা হল ১৬ সিক্কা টাকা। আধা, সিকি, দু আনি ও এক আনি মোহর চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। মোহরের দাম এক্ষেত্রেও সোনার বাজার দামের চেয়েও ৫'৭১ শতাংশ বেশি হল। ১৭৬৯-এর দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থাও সাফল্য লাভ করেনি। ডিরেক্টর সভা বাংলাদেশে হঠাৎ করে সোনার দাম বৃদ্ধিতে কেম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত মুনাফা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন।[১৯] ক্লাইভ ও ভেরেলস্টের দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থায় সিক্কার চাহিদা স্বাভাবিক বাড়তে থাকে এবং মোহরের উপর বিনিময় বাট্টা ধার্য হয়। অর্থাৎ এক মোহরের বিনিময়ে সরকার স্বীকৃত ১৪ বা ১৬ সিক্কা টাকা পাওয়া যেত না। ১৭৬৮ সনের মধ্যে মোহরের উপর ধার্য বাট্টার হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৩৮ শতাংশ। এজন্য বাণিজ্যিক লেনদেনে অসুবিধা হত।

(খ) ১৭৬৮র ১১ নভেম্বর ডিরেক্টর সভা সোনাত টাকার উপর ধার্য বাট্টা তুলে দেওয়ার আদেশ দেয়। ১৭৭১-এর ১০ এপ্রিল সিক্কা টাকা স্থিতিশীল করার জন্যে পুনরায় আদেশ পাঠানো হয়।

(গ) এসময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রায় বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেন হত। সত্তরের দশকের প্রথম থেকে হুগলী ও নদীয়া জেলার বাজারে লেনদেনের মাধ্যম হল সিক্কা টাকা, বীরভূম, মালদা ও মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদ সোনাত, পূর্ণিয়াতে পাটনা সোনাত, ময়মনসিংহ ও রংপুরে ফরাসি আর্কট। ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব সংগৃহীত হত কুচবিহারের নারায়ণী টাকায়। ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলন ছিল ইংরাজ ও ফরাসি আর্কট এবং ঢাকার সিক্কা টাকা। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে (পাচেট) কাশী ও অযোধ্যার ভিজিয়ারি মুদ্রার চলন ছিল। আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এযুগে এক একটি জেলায় একাধিক মুদ্রার চলন ছাড়াও এক একটি পণ্যের বেচাকেনায় একটি বিশেষ মুদ্রার ব্যবহার ছিল। দিনাজপুর জেলায় চাল ও অনান্য খাদ্যশস্যের বেচকেনায় সোনাত এবং ঘি, তেল, চিনি, শণ ও চটের জন্য ইংরাজ ও ফরাসি আর্কটের চলন ছিল। রংপুরে চাল ও খাদ্যশস্যে সিক্কা, চিনির জন্যে মুর্শিদাবাদ সোনাত আর বস্ত্র, লবণ ও সুপারির জন্যে ফরাসি আর্কট চলত। যশোর জেলায় সিক্কায় চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, সুপারি, চিনি, চুন ও নারিকেল বেচাকেনা হত; কাপড়, ঘি, তেল, লম্বা লংকা, হলুদ মুর্শিদাবাদ সোনাতে আর ফরাসি আর্কটে লবণ কেনা যেত। মালদা ও রাজশাহীতে শস্য, বাঁশ, ঘি, তেল ও চিনি পাওয়া যেত সিক্কায়; কাপড়, পিতল ও অন্যান্য ধাতু ও ধাতবদ্রব্য দশমাসা টাকায়।[২০] বাংলার সর্বত্র

১৯। লেটার ফ্রম কোর্ট. ১৬ মার্চ ১৭৬৮।
২০। দশমাসা টাকার অর্থ হল প্রায় ১৫০ গ্রেন বিশিষ্ট রুপোর টাকা।

এ চিত্র।[২১] আকৃতি, ওজন, বিশুদ্ধতা ও সৌকর্যে পার্থক্যসহ বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা বাংলার জনগণের প্রক্ষে নানারকম অসুবিধা ও দুর্দশার কারণ হয়। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং কোম্পানির রাজস্ব আদায় ও রপ্তানি পণ্য কেনায় (investment) অসুবিধার সৃষ্টি করে।

সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে বাট্টা ও বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় বাট্টার প্রশ্ন নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে জোর বিতর্ক শুরু হয়। কলকাতার মিন্ট মাস্টার আলেকজাণ্ডার ক্যাম্বেল (Alexander Campbell) এবং কোম্পানির নায়েব দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁ সারা বাংলাদেশের চারটি টাঁকশাল থেকে একই মুদ্রা চালু করার বিপক্ষে মত দেন।[২২] ডিরেক্টর সভা তাদের অভিমত অগ্রাহ্য করে সারা বাংলাদেশের জন্যে একটি স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় মুদ্রা ব্যবস্থা (a stable uniform currency) চালু করার নির্দেশ পাঠালেন। কলকাতা কাউন্সিল ১৭৭১-এর ২৬ আগস্ট সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে পার্থক্য তুলে দিয়ে আদেশ জারি করলেন। তবে সোনাত সিক্কায় রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা হল না বা ভবিষ্যতের সব সিক্কায় একই তারিখ দেওয়া হল না। ফলে সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে ব্যবধান ঘোচান যায়নি। অপর দিকে কোর্ট রাজস্ব আদায়ে ক্ষতির সম্ভাবনায় এ ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাঠায়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশে গভর্ণর হয়ে আসার আগে একটি স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি।

২। হেস্টিংস গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করে (১৭৭২) মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের দিকে নজর দিলেন। প্রথম দিকে তিনি যে ব্যবস্থা চালু করলেন তার দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল (১) বাংলাদেশে একটিমাত্র টাঁকশাল রেখে বাকী তিনটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল চারটি টাঁকশাল থেকে একই আকৃতি, ওজন ও বিশুদ্ধতায় মুদ্রা তৈরি করা সম্ভব না। একটি মাত্র মুদ্রা প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৭৩-এর অক্টোবরে ঢাকা ও পাটনা টাঁকশাল এবং ১৭৭৭-এর এপ্রিল মাসে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল বন্ধ করে দেন। (২) মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় বাট্টা প্রশ্ন সমাধানের জন্যে তিনি সিক্কা টাকায় স্থায়ীভাবে একটিমাত্র রাজত্ববর্ষ (১৯ সূর্য সিক্কা)[২৩] ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যাতে মুদ্রার উপর অঙ্কিত বছর দেখে স্রফরা সিক্কার বয়স নির্ধারণ করতে না পারে।

হেস্টিংসের উক্ত মুদ্রা সংস্কার পরিকল্পনায় কতকগুলি ত্রুটি থাকায় বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্কট কাটলো না। প্রথমত, একটিমাত্র টাঁকশালে সিক্কা তৈরি হওয়ায় বাজারে সিক্কার যোগান কম হল। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলাগুলিতে সিক্কা প্রায় দুষ্প্রাপ্য হল। সিক্কা ও অন্যান্য টাকার মধ্যে বিনিময় বাট্টার হার বেড়ে দাঁড়ালো ১৭½ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সিক্কায় রাজস্ব দিতে হত; স্রফরা সিক্কা কিনে

২১। অতিরিক্ত বিবরণের জন্যে দ্রঃ জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ১১৩ ১১৫।
২২। ঐ, পৃঃ ১১৭-১১৮।
২৩। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের রাজত্বকালের ১৯ বর্ষ। ১৭৫৯-১৮০৬ তাঁর রাজত্বকাল।

মজুত করে রাজস্ব দেওয়ার সময় জমিদারদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতে শুরু করে দেয়। তৃতীয়ত, ১৯ বর্ষ সিক্কা টাকায় সঠিক হিজরি সন থাকায় স্রফরা কোন্ বছরের সিক্কা তা সহজেই ধরে ফেলল; হেস্টিংসের উদ্দেশ্য সাধিত হল না। চতুর্থত, সরকার সিক্কা ও অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে বাট্টা তালিকা ঠিক করে দেওয়া সত্ত্বেও চাহিদা ও সরবরাহ নিয়মের উপর নির্ভর করে বাট্টা হারের উঠানামা চলল। সরকার এ হার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলেন।

১৭৭৪-এর ৩০শে মার্চের চিঠিতে ডিরেক্টর সভা বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। স্যার জেমস্ স্টুয়ার্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের অনুরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে বাংলাদেশে কাগজী মুদ্রা (Paper Currency) চালু করার পরামর্শ দিলেন।[২৪] ফিলিপ ফ্রান্সিস সারাদেশের জন্যে একটি টাঁকশাল থেকে একটিমাত্র বৈধ রৌপ্যমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর প্রস্তাবে বাংলায় প্রচলিত অন্য সমস্ত মুদ্রাকে শুধু ধাতু হিসাবে গণ্য করার সুপারিশ ছিল। হেস্টিংস তাঁর অন্যান্য সহকর্মী ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে ১৭৭৭-এর ২৯ মে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ জারি করলেন। সংক্ষেপে তাঁর নির্দেশগুলি হয়ঃ (১) শুধু কলকাতার টাঁকশাল থেকে তিন প্রদেশের জন্য মুদ্রা তৈরি হবে, (২) বর্তমান মানের সিক্কা কলকাতার টাঁকশালে মুদ্রণ করা হবে, (৩) নতুন সোনার মোহর আর মুদ্রণ করা হবে না, তবে পুরাতন মোহর বৈধ মুদ্রা হিসেবে চলবে, (৪) এখনকার সিক্কা টাকা বাট্টা ছাড়া চিরকাল চালু থাকবে, (৫) বেসরকারি রূপো নামমাত্র মাশুল নিয়ে মুদ্রণ করা হবে। হেস্টিংসের গৃহীত ব্যবস্থা বহু মুদ্রার জটিলতা ও বিনিময় বাট্টার হাত থেকে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারেনি। এজন্য দরকার ছিল প্রথমত ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রচলিত সমস্তরকম মুদ্রার পুনর্মুদ্রণ (recoinage)। একাজে খরচ পড়ত প্রচুর। শুধু খরচের ভয়ে সরকার ওপথ পরিহার করলেন। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি মুদ্রণ মাশুলের হার খানিকটা কমানো সত্ত্বেও বেশ উঁচু রয়ে গেল। তাছাড়া, পুনর্মুদ্রণের জন্য কলকাতায় মুদ্রা বা সোনা রূপো পাঠানোর যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। সুদূর মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় টাকা পাঠাতে গেলে বেশ খানিকটা ঝুঁকি নিতে হয়। তৃতীয়ত, নতুন ব্যবস্থায় কলকাতা থেকে মুদ্রিত সিক্কা টাকা সারা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। ফলে আগেকার সিক্কা, সোনাত, আর্কট ইত্যাদি বাংলার বাজারে রয়ে গেল। সরকারি সিক্কার পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় স্বয়ং হেস্টিংস ১৭৮০ সনে আবার মোহর মুদ্রণের আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাংলার শহর, জেলা ও গ্রামে খুচরো বেচাকেনায় অসবিধা দেখা দেওয়ায় সরকার তামার খুচরো পয়সা চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৮১ সনের ২৪শে

২৪। জে সি সিংহ, ঐ, পৃঃ ১২৬।

সেপ্টেম্বর মিঃ প্রিন্সেপকে চার প্রকার তামার পয়সা সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়। টাকা ও কড়ির সঙ্গে তামার পয়সার বিনিময় হার ছিল নিম্নরূপ।[২৫]

১ সিক্কা সমান ৩২ মাদোসি (Madosie) ১ মাদোসি সমান ১৬০ কড়ি
(দু পয়সা)

১ „ „ ৬৪ ফালুস (Faloos) ১ ফালুস সমান ৮০ „
(এক পয়সা)

১ „ „ ১২৮ নীম ফালুস (Neem Faloos) ১ নীম ফালুস „ ৪০ „
(আধা পয়সা)

১ „ „ ২৫৬ পাউ ফালুস (Pau Faloos) ১ পাউ ফালুস „ ২০ „
(সিকি পয়সা)

সরকারি লেনদেনে এক হাজার টাকায় দশ টাকার তামার পয়সা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে জনসাধারণ সরকারি তামার পয়সা গ্রহণ করল না। খুচরো বেচা-কেনায় আগের মত কড়ির ব্যবহার চালু রইল। তামার পয়সার দাম ধাতু মূল্যের চেয়ে বেশি ধার্য করার ফলে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারকল্পে হেস্টিংস এদেশে কাগজী মুদ্রা চালু করার কথা চিন্তা করেছিলেন। তবে তাঁর এ পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেনি। ১৭৭৩ সনের এপ্রিল মাসে হেস্টিংস সরকারি রাজস্ব আদায়, রপ্তানি পণ্য ক্রয় ও এদেশীয় বণিকদের মূলধনের লেনদেনে সহায়তা করার জন্যে সরকারের অধীনে 'জেনারেল ব্যাঙ্ক' চালু করে দেন। হুজুরি মল ও দয়াল চাঁদ এর ম্যানেজার হন এবং জেলায় জেলায় এর শাখা খোলা হয়। সরকারি রাজস্ব গ্রহণ ও কলকাতায় পাঠানো এবং বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে কমিশন নিয়ে জেলার আরঙে মূলধন সরবরাহ করার কাজ এ ব্যাঙ্ক কিছুদিন করেছিল। ডিরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়াতে ১৭৭৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়।

৩। কর্ণওয়ালিশের সময়ে (১৭৮৬-৯৩) মুদ্রা ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাটি হল সোনার মোহরের উপর বাট্টা। অর্থাৎ সোনার মোহরের বিনিময়ে সিক্কা টাকা নিতে হলে বিনিময় বাট্টা দিতে হত। ১৭৮৭র আগস্ট মাসে বিনিময় বাট্টা বেড়ে হল ৩ শতাংশ। ঐ বছর ২৫শে সেপ্টেম্বরে কর্ণওয়ালিশ রুপোর টাকা সিক্কার দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্যে কারেন্সি কমিটি নিয়োগ করলেন। কলকাতায় সিক্কা টাকার স্বল্পতা সম্পর্কে কমিটির অভিমত হল (১) জেলাগুলিতে সিক্কা টাকার বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ, (২) গত তিরিশ বছরে ইউরোপ থেকে কম সোনা ও রুপোর আমদানি (৩) বাংলা থেকে অন্যান্য প্রেসিডেন্সি ও চীনে রুপোর রপ্তানি এবং (৪) রুপোর টাকার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে সোনার মোহরের বেশি দাম ধার্য করা। বাংলায় মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কারেন্সি কমিটির পাঁচটি সুপারিশ হল: (১) সমস্ত রুপোর টাকা আট আনি ও চার আনিসহ উন্নতমানে তৈরি বাজারে ছাড়া,

২৫। জে. সি. সিংহ. ঐ, পৃঃ ১৪৪।

(২) সোনার মোহর আট আনি, চার আনি ও দু আনিসহ উন্নত মানের করা, (৩) সুফরা মোহর ও সিক্কার মধ্যে সরকারি বিনিময় হার ১৬ টাকার বেশী নিলে শাস্তির ব্যবস্থা করা, (৪) বেসরকারি মুদ্রণের জন্য কোনো শুল্ক না নেওয়া, (৫) সোনা ও রুপোর টাকার মধ্যে বিনিময় হার তাদের ধাতুগত মূল্যের বাজার দরের সমান হওয়া উচিত।[২৬]

মোহরের উপর বাট্টা সমস্যা কর্ণওয়ালিশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। ১৭৮৮র ১৬ এপ্রিল কলকাতার ব্যবসায়ীরা বাট্টা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে গভর্ণর জেনারেলের কাছে আবেদন করেছিল। এসময় মোহর সিক্কায় রূপান্তরিত করতে হলে ৬½ শতাংশ হারে বিনিময় বাট্টা দিতে হত। কর্ণওয়ালিশ সমস্যার সমাধানকল্পে কয়েকটি ব্যবস্থা নিলেন : (ক) ১৭৮৭তে মোহর মুদ্রণ বন্ধ হল, (খ) কালেক্টরদের সরকারি বিল সিক্কায় প্রদান করার আদেশ দেওয়া হয়। কলকাতায় মোহর নিয়ে বিল দেওয়া হল সরকারি হারে। মোহর ও সিক্কার বিনিময় হার কমিয়ে করা হল ১৫ সিক্কা+এক আর্কট টাকা, (গ) টাঁকশালে সিক্কার মুদ্রণ শুল্ক কমিয়ে করা হল ১ শতাংশ। পরে এ শুল্ক একেবারে লোপ করা হয়, (ঘ) মোহর ও সিক্কার মধ্যে ঘোষিত বিনিময় হার না মানলে শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই বিনিময় হার ভঙ্গ করার অপরাধে কয়েকজন মুদ্রা ব্যবসায়ীকে শাস্তিও দেওয়া হয়, (ঙ) এ ব্যবস্থায় খানিকটা সুফল দেখা দিলে ১৭৯০ সন থেকে বেসরকারি সোনা বিনাশুল্কে মোহর হিসাবে মুদ্রণ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এ ব্যবসায় মোহরের উপর বাট্টা আবার বাড়তে থাকে এবং কর্ণওয়ালিশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কর্ণওয়ালিশ জবরদস্তির পথ ছেড়ে চাহিদা ও সরবরাহ নীতির নিয়ম অনুযায়ী যেমন পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয় তেমনভাবে মোহর ও সিক্কার মধ্যে বিনিময় হার তাদের ধাতুগতমূল্যে স্থির হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যবস্থায় মোহরের উপর বাট্টার হার অনেকখানি নেমে আসে। (৮) কর্নওয়ালিশ কলকাতার বাইরে মোহরের প্রচলন বাড়ালেন। এতে অবশ্য আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না কারণ মুদ্রার একক হিসাবে মোহর জেলা ও গ্রামের লেনদেনে বিশেষ কাজে লাগত না।

কর্ণওয়ালিশ মুদ্রা ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান হিসাবে সিক্কা টাকাকে সারাদেশে একমাত্র স্থায়ী বৈধ মুদ্রা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। (১) হেস্টিংসের সময় বন্ধ করা তিনটি টাঁকশাল —ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ—পুনরায় খোলা হল। (২) চারটি টাঁকশাল থেকে একই ধরনের সুগোল, একই ওজন ও বিশুদ্ধতার সিক্কা চালু করা হয়। (৩) সব সিক্কা টাকায় ১৯ সূর্য বর্ষের ছাপ মারা হয় এবং হিজরি সন তুলে দেওয়া হয়। (৪) সমস্ত রকম চালু টাকা বিনাশুল্কে সিক্কায় পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। (৫) ১৭৯২-এর মে মাসে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্যে

২৬। মডার্ণ রিভিয়্যু, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৫।

একটি 'মিন্ট কমিটি' গঠন করা হয়। ঐ বছর 4 আগস্ট মিন্ট কমিটি তাদের সুপারিশগুলি পেশ করে।[২৭] কমিটির সুপারিশের প্রধান প্রধান দিকগুলি হল ঃ (ক) ১৭৯৪-এর ১০ এপ্রিলের পর সিক্কা হবে বাংলাদেশে একমাত্র বৈধ মুদ্রা ; সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি লেনদেনে শুধু সিক্কাই গৃহীত হবে। (খ) জনসাধারণকে বিভিন্ন রকমের মুদ্রা সিক্কায় রূপান্তরের সুযোগ করে দেওয়া হবে। (গ) সিক্কা বিকৃত বা জাল করা হলে আইনানুগভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। (ঘ) ভবিষ্যতে সমস্তরকম আর্থিক চুক্তি সিক্কা টাকায় হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

মিন্ট কমিটির সুপারিশগুলির মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত রকম মুদ্রা প্রত্যাহার করে সারা বাংলাদেশে রুপোর সিক্কা টাকা একমাত্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালু করা। পরবর্তীকালে বাস্তব অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৭৯৫-এর ১০ এপ্রিল পর্যন্ত অন্যান্য মুদ্রা বাংলাদেশে চালু রাখা হয়। ঐ তারিখের পরে সিক্কা টাকা বাংলাদেশে একমাত্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ব্যতিক্রম শুধু শ্রীহট্ট জেলা। আরো তিনবছর পরে ওখানে সিক্কা টাকা একমাত্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালু করা সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘ আঠারো বছরের অধিককাল ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলার জটিল মুদ্রা সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছিল।

কর্ণওয়ালিশ বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার সহায়ক বিকল্প হিসাবে জেনারেল ব্যাঙ্কের (১৭৮৬-৯১) নোট গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কোম্পানির কাগজের (bonds) বাজার মূল্য বাড়ানো বা স্থিতিশীল করাও তার অপর উদ্দেশ্য ছিল। কোম্পানি কাগজের ডিসকাউন্টে খুব বেশি উঠানামা হত। সরকারকে কুড়ি লাখ টাকা ধার দিয়ে ব্যাঙ্ক নোট ছাড়ার অধিকার পায়। সরকারি লেনদেনে ব্যাঙ্ক নোট গ্রহণ করা হত। খানিকটা সাফল্যও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ডিরেক্টর সভা বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবারে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ১৭৮৮র সেপ্টেম্বর মাসে সরকার ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করে ব্যাঙ্ক নোট নেওয়ার প্রথা বন্ধ করে দেয়।[২৮] সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক নোট দিয়ে মুদ্রা ব্যবস্থার উপর চাপ কমানোর প্রচেষ্টারও সমাপ্তি ঘটে।

অন্যান্য সমস্ত মুদ্রা অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় ছোট খুচরো পয়সা দুষ্প্রাপ্য হতে শুরু করে। তামার পয়সাও জনপ্রিয় হয়নি। সরকারি লেনদেনে মাত্র এক সিক্কা টাকার তামার পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সিক্কার দুষ্প্রাপ্যতার দরুন মোহরের উপর বাট্টা একেবারে লোপ পেল না। এজন্য কর্ণওয়ালিশ ১৭৯২এ আবার দ্বৈত মুদ্রা নীতি (bimetallism) অনুসরণ করতে শুরু করেন। আবার সোনার মোহর মুদ্রণ শুরু হয়। ১৭ আনা ওজনের মোহর সরকারি ও বেসরকারি লেনদেনে বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিনিময় হার হল এক মোহর সমান ষোল সিক্কা টাকা।

২৭। মিন্ট কমিটি মোট তেরোটি সুপারিশ পেশ করেছিল। পূর্ণাংগ বিবরণের জন্য দ্রঃ এন. কে, সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮-১৪০।

২৮। ক, লেটার টু দি কোর্ট, ৬ই নভেম্বর, ১৭৮৮। খ, হরিশ্চন্দ্র সিংহ, 'আরলি ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়া'।

মোহরে সরকারি রাজস্ব গ্রহণ করার পর থেকে মোহরের উপর বাট্টার হার কমতে শুরু করে। গ্রীষ্মকালে জেলাতে দাদনের জন্য যখন সিক্কা টাকার চাহিদা বাড়তে থাকে তখন মোহরের উপর বাট্টা বাড়ে। এ অবস্থার প্রতিকার করার জন্যে জনশোরের আদেশে ঐ সময় সরকারি কোষাগার থেকে অন্তত অর্ধেক টাকা সিক্কায় দেওয়া শুরু হয়। এ সত্ত্বেও শতকের শেষ অবধি মোহরের উপর বাট্টা চালু থাকে। এর কারণ প্রধানত দুটি। মোহরের প্রচলনে সীমাবদ্ধতা এবং সরকারি ব্যবস্থায় মোহরকে রুপোর চেয়ে আনুপাতিকভাবে বেশি দামী বলে স্বীকার করা। এর একমাত্র সমাধান হল দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থা (bimetallism) তুলে দিয়ে শুধু রুপোর সিক্কাকে বৈধ একমাত্র মুদ্রা হিসাবে (monometallism) প্রতিষ্ঠা করা। এ সময় তা করা সম্ভব হল না কারণ জনশোরের হিসাব মত দু কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার মোহর শতাব্দীর শেষে বাজারে চালু ছিল। মোহর প্রত্যাহার করতে হলে (demonetisation of gold coins) অন্ততঃ দু কোটি টাকা বাজারে ছাড়তে হত। অত রুপোর টাকা জনশোরের সময় (১৭৯৩-১৭৯৮) বাজারে ছাড়া সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৭৯৯ সনে ইউরোপ থেকে এক কোটি টাকার রুপো বাংলায় আসায় বাজারে রুপোর দাম নেমে গেল এবং মোহরের উপর বাট্টা কমে গেল। সোনা ও রুপোর বাজার দামের মধ্যে আনুপাতিক হার তাদের মুদ্রামূল্যের মধ্যেও দেখা গেল। বাংলার জেলা ও মফঃস্বলে মোহরের চলন অনেকখানি বেড়ে যাওয়ায় এরকম উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

# ১২

# ব্যাঙ্কিং ও বিনিময়

প্রাক্-পলাশী বাংলাদেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যমণি ছিলেন বাংলার রথস্‌চাইল্ড জগৎশেঠ পরিবার। গোলাম হোসেন জানিয়েছেন সারা হিন্দুস্তানে বা দক্ষিণ ভারতে এমন কোনো ব্যাঙ্কার বা বণিক নেই যার সঙ্গে জগৎশেঠদের তুলনা চলে।[১] গঙ্গা যেমন শতমুখে সমুদ্রে জল ঢালে তেমনি সম্পদ শতধারায় শেঠদের কোষাগারে জমা হয়। সারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ব্যবসাদার ও মহাজনরা ব্যাঙ্কিং-এর সমস্তরকম কাজকর্ম করত। শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এদের কাজকর্মে কিছু বিশেষত্ব (specialisation) লক্ষ্য করা যায়। এযুগের বণিক-ব্যাঙ্কারদের তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—(১) প্রধানত ব্যাঙ্কার, (২) প্রধানত বণিক শুধু কিছু মূলধন ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লগ্নী করা, (৩) বণিক-ব্যাঙ্কার যারা একই সঙ্গে ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং দু কাজই করত।[২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ব্যাঙ্কারদের কাজকর্মকে সাধারণভাবে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা (deposits)। বাংলার অভিজাত শ্রেণী ব্যাঙ্কারদের কাছে টাকা রেখে সুদ নিত, (খ) সুদে টাকা ধার দেওয়া (loans on interest) (গ) বিভিন্ন ধরনের হুণ্ডি কাটা ও আদায় দেওয়া (bills of exchange), (ঘ) বাংলায় প্রচলিত পঁচিশ-তিরিশ রকমের মুদ্রার বিনিময় ব্যবসা (exchange) এবং (ঙ) নানারকম আমদানি-রপ্তানি পণ্যের বেচাকেনায় অংশ নেওয়া। এ ছাড়াও ব্যাঙ্কাররা সাধারণ কারবার করত।

প্রাক্-পলাশী যুগে জগৎশেঠরা ছাড়া হুজুরিমল, জনার্দনশেঠ, বাণারসী শেঠ, রামকিষেণ শেঠ, আনন্দিরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বণিকরা বাংলায় ব্যাঙ্কিং-এর কাজ চালাত। তবে এ যুগে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্মে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছিল জগৎশেঠ পরিবার। অন্যদের তুলনায় এদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিলঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ, সবসময়ের জন্য বিশাল পুঁজির যোগান, ব্যাপক ব্যবসায়ী সংগঠন ও পরিচালন দক্ষতা এদের ব্যাঙ্কিং কাজকর্মকে বিশেষত্ব দিয়েছিল। এডমাণ্ড বার্ক এদের কাজকর্মকে 'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড'-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য দিক হল যথেষ্ট মূলধন সরবরাহের ক্ষমতা এবং সুদের হার। প্রাক্-পলাশী যুগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ঋণের সরবরাহে কোনো অসুবিধা দেখা যায় না। ইউরোপীয় বণিকরা বাংলার ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে

১। গোলাম হোসেন, সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৫৮,
২। কে. এম. মহসিন, এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশনঃ মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-১৭৯৩, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ১৪০-৪২।

তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারত। এ সময়ে বাংলাদেশে সুদের হার কত তা এককথায় বলা যায় না। জগৎশেঠরা সাধারণত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে বার্ষিক নয় শতাংশ হারে টাকা ধার দিত। প্রাচ্যদেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী বেশি সুদ নেবার ঝোঁক এদের মধ্যে দেখা যায় না, এ সময় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সুদের হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ।[৩] কোনো ব্যক্তিকে টাকা ধার দিতে হলে সুদের হার নিশ্চয়ই বেশি হত কারণ এক্ষেত্রে অনাদায় বা ক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি। সাধারণভাবে এযুগে বাংলার বণিক ও মহাজনদের কাছে থেকে বাণিজ্যিক পুঁজির জন্যে ঋণ নিলে বার্ষিক দশ থেকে বারো শতাংশ হারে সুদ দিতে হত।[৪] এ যুগে গ্রামের মানুষের ঋণগ্রস্থতা অসাধারণ। গ্রামে পুঁজির যোগান অনেক কম সেজন্যে সেখানে সুদের হারও অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষক মহাজনের কাছ থেকে মাসিক টাকায় দু আনা সুদে টাকা ধার নিয়েছে অর্থাৎ সুদের হার হল বার্ষিক ১৫০ শতাংশ। জগৎশেঠরা বাংলার জমিদারদের মাসিক ২ থেকে ৩½ শতাংশ হারে টাকা ধার দিত। অন্যান্য বণিকরা নিত মাসিক ২ শতাংশ।

## ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও জগৎশেঠ পরিবার

রাজস্থানে মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুরের কাছে নাগর জগৎশেঠ পরিবারের আদি বাসস্থান। এরা অসওয়াল সম্প্রদায়ের লোক, ধর্মে জৈন, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হীরানন্দ সাহুর পুত্র মাণিকচাঁদ বাংলার তৎকালীন রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র ঢাকাতে এসে 'কোঠী' স্থাপন করেছিলেন। বন্ধু মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে চলে এলে (১৭০৪) ইনিও চলে আসেন এবং নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে কোঠী স্থাপন করেন। আস্তে আস্তে বাংলার সর্বত্র এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন সহরে এদের কোঠী গড়ে উঠে। বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ঢাকা ও হুগলীতে এদের কোঠী ছিল। বাংলার বাইরে পাটনা, কাশী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট ও আসামে এদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সম্রাট ফারুখশিয়ার মাণিকচাঁদকে 'শেঠ' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মুহম্মদশাহ্ এদের ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ মাণিকচাঁদের দত্তক পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফতেচাঁদকে দিলেন 'জগৎশেঠ' উপাধি।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদিকুলির টাঁকশাল কর্মচারী রঘুনন্দন মারা গেলে জগৎশেঠ পরিবার বাংলার টাঁকশাল ও মুদ্রা বাবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পায় এবং মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা (exchange of specie)। এ পরিবার বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করত। এ যুগে বাংলার অসংখ্য স্রফ ও পোদ্দার টাকার বিনিময় ব্যবসা করত। এদের অনেকে নানাভাবে

৩। টি. এস. এ্যাসটন. ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন, ১ম অধ্যায়।

৪। পি.জে. মার্শাল, ঐ. পৃঃ ৪২ এবং গৌতম ভদ্রের প্রবন্ধ 'সোস্যাল গ্রুপস্ এ্যাণ্ড সোস্যাল রিলেশনস ইন দি টাউন অব মুর্শিদাবাদ', ১৭৬৫-১৭৯৩', পৃঃ ৯।

জগৎশেঠ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় অতি প্রয়োজনীয় এবং অতিলাভজনক ব্যবসা ছিল।[৫] বত্রিশ রকম বিদেশী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার জগৎশেঠ পরিবার ঠিক করে দিত। বিনিময় ব্যবসা থেকে তারাও যথেষ্ট রোজগার করত। এ যুগে বাংলা দেশে এত বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চালু থাকা সত্ত্বেও বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অরাজকতা দেখা দেয়নি। এ শৃঙ্খলা তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

আজকের দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক সরকারের পক্ষে যে কাজগুলি করে সে যুগে জগৎ-শেঠ পরিবার বাংলা সরকারের জন্যে সে কাজগুলি করত। আমিল ও জমিদাররা জগৎশেঠদের গদীতে সরকারি রাজস্ব জমা দিত। তেমনি নবাবদের টাকার প্রয়োজন হ'লে তারা সরবরাহ করত। মারাঠা আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের সময় আলিবর্দি জগৎশেঠদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছিলেন। জগৎ-শেঠদের বিভিন্ন কোঠীতে সরকারের বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত রাজস্ব গ্রহণ করা হত। সরকারির খাতে সংগৃহীত সমস্ত টাকার আলাদা হিসেব থাকত। বাংলার নবাবরা জগৎশেঠদের সম্পদকে নিজেদের বলে মনে করতেন। এদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে দেশী বিদেশী বণিকদের উপর রাজনৈতিক চাপ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হতেন না।[৬]

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরাজদের সঙ্গে জগৎশেঠদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরা ইংরাজদের বার্ষিক গড়ে চার লক্ষ টাকা বার্ষিক ৯ শতাংশ সুদে ধার দিত। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কোম্পানির স্বল্প মেয়াদি বাণিজ্যিক মূলধনের বেশির ভাগ আসত জগৎশেঠদের কোঠী থেকে। অন্যান্য ব্যাঙ্কার, বণিক ও মহাজনদের সুদের হার বেশি ছিল। সেজন্য ছোট খাট দেশী বিদেশী বণিক ও মহাজনরা এদের কোঠী থেকে টাকা ধার নিত। কলকাতা, ঢাকা ও পাটনা কোঠী থেকে প্রতিবছর বহু টাকা দেশী বিদেশী বণিকদের ঋণ দেওয়া হত। এ যুগে পূর্ব ভারতে এই ব্যাঙ্কিং পরিবার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ঋণের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা এদের কাছ থেকে পুঁজি ধার করত। মধ্য এশিয়ার কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া গেছে যারা এদের কাছ থেকে মূলধন ধার করেছিল। বাংলার কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে এরা পুঁজির যোগান দিত। জমিদারির উন্নতিতে বাঁধ দেওয়া, জঙ্গলকাটা ও চাষ বাড়ানোর জন্যে জমিদাররা এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিত। তেমনি সুতীবস্ত্রের ব্যবসায়ী, রেশম শিল্পের মহাজন এদের কাছ থেকে স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করত। সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে এ ব্যাঙ্কিং পরিবারের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানা যায়। সাধারণত এরা ক্ষুদ্রস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হত না। এ পরিবার কখনো ঘুষ ও উৎকোচগ্রহণ

৫। হরিশ্চন্দ্র সিংহ, বাংলার ব্যাঙ্কিং, পৃঃ ১১।
৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্‌-পলাশী বাংলা, পৃঃ ১০১।

বা অবৈধ টাকা রোজগারের চেষ্টা করেনি।[৭] তৎকালীন বাংলার নৈতিক মানদণ্ডে এ মানসিকতা যে খুবই কৃতিত্বপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জগৎশেঠ পরিবারের মোট মূলধনের পরিমাণ কত তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। মারাঠারা এদের দুকোটি টাকা লুট করেছিল।[৮] তবুও পঞ্চাশের দশকের শেষে এদের মোট মূলধনের পরিমাণ সাত কোটি টাকার কম নয়।[৯] এ সময়ে এরা এক কোটি টাকার দর্শনী হুণ্ডি কাটত।[১০] ব্যাঙ্কিং-এর কাজ ছাড়াও জগৎশেঠ পরিবার নানারকম ব্যবসা করত। শস্যের ব্যবসা তাদের বাধ্য হয়ে করতে হত। জমিদারদের বাকী খাজনার তারা হত জামিনদার (guarantor) এবং অনেকসময় জমিদাররা শস্য দিয়ে দেনা শোধ করত। ওলন্দাজদের কাগজপত্র থেকে জানা যায় জগৎশেঠরা চারটি প্রধান মশলার খুচরো বেচাকেনা (retail trade) হাতে নিয়েছিল। জগৎশেঠ পরিবার ও অন্যান্য ব্যাঙ্কাররা দেশী বিদেশী বণিকদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। বণিকদের পক্ষে নানারকম পণ্য বেচাকেনা করে এরা কমিশন পেত।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাওয়ার পর তাঁর দুই পৌত্র জগৎশেঠ মহাতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ এ পরিবারের প্রধান হন। এদের সময় এ পরিবারের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মঁশিয়ে ল (M. Law) লিখেছেন আলিবর্দি জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে শ্রদ্ধা করতেন।[১১]

জগৎশেঠ পরিবারের উক্ত কাজকর্মকে পাঁচ ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) এদের আয়ের প্রধান উৎস হল সরকারের পক্ষে সমস্ত রাজস্ব গ্রহণ করা এবং এর হিসেব রাখা। সম্ভবত তারা সংগৃহীত রাজস্বের দশ শতাংশ কমিশন পেত।[১২] স্ক্র্যাফ্টনের মতে এ থেকে এ পরিবার বছরে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা আয় করত। (২) সরকারি রাজস্ব শুধু সিক্কাতে নেওয়া হত। তাই সিক্কা, সোনাত ও অন্যান্য টাকা যা বাংলা দেশে চালু ছিল তাদের মধ্যে বিনিময় চলত সবসময়। তাছাড়া টাঁকশালের আয়ও জগৎশেঠদের গদীতে জমা হত। বিনিময় ও টাঁকশাল আয় থেকে জগৎশেঠ পরিবারের বার্ষিক আয় হত সাত থেকে আট লাখ টাকা। এ লাভজনক ব্যবসা ও আয়ের পথ বন্ধ হবে জেনেই তারা ইংরাজদের টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব বা মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহার করার চেষ্টায় বারবার বাধা দিয়েছিল।[১৩] (৩) জগৎশেঠরা ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও এদেশীয় বণিকদের বহু টাকা সুদে ধার দিত। এত টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা এযুগে বাংলাদেশে আর কোনো ব্যাঙ্কারের

৭। জে. এইচ. লিট্‌ল, 'দি হাউস অব জগৎশেঠ', পৃঃ ৫৯।
৮। চার্লস স্টুয়ার্টের মতে এর পরিমাণ তিনলক্ষ টাকা।
৯। উইলিয়েম বোল্টস্‌, ঐ, পৃঃ ১৫৮।
১০। গোলাম হোসেন, সিয়ার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৫৮।
১১। জে. এইচ. লিট্‌ল, ঐ. পৃঃ ১৫২।
১২। এস. সি. হিল, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮।
১৩। উইলিয়ম ওয়াটসের চিঠি. ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৩।

ছিল না। ওলন্দাজদের কাগজপত্রে দেখা যায় এরা জগৎশেঠদের কাছ থেকে মাসিক ¾ শতাংশ সুদে এককালীন চার লাখ টাকা নিয়েছে। ১৭৫৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে ফরাসিদের কাছে এদের পাওনা মোট পনেরো লাখ টাকা। সব সময় বিপুল অর্থের যোগান থাকাতে এদের মধ্যে একচেটিরা ব্যাঙ্কিং-এর ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। (৪) অন্যান্য ব্যাঙ্কারদের মত জগৎশেঠ পরিবার নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য করত। নানারকম পণ্যে টাকা বিনিয়োগ করত। কখনো কখনো সরকার এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কয়েকটি জেলার রাজস্ব এদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত (assignments on the revenues of particular districts)। এ জেলাগুলির জমিদাররা এদের কোঠীতে যে রাজস্ব জমা দিত তা তাদের পারিবারিক আয়ের হিসেবে জমা হত। (৫) জগৎশেঠ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলি হুণ্ডির কাজ করত। এই হুণ্ডি আধুনিক 'বিল অব এক্সচেঞ্জ।' সুজাউদ্দিনের সময় (১৭২৭-১৭৩৯) সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব এবং দেওয়ানি পর্বে (১৭৬৫-৭২) সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের প্রাপ্য রাজস্ব জগৎশেঠদের হুণ্ডির মাধ্যমে দিল্লীতে পাঠানো হত। পথে চোর ডাকাতের ভয় ছিল সেজন্য ঐ যুগে হুণ্ডিতে টাকা পাঠানো অনেক সহজ ও নিরাপদ হত। ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা জেলায় জেলায় তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলিতে আগাম দাদন ও নগদ টাকায় মাল কেনার জন্য হুণ্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাত। বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বণিকরাও হুণ্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাত। বাংলার বাইরে অন্য কোথাও টাকা পাঠানোর দরকার হলে হুণ্ডির মাধ্যমে যেমন পাঠানো যেত তেমনি অন্য জায়গা থেকে ব্যাঙ্কাররা তাদের উপর হুণ্ডি এনে প্রাপককে (Payee) প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিত। হুণ্ডির জন্যে জগৎশেঠ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কাররা ডিসকাউন্ট নিত, এযুগে যার নাম হুণ্ডি বাট্টা। এযুগে হুণ্ডি বাট্টার হার শতকরা দু' থেকে আট পর্যন্ত উঠে যেত। বাজারে পণ্যমূল্যের ন্যায় হুণ্ডি বাট্টার হার হুণ্ডির চাহিদার যোগানের উপর নির্ভর করত। বছরের কোনো কোনো সময় হুণ্ডির চাহিদা বেশি থাকত—তখন হুণ্ডি বাট্টার হারও বেশি। আবার ইউরোপের জাহাজগুলি বাংলা ছেড়ে গেলে হুণ্ডি বাট্টার হার নেমে যেত।

বাংলার নবাবদের সঙ্গে জগৎশেঠ পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। মুর্শিদকুলি, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দি রাষ্ট্র পরিচালনায় অনেক সময় এদের পরামর্শ নিতেন। টাঁকশাল, মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে জগৎশেঠরা ছিল সর্বেসর্বা। এ সমস্ত ব্যাপারে এদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণত নবাবরা অনুমোদন করতেন। বিদেশীরা, বিশেষকরে ইংরাজরা, অনেক চেষ্টা করেও বাংলার নবাব ও জগৎশেঠদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারেনি। তাদের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ নবাবদের দিয়ে করানো সম্ভব হত না।[১৪] সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কাছে অগ্‌সবার্গের ফুগার পরিবার এবং মধ্যযুগে রোমের পোপদের কাছে ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবার যা, বাংলার

১৪। জে. এইচ. লিট্‌ল, ঐ. পৃঃ ৪৩। ১৭১৭, ১৭২১ ও ১৭৫৩ সনে ইংরাজরা মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল। প্রতিবারই তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

নবাবদের কাছে জগৎশেঠ পরিবার তাই ছিল।[১৫] তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় ফুগার বা মেদিচি পরিবারের চেয়ে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে জগৎশেঠ পরিবারের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্ভবত বাংলার নবাবরা জগৎশেঠদের গদীতে টাকা লগ্নী করতেন। জগৎশেঠদের আশ্চর্যজনক দ্রুত উন্নতি এজন্যে সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে অতিদ্রুত এ ব্যাঙ্কিং পরিবারের অবনতি ও পতন ঘটে।[১৬] শুধু নবাবরা নন এযুগে বাংলার শাসক শ্রেণী বড় বড় বণিক ও ব্যাঙ্কারদের গদীতে বার্ষিক সুদে টাকা বিনিয়োগ করত। বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীর মূলধনের একটা বড় অংশ এসূত্র থেকে সংগৃহীত হত। রাজনৈতিক যোগাযোগ ও শাসক শ্রেণীর পুঁজি এ যুগে বাংলার ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা অসঙ্গত নয়।

ইংরাজদের প্রতি বন্ধু মনোভাবাপন্ন জগৎশেঠ পরিবারকে মীরকাশিম ক্ষমতালাভের পর থেকেই (১৭৬০-৬৩) সন্দেহ করতে থাকেন। এদের সম্পদ লুণ্ঠন করে তিনি জগৎশেঠ মহাতাব রায় এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদকে হত্যা করেন। মীর কাশিম বুলাকি দাসের ব্যাঙ্কিং পরিবারকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি এদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। বুলাকি দাস পরিবার ব্যাঙ্কিং কাজকর্মে অনেকখানি সাফল্যলাভও করেছিল। ইংরাজদের সঙ্গে এ পরিবারের আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ডিরেক্টর সভার ১৭৬৬ সনের ২১শে নভেম্বরের চিঠিতে দেখা যায় ঐ সময় কোম্পানির কাছে বুলাকি দাসের দু লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা পাওনা ছিল। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঙ্কিং পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৭৬০ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত জগৎশেঠ পরিবার কোম্পানির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করেছিল। জগৎশেঠ খুশলচাঁদ ও মহারাজ উদ্বত চাঁদ মহম্মদ রেজা খাঁ ও মহারাজ দুর্লভরামের সঙ্গে একযোগে রাজস্ব বিভাগের কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগৃহীত হত। এ পর্বে কোম্পানির সঙ্গে জৎশেঠদের মাঝে মাঝে মনোমালিন্য দেখা দিত। ১৭৬৫ খৃঃ ২৪ নভেম্বর লেখা এক চিঠিতে লর্ড ক্লাইভ তাদের কাজকর্মের সমালোচনা করেছিলেন। জগৎশেঠদের কাজকর্মে দুটি প্রধান আপত্তিকর দিক হল সরকারি টাকা ট্রেজারিতে তিন চাবিতে না রেখে তারা বাড়িতে রাখতেন এবং জমিদারদের কাছে সরকারের পাঁচমাসের রাজস্ব বাকী থাকা অবস্থায় নিজেদের পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। ঐ চিঠিতে ক্লাইভ জগৎশেঠদের অতি ধনী ব্যাঙ্কিং পরিবার বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] তবে এযুগেই তাদের অবক্ষয় ও পতন দ্রুত হতে থাকে। ১৭৬৩-তে বিদায়ী ওলন্দাজ গভর্ণর টৈলেফার্ট (Taillefert) তার উত্তরাধিকারীকে এ

১৫। এন. কে. সিংহ, ভূমিকা, জে. এইচ. লিটল, ঐ।

১৬। কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ১৪৭।

১৭। শেঠদের কাছে গভর্ণরের চিঠি, ২৪ নভেম্বর, ১৭৬৫, জে. লঙ, ঐ. পৃঃ ৫৪৮, রেকর্ড নং ৮১২।

সম্পর্কে সতর্ক করে যান।[১৮] ষাটের দশক থেকে কাশীর মনোহর-দ্বারকাদাসের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা, গোপালদাস ও হরিকিষেণ দাসের কারবার এবং বাংলার সাহু বণিক-দের ব্যাঙ্কিং কারবার জগৎশেঠদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজ করতে থাকে, এ যুগে বাংলার ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের দুটি নতুন বৈশিষ্ট্য হল : প্রথমত বাণিজ্যিক কাজকর্মে বীমার প্রচলন, এই উদ্দেশ্যে বণিকদের মধ্যে সত (saut) বা চুক্তি হত। দ্বিতীয়ত, ভারতের বাণিজ্য জগতে মূলধনের সরবরাহকারী হিসেবে মুর্শিদাবাদ ব্যাঙ্কারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সুদূর বোম্বাই ও সুরাট শহরে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য মুর্শিদা-বাদের ব্যাঙ্কাররা মূলধন সরবরাহ করত।

শতাব্দীর শেষ পাদে জগৎশেঠ পরিবারের পতন বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়েছিল। (ক) এ পরিবারের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে মীরকাশিমের নিকট থেকে। এদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করে নবাব জগৎশেঠ ভাইদের হত্যা করেন। নবাব এ পরিবারের কয়েকজনকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যান যাদের মুক্তিপণ হিসেবে খুশল চাঁদকে মণিমুক্তো বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতে হয়।[১৯] (খ) কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপিত হওয়ার পর থেকে টাঁকশাল ও মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার উপর এ পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য নষ্ট হয়। বিনিময় বাট্টা থেকে তাদের আয় কমতে থাকে। ১৭৭৭ এ হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল বন্ধ করে দেন, তাতে এ পরিবারের আরো ক্ষতি হয়। (গ) পলাশীর পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে প্রচুর টাকা আসে এবং সে টাকা বিদেশীদের বাণিজ্যে সিনিয়োগ করা হয়। দেওয়ানি লাভের পর থেকে কোম্পানির আর স্বল্প মেয়াদি বাণিজ্য পুঁজির প্রয়োজন হয়নি, এতে জগৎশেঠ পরিবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ঘ) মুর্শিদাবাদে বৃটিশ রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইকস জগৎশেঠদের খেলাত বাবদ উপঢৌকন ও অর্থ আদায়ের সুযোগ বন্ধ করে দেন।[২০] (ঙ) ১৭৭২-এ সরকারি কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এ পরিবার সরকারি ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করার সুযোগ হারায়। (চ) রাজ-নৈতিক যোগাযোগের ফলে নবাব, আমীর, ওমরাহ্ ও শাসক শ্রেণীর পুঁজি এদের কারবারে লগ্নী হত। এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের পতন আসন্ন হয়ে উঠে। সুরাট, আসাম ও অন্যান্য স্থানে এদের কোঠী বন্ধ হতে শুরু করে। ব্যাঙ্কিং কাজকর্মে যে দক্ষতা প্রাক্-পলাশী যুগে দেখা যেত পরবর্তীকালে সে দক্ষতা হ্রাস পায়। শতাব্দীর শেষে সময়মত হুণ্ডির টাকা প্রাপককে দিতে পারত না। (ছ) নবাবী আমলে জগৎশেঠ পরিবার বিনাশুল্কে বাণিজ্যিক কারবার চালাত। ইংরাজ আমলে এ অধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২১] গোলাম হোসেনের মতে বাংলা ও হিন্দুস্তানের সমস্তরকম বাণিজ্য ইংরাজদের হাতে চলে যাওয়ায় জগৎশেঠদের ধনহানি ঘটে।[২২]

১৮। এন. কে সিংহ, ঐ. ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৪।

১৯। ঐ. পৃঃ ১৫৩। লর্ড ক্লাইভকে লেখা জগৎশেঠ খুশলচাঁদ ও মহারাজ উম্বত চাঁদের চিঠি, ১০ মে, ১৭৬৫। জে. লঙ্, ঐ, রেকর্ড নং ৮১৯, পৃঃ ৫৫১।

২০। আব্দুল মজিদ খাঁ, ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল, পৃ. ১১৫।

২১। বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশন, ১৯ জুন ১৭৬৯।

২২। গোলাম হোসেন, সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৫৮।

## কোম্পানির আমল ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার স্বর্ণযুগ

শতাব্দীর শেষ তিনদশকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় জগৎশেঠদের একাধিপত্য নষ্ট হওয়ার পর থেকে মাঝারি ও ছোট অসংখ্য বাঙালী ও অবাঙালী ব্যাংকার বাংলাদেশে ব্যাঙ্কিং-এর কারবার পরিচালনা করতে থাকে। কোম্পানির কাগজপত্রে এদের নামের তালিকা পাওয়া যায়।[২৩] এ তালিকায় বাঙালী ব্যাঙ্কারের সংখ্যাধিক্য সহজেই চোখে পড়ে। গোপাল দাস, সেবারাম পাল, নন্দরাম ও বৈদ্যনাথ, ব্রজবল্লভ দাস, নিমাই শীল, কৃষ্ণমোহন শীল ও মদনমোহন শীল, রঘুনন্দন দাঁ ও নন্দদুলাল শীল, শম্ভুচরণ দত্ত, পুরুষ রতন নন্দী, ধরণীধর নন্দী, গৌরমোহন ও নন্দমোহন, তিলকরাম শীল, গণেশ দাস, গোকুল চাঁদ, ভোলা নাথ, নন্দরাম ও জগন্নাথ, প্রসন্ন দাঁ, হনুমান শাহ ও দেকারাম, কৃষ্ণ দাস, বেহারিমল ও পিণ্ডী দাস, জগন্নাথ ও মাণিকচাঁদ, সমরচাঁদ ও তিলকচাঁদ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, যুগল মান্না, রামশংকর হালদার, রাধামোহন মল্লিক, কালীচরণ হালদার, কালীপ্রসাদ দত্ত এবং বারাণসী ঘোষ এযুগে বাংলার ব্যাঙ্কার। এদের ব্যাঙ্কিং কাজকর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায়; (২) হুণ্ডির কাজ, (২) টাকার বিনিময়, (৩) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক ঋণ।

পলাশী-উত্তরকালে বাংলার ব্যাঙ্কারদের অন্যতম কাজ হল আগের দিনের মত হুণ্ডিতে টাকা পাঠানো এবং হুণ্ডি মারফৎ প্রাপককে টাকা আদায় দেওয়া। জগৎ-শেঠদের সরিয়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কাররা সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ও কলকাতায় পাঠানোর ব্যাপারে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। ১৭৮৭তে শ্রীহট্ট থেকে পাঠানো সরকারি রাজস্ব রাধাকৃষ্ণ সাহু ও রামকৃষ্ণ সাহু জগৎশেঠদের তুলনায় অনেকবেশি টাকার হুণ্ডি কেটেছিল।[২৪] এযুগে দেশী ব্যাঙ্কারদের হুণ্ডি অনাদায় হতে শুরু করে।[২৫] কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজস্বখাতে সংগৃহীত টাকা পাঠানোর অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ১৭৮০তে কোম্পানি হুণ্ডিতে টাকা পাঠিয়ে রামচরণ সাহু ও গোপালচরণ সাহু, রামকিষেণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে হুণ্ডির টাকা আদায় করতে পারেনি।[২৬] উভয় ক্ষেত্রেই কোম্পানির লোকসান হয়।

শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বাংলাদেশে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ক্লাইভ ও ভেরেলস্টের মোহর প্রচলন ও হেস্টিংসের এক টাঁকশাল ও এক মুদ্রা (১৯ বর্ষ সিক্কা) পরিকল্পনা অভ্যন্তরীণ টাকার বাজারে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে। হেস্টিংস প্রচলিত অন্য মুদ্রাগুলি বাতিল বা পুনর্মুদ্রণের (remonetisation) চেষ্টা করেননি। ফলে মোহর ও সিক্কা এবং সিক্কা ও অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময় বাট্টা রয়ে গেল। তাছাড়া ছিল মোহরের অতিমূল্যায়ন। জমিদারদের সিক্কাতে রাজস্ব জমা দিতে হত অথচ বাংলাদেশে একমাত্র কলকাতার

২৩। কনসালটেশন, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৭৬৮, ২৪ জানুয়ারী ১৭৮৫, ৬ ডিসেম্বর ১৭৮৭।
২৪। গৌতম ভদ্র, ঐ, পৃঃ ১৪।
২৫। হরিশচন্দ্র সিংহ, আর্লি ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কিং ইন ইন্ডিয়া, ১৯২৭, পৃঃ ১৬৬-১৬৯।
২৬। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ১৪৯-৫০।

টাঁকশালে সিক্কা তৈরি হত। রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য জমিদাররা পুরোপুরি স্রফ বা পোদ্দারদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারা এজন্য সুদ, কিসারাত ও সেলামি নিত। শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুদ্রার ব্যবসা বেশ লাভজনক। এক এক জেলায় এক একটি বিশেষ মুদ্রার প্রাধান্য। ব্যাঙ্কাররা ঐ বিশেষ মুদ্রার বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ করত। একই মুদ্রা একদামে কিনে তার বেশি দামে বিক্রি করা হত।[২৭] এভাবে তারা লাভবান হত। বাংলার ব্যাঙ্কারদের তৃতীয় কাজটি হল এদেশী বণিক, জমিদার, কারুশিল্পী ও কারিগরদের মূলধন সরবরাহ করা। বিদেশী বণিকরা শতাব্দীর শেষদিকে বাণিজ্য মূলধনের জন্যে এদের উপর নির্ভর করত না। ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস ও ব্যাঙ্কগুলি তাদের পুঁজি সরবরাহ করত। প্রতিটি বিদেশী কোম্পানির একটি নিজস্ব এজেন্সি হাউস গড়ে উঠেছিল।[২৮] তবে এদেশীয় বণিকসমাজ বাণিজ্যিক ঋণের জন্যে এদেশীয় ব্যাঙ্কারদের দ্বারস্থ হত।

এদেশীয় ব্যাঙ্কিং শতাব্দীর শেষ দিকে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। (১) এসময়ে বাংলার সমগ্র বহির্বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে চলে যায়। অন্তর্বাণিজ্য কোম্পানির কর্মচারীরা দীর্ঘকাল একচেটিয়া করে রেখেছিল। শেষদিকে জগৎশেঠদের বিপুল ব্যাঙ্কিং কারবার কেবলমাত্র হুণ্ডিতে রাজস্ব পাঠানোর কাজে পর্যবসিত হয়। বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ায় ব্যাঙ্কিংও ক্রমশ তাদের হাতে চলে যায়। (২) পলাশী থেকে আরম্ভ করে ক্রমাগত বাংলার রাজস্ব বাইরে চালান হতে থাকে (economic drain)। এতে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যাঙ্কিংও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৩) এদেশের ব্যাঙ্কাররা ব্যাঙ্কিং ব্যবসা একসঙ্গে করত। ব্যবসায়ে লাভ লোকসান আছেই। কারবারে লোকসান অনেক সময় ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষতির কারণ হত। (৪) হুণ্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো, মুদ্রা বিনিময় এবং নবাব, আমীর, ওমরাহ ও অভিজাতদের টাকা ধার দেওয়া এদেশীয় ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজ। শাসকশ্রেণীকে টাকা ধার দেওয়াতে ঝুঁকি থাকে বেশি। রাজনৈতিক যোগাযোগ যেমন দ্রুত উন্নতির কারণ হতে পারে তেমনি দ্রুত অধঃপতনেরও কারণ। রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে জগৎশেঠ পরিবারের দ্রুত পতন ঘটেছিল।

শতাব্দীর শেষ তিন দশকে ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ও পুঁজিতে তিনটি ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক এদেশে গড়ে উঠেছিল। এ তিনটি ব্যাঙ্ক হল 'ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান' (১৭৭০), 'বেঙ্গল ব্যাঙ্ক' (১৭৮৪) এবং 'জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' (১৭৮৬)। এদের কাজকর্ম কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রধানত ইউরোপীয়দের বহির্বাণিজ্যে এরা মূলধন সরবরাহ করত। সত্তরের দশক থেকে বাংলার ব্যাঙ্কিং দুধারায় প্রবাহিত হতে থাকে—ভারতীয় ও ইউরোপীয়। বিখ্যাত

২৭। এন. কে. সিংহ, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

২৮। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ১১। এজেন্সি হাউস ফার্গুসন ফেয়ারলি এ্যান্ড কোং ফরাসি, প্যাক্সটন ওলন্দাজ এবং বারেটো পর্তুগীজদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করত।

এজেন্সি হাউস আলেকজাণ্ডার এ্যাণ্ড কোম্পানি ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান চালু করে। এ ব্যাঙ্ককে তাদের এজেন্সি হাউসের শাখা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশীয় ব্যাঙ্কিং-এর ঐতিহ্য—ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসা—থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। তবে অন্য ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক দুটি কেবলমাত্র ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ব্যাঙ্কের চিরাচরিত কাজ হুণ্ডি, আমানত গ্রহণ ও সুদে টাকা ধার দেওয়া ছাড়াও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি বাংলাদেশে ব্যাঙ্ক নোট চালু করেছিল। কর্ণওয়ালিশ জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এদের নোটে সরকারি রাজস্ব জমা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্য দুটি ব্যাঙ্কও ব্যাঙ্ক নোট ছেড়েছিল যদিও এদের নোট সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। কোম্পানির ডিরেক্টর সভা বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সমর্থন করেনি। ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান কুড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকার ব্যাঙ্ক নোট বাজারে ছেড়েছিল এবং সমস্ত সরকারি অফিসে তা গৃহীতও হত। একমাত্র ব্যতিক্রম হল সরকারি কোষাগার।[২৯]

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং-এর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জেনারেল ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব। অর্থাৎ যত টাকার শেয়ার যিনি কিনেছিলেন, তত টাকা পর্যন্তই তার দায় ছিল, তার চেয়ে বেশী নয়।[৩০] এ ব্যাঙ্ক কুড়ি লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ বা বণ্ড কিনেছিল এবং এটাকে আমানত হিসেবে রেখে ব্যাঙ্ক নোট চালু করেছিল। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির কাগজের বাজার দাম বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। ১৭৮৮তে বিলাতের কর্তৃপক্ষের আদেশে সরকার জেনারেল ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯০-৯২) টিপুর সাময়িক সাফল্য জেনারেল ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পতনের (১৭৯১) কারণ হয়।[৩১] বেঙ্গল ব্যাঙ্ক থেকে আমানতকারীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে টাকা তুলতে থাকে। ফলে দুটি ব্যাঙ্কই ঐ বছর বন্ধ হয়ে যায়। শুধু ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান সরকারি ঋণ নিয়ে এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল এবং ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত টিকে ছিল। শতাব্দীর শেষ দশকে ঐ ব্যাঙ্ক কোম্পানির কাগজের মূল্যমান বজায় রাখার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং (European Banking in Bengal)-এর সঙ্গে এদেশীয় (Indigenous Banking) ব্যাঙ্কিং-এর তুলনা করলে কতকগুলি পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রথমত, এদেশে আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর সূত্রপাত হল ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সীমাবদ্ধ দায়িত্বের শেয়ার বিক্রী করেছিল—অর্থাৎ যেটুকু শেয়ার সেটুকু দায়িত্ব। এ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের

২৯। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ১৫২।

৩০। হরিশচন্দ্র সিংহ, ঐ, পৃঃ ২ এবং এন. কে. সিংহ সম্পা: হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫-২৬।

৩১। ১৭৯১ সনের ৩রা নভেম্বর লে. চ্যামার্স (Chalmres) কোয়েম্বাটোরে টিপুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার ফলেই এ ব্যাঙ্কিং বিপর্যয়।

ব্যাঙ্কিংএ নিঃসন্দেহে নতুন। দ্বিতীয়ত, তিনটি ইউরোপীয় ব্যাংকই ব্যাংক নোট চালু করেছিল। জেনারেল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার নোট সরকার গ্রহণ করত। অন্য দুটি ব্যাংকের প্রত্যেক্যের কুড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকার নোট কলকাতায় চালু হয়েছিল। এদেশী ব্যাংকারদের এ অভিজ্ঞতা ছিল না। তৃতীয়ত, ইউরোপীয় ব্যাংকগুলি স্বল্প মেয়াদি বাণিজ্যিক ঋণ দিত কারণ তাতে ঝুঁকি কম; তাছাড়া সরকারি ঋণপত্র কিনে নিশ্চিত লাভের ব্যবস্থা করে রাখত। চতুর্থত, এদেশীয় ব্যাংকারদের মত কারবার ও ব্যাঙ্কিং-এর মিশ্র পদ্ধতি ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং-এর বৈশিষ্ট্য নয়। ব্যাংক অব হিন্দুস্তান এরকম কাজ করত ঠিকই, তবে এদের প্রধান কাজ ছিল আমানত রাখা ও সুদে টাকা খাটানো যা আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর বৈশিষ্ট্য। পঞ্চমত; কোম্পানির কর্মচারী ও ইউরোপীয়দের পুঁজি, পরিচালনা ও স্বার্থে এ ব্যাংকগুলি গড়ে উঠেছিল। এদেশীয়দের খুব সামান্য পুঁজিই এতে ছিল। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আর্থিক-বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যাঙ্কগুলি কাজ করেছিল।

# ১৩

## বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরি

প্রাক্-পলাশী যুগের বাংলার পরিচয় দিতে গিয়ে কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট মন্তব্য করেছেন 'আর্থিক অবস্থা সহজ, ব্যয় সীমিত, দেশ স্বাধীন, রাজ্য দুশ্চিন্তা ও ব্যয় মুক্ত—অধিবাসীরা কৃষি ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করে।' উইলিয়ম বোল্টস্ ও হ্যারি ভেরেলস্ট উভয়েই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে এ যুগে বাংলার বাজারে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ ছিল—অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ছিল। ভেরেলস্ট লিখেছেন ঐ যুগে বাণিজ্য বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও মুক্ত। বাংলার নবাবরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করতেন। কোনো বিশেষ বণিক বা গোষ্ঠী একচেটিয়া বাণিজ্য বা জবরদস্তি বাণিজ্য করার সুযোগ পেত না। তবে বাংলার নবাবরা রাজস্বের বিনিময়ে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে বাণিজ্যাধিকার বিশেষ ব্যক্তিকে দান করতেন। লবণ, সুপারি, তামাক, আফিম প্রভৃতি পণ্য এরকম বাণিজ্যের উদাহরণ।[১] আবার কোনো কোনো অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীরা বিশেষ বাণিজ্যাধিকার ভোগ করত। সীমান্ত অঞ্চলের ফৌজদারদের বিশেষ সুবিধাযুক্ত বাণিজ্যাধিকার ছিল। শ্রীহট্টের চুনের ব্যবসা ছিল ঐ অঞ্চলের ফৌজদারের হাতে। এজন্য অবশ্যই ঐ সব পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেত। বাংলার বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরির গতিপ্রকৃতি আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীকে তিনপর্বে ভাগ করা যায়—প্রথম পর্ব (১৭০০-১৭৩৭)। দ্বিতীয় পর্ব (১৭৩৭-১৭৬৯) ও শেষ পর্ব (১৭৬৯-১৭৯৯)। এক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য ও মজুরি কাঠামোয় পরিবর্তনকে বিভাজন রেখা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

প্রথম পর্বে (১৭০০—১৭৩৭) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যমূল্য খুব কম ছিল বলে সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হল এ পর্বে বাংলার বাজারে টাকার যোগান সব সময় প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকত। অর্থনীতির এক মূল সূত্র হল লোকসংখ্যা, আর্থিক কাজকর্ম, বাণিজ্যের পরিমাণ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে বাজারে মুদ্রার যোগান। তা নাহলে নানারকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এযুগে বাংলার কৃষির অবস্থা ভাল, শিল্প উৎপাদন যথেষ্ট এবং বাণিজ্যের পরিমাণও মন্দ বলা চলে না। এগুলি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বাংলার বাজারে তার সরবরাহ ছিল না। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে এক কোটি টাকা বাংলা থেকে দিল্লীতে রাজস্ব হিসেবে পাঠানো হত। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রাজস্ব যেত বাংলার নিজস্ব রৌপ্য মুদ্রা সিক্কায়। দ্বিতীয়ত মুর্শিদকুলি তাঁর সঞ্চিত টাকায় মণি মুক্তো কিনে

১। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ১১১

গোপন স্থানে রেখে দিতেন।[২] দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোর পর বাংলার বাজারে টাকার যোগান এত কম হয়ে যেত যে টাকার অভাবে আর্থিক লেনদেন প্রায় অচল হয়ে পড়ত। ইউরোপের জাহাজ সোনা রুপো নিয়ে এলে স্বাভাবিক আর্থিক কাজকর্ম আবার শুরু করা যেত। এযুগে বাংলাদেশে বেতন ও মজুরি বেশ কম। কৃষক, শিল্পী, কারিগর ও মজুর তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পেত না এবং সঞ্চয়ও কম হত। পুঁজির অভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন নতুন ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করা সম্ভব হত না। দুঃসময়ে আর্থিক সঙ্গতির অভাবে বাংলার 'মানুষ মেষের মত দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত।'[৩]

মুর্শিদকুলির সময় বাজারে জিনিস পত্রের দাম খুব কম। সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণ থেকে জানা যায় বাজার ও দোকান জিনিসপত্রে পূর্ণ থাকত। প্রধান প্রধান শহর বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হুগলী, ঢাকা ছাড়াও বাংলার সর্বত্র হাট, গঞ্জ ও বাজার ছিল।[৪] ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও হলওয়েল বর্ধমান বাজারের বর্ণনা রেখে গেছেন। এখানে বহু বিদেশী বণিক বাণিজ্য করতে আসত। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে জানা যায় বহু সুন্দর সুন্দর শৌখিন বিলাতী জিনিস বাজারে থাকলেও খরিদ্দারের অভাবে ওসব পড়ে থাকত। এযুগে বাংলার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম কারণ আয় কম। সেটুকু জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে ব্যয় হত। শৌখিন জিনিস কেনার টাকা থাকত না। মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা এ যুগের এক বিশাল বাজার। এখানে শস্যের পাইকারি ব্যবসা থেকে বাণিজ্য শুল্ক হিসেবে বাংলা সরকার বছরে তিনলাখ টাকা পেত। বিজয়রাম সেন বিশারদের 'তীর্থমঙ্গল'-এ এ বাজারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।[৫] এখানে প্রধানত শস্য, তেল ও ঘি পাইকারি বিক্রি হত। ঢাকার রাজনগর এযুগে এরকম আর একটি পাইকারি বাজার। হলওয়েল জানিয়েছেন নাটোর জমিদারিতে অনেকগুলি বাজার ছিল—বোয়ানগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ ও জামালগঞ্জ। নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলি সবই বাজার। কলকাতার শোভাবাজার, শ্যামবাজর, বাগবাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগম বাজার, জানগর, মণ্ডিবাজার প্রভৃতি দশ এগারোটি বাজার ছিল।

মুর্শিদকুলি রাজধানী মুর্শিদাবাদের বাজার, বাজার দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকতেন। এদিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। তিনি তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে বাজারে বিক্রয়যোগ্য সমস্ত পণ্যের মূল্য তালিকা প্রস্তুত করাতেন। গরীব মানুষেরা বাজারে কী দামে জিনসপত্র কেনে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে তিনি উভয় তালিকা মেলাতেন। যদি দেখা যেত গরীব খরিদ্দার এক দাম ও বেশি দাম দিয়ে কোনো জিনিস কিনতে বাধ্য হয়েছে তখনি

২। সলিমুল্লাহ, তারিখ-ই-বাঙ্গালা, ইং অনুবাদ ফ্রান্সিস গ্যাডউইন, পৃঃ ৪৮।
৩। যদুনাথ সরকার সম্পাঃ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যায় একুশ।
৪। জেমস্ রেনেল, দি জার্নালস, পৃঃ ৮৩।
৫। বিজয়রাম সেন বিশারদ, তীর্থমঙ্গল, পৃঃ ৩৯-৪০।

তিনি দোকানী, মহলদার ও ওজনদারদের ডেকে পাঠাতেন। এদের জন্য ছিল কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। গাধার পিঠে চাপিয়ে এদের সারা শহর ঘোরানো হত।

বাংলা দেশের সর্বত্র ও কলকাতায় বাজার, বাজার দর, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মান, ওজন ও মাপ দেখার জন্য নবাব, কোম্পানি ও জমিদারদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী থাকত। কলকাতায় কোতোয়াল, রাজধানী শহরে মহলদার এবং অন্যত্র জমিদারদের কর্মচারীরা বাজারগুলি দেখাশোনা করত। কলকাতায় এ বিষয়ে বেশ খানিকটা কড়াকড়ি ছিল। কোম্পানির বাজার সম্পর্কিত নিয়মরীতি ভঙ্গ করলে, বেশি দাম নিলে, খারাপ জিনিস বিক্রি করলে বা ওজনে কম দিলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।[৬] রাজধানীতে বা বড় বড় শহরে এ ধরনের অপরাধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এ অপরাধ বড় বেশি ছিল এবং এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও শিথিল। একই বাজারে বিভিন্ন পণ্যের জন্য ছিল বিভিন্ন মাপ ও ওজন। পণ্য এক ওজনে কেনা হত, অন্য ওজনে বিক্রি হত। দাঁড়িপাল্লা ও ওজন সবই খরিদ্দার ও উৎপাদকদের ঠকাত। সাধারণভাবে 'বিরাশি ওজন'[৭] ছিল সরকারি ভাবে স্বীকৃত ঠিক ওজন। তবে ব্যবসায়ীরা সব সময় এ ওজন মানত না। ওজনের উপর সরকারি ছাপ মারার ব্যবস্থা ছিল না। খুচরো বেচাকেনার জন্য কড়ি ব্যবহার করা হত।

এ যুগে টাকার ক্রয়ক্ষমতা বেশি থাকাতে বেতন ও মজুরি কম হলেও সাধারণ মানুষের জীবনধারণে কোনো অসুবিধা হত না। মুর্শিদকুলির সময় (১৭০০-১৭২৭) একটাকায় চার থেকে পাঁচমণ মোটা চাল পাওয়া যেত।[৮] এ সময়ে একজন দিন মজুর দৈনিক আয় করত এক পণ বারো গণ্ডা কড়ি। একজন কেরানীর মাসিক আয় চার টাকা ছয় আনা। পুলিশ দারোগার চার টাকা, তাঁতির দেড় টাকা এবং একজন কুশলী কারিগরের দৈনিক আয় দশ পয়সা। এ যুগে একজন করসংগ্রাহক মাসে এক টাকা তেরো আনা, একজন পুলিশ কনেস্টবল একটাকা আট আনা ও একজন রাজমিস্ত্রি দৈনিক দুপণ এক গণ্ডা কড়ি উপার্জন করত।[৯] প্রথমপর্বে বাংলার বাজারে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সস্তা। একমণ চিনির দাম চার টাকা, একমণ তেল দুটাকা, ভালো ঘি সাড়ে দশ সের একটাকা এবং একমণ মাখন সাড়ে চার টাকা। দুটাকায় একজন লোক তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে মাস কাটাতে পারত। রিয়াজ-উস-সালাতীনের লেখক গোলাম হোসেন সলিম লিখেছেন 'এযুগে লোকে এক টাকা ব্যয় করে সারা মাস "কালিয়া পোলাও" খেত। দ্রব্যমূল্য কম থাকার জন্যে গরীবরা শান্তি ও স্বস্তিতে ছিল।'[১০] ১৭৩৭ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে

৬। কোর্টের চিঠি, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬
৭। বিরাশি সিক্কায় একসের।
৮। দ্রঃ সারণী ১
৯। দ্রঃ সারণী ২
১০। গোলাম হোসেন সলিম, রিয়াজ, পৃঃ ২৮০-২৮১।

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেশ সস্তা। এ সময়ে দিল্লী ও গুজরাটের তুলনায় বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের দাম কম। বাংলার সুতীবস্ত্র ও রেশম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমমানের পণ্যের চেয়ে কমদামে সরবরাহ করা যেত। পারস্য ও চীনের রেশম বস্ত্রের চেয়ে বাংলার রেশম বস্ত্র দামে সস্তা। জাভার চিনির চেয়ে কম দামে বাংলার চিনি ভারত ও এশিয়ার বাজারে সরবরাহ করা হত।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আর্থিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ বাজারে জিনিসের দাম কম। বেতন ও মজুরি কাঠামো মূল্যস্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। টাকা দুষ্প্রাপ্য তবে টাকার ক্রয়ক্ষমতা খুব বেশি। এ ধরনের স্থিতিশীল, গতিহীন অর্থনীতিতে মানুষ খেতে পায় তবে আর্থিক অগ্রগতি ঘটে না। এ রকম অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি বড় রকমের অসুবিধা হল অনাবৃষ্টি, বন্যা, ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চয়হীনতার জন্যে দলে দলে সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, এবং উৎপাদক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না, কৃষক ফসলের দাম পায় না এবং কারিগর ও মজুর তার শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। ফলে উৎপাদনে উৎসাহের অভাবে অর্থনীতিতে মন্দা আসে।

দ্বিতীয় পর্বে (১৭৩৭-১৭৬৯) বাংলায় জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এ বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় তিরিশ শতাংশ। কার্পাস, নীল ও খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ে প্রায় চারগুণ।[১১] অন্য সমস্ত জিনিসের দাম আনুপাতিক হারে বেড়েছিল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমস্তরকম বস্ত্রের দাম বেড়েছিল তিরিশ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির হার আরো বেশি। যে চাল ছিল টাকায় চার থেকে পাঁচ মণ তা গিয়ে দাঁড়ালো টাকায় একমণ তিরিশ সের। তেল একমণের দাম পাঁচ টাকা, ময়দা একমণ একটাকা, চিনি একমণ ষোল টাকা ও মাদ্রাজ লবণ একমণ এক টাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারী, শ্রমিক, মজুর ও কারিগরের বেতন ও মজুরি বেড়েছিল।[১২] এ যুগে একজন শ্রমিক বা দিনমজুর দৈনিক দুপণ বারো গণ্ডা কড়ি রোজগার করত। পলাশী যুদ্ধের আগে একজন শ্রমিক বা কুলির মাসিক আয় দাঁড়ায় দু টাকা। এ যুগে একজন নৌকা মাঝির মাসিক আয় তিন টাকা, পিওন ও দারোয়ান দু টাকা, মহিলা শ্রমিক এক টাকা ও ইট মিস্ত্রি তিন টাকা। কলকাতায় বেতন হার অপেক্ষাকৃত বেশি। এখানে একজন রাঁধুনী মাসে পেত পাঁচটাকা, একজন দাসী পাঁচটাকা এবং একজন লস্কর ঐ একই মাসিক বেতন পেত। এ যুগে কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন আনুপাতিক হারে বেড়েছিল তবে শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিকের বেতন তেমন বাড়েনি।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গুদামবাবু চার্লস ম্যানিংহাম ও উইলিয়ম ফ্রাস্কল্যাণ্ড বাংলাদেশে কোম্পানির বাণিজ্য ও পণ্য সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যালোচনাকালে এদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা

১১। দ্রঃ সারণী ৩
১২। দ্রঃ সারণী ৪

বাংলাদেশে প্রতিটি খাদ্যবস্তু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের মতে গত দশ থেকে কুড়ি বছর এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শুরু। তাঁরা আরো দেখেছিলেন 'পণ্য উৎপাদন খরচ ও অন্যান্য অনেক জিনিসের দামের সঙ্গে খাদ্য বস্তুর দামের যোগ আছে।' ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে জিনিসের দামের ঊর্ধ্বগতির সম্পর্ক তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। এর মধ্যে অর্থ-নীতির চিরন্তন সত্যটি নিহিত। সরবরাহ কম থাকায় সুতো ও খাদ্যবস্তুর দাম বাড়ছে, ফলে সুতীবস্ত্রের দাম বাড়ছে। সরবরাহ কম হওয়ার কারণ মারাঠা আক্রমণ, ঝড়, বন্যা ও ফসলের ক্ষতি। এ যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার দরের একটি দিক তাঁরা বুঝতে পারেননি। বাজারের টাকার যোগানের সঙ্গে (quantity theory of money) মূল্যস্তরের সম্পর্ক। ১৭২০ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার কাঁচা-রেশম ও সুতীবস্ত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যায়। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও এ সময় লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায় এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপো বাংলার টাঁকশালে নিয়ে আসে। এজন্যে যে বাংলার আর্থিক কাজকর্ম অনেকগুণ বেড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্যে বাংলায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলির দাম কিছুটা বেড়েছিল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলায় চালের দাম হঠাৎ বাড়তে শুরু করে। ১৭৪৪ ও ১৭৫৩ সনে বাংলাদেশে চালের দাম সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। তারপর আবার কিছুটা নেমে এসে স্থিতিশীল হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার দ্রব্যমূল্যস্তরে ঊর্ধ্বগতির একটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা—এশীয় ও ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। বিদেশীরা নগদ টাকায় বাংলার বাজারে পণ্য কিনত। বাঙালীর হাতে বেশি টাকা আসায় অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ল। এর ফলে মূল্যস্তরের উপর চাপ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।[১৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্তর এবং সেই সঙ্গে মজুরি ও বেতন ক্রমাগত পড়তে থাকে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি চরম আকার ধারণ করেছিল। ঐ বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মূল্যস্তর কিছুটা নিম্নমুখী হয়। পলাশীর পর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলিতে কোম্পানির কর্মচারীরা একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করায় মূল্যসূচক আবার বাড়তে থাকে। এ পর্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণগুলিকে সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

(১) ১৭৩৭-এর ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রবল ঝড় হয়। এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এর পরের বছর প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৭৫২-র ২০ নভেম্বর কলকাতায় প্রেসিডেন্ট রজার ড্রেককে লেখা গোবিন্দরাম মিত্রের

১৩। কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ৯৯-১০৮।

চিঠিতে।[১৪] ১৭৫১-র এপ্রিল মাসের বৃষ্টিতে দেশে বন্যা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। ঐ বৃষ্টিতে দেশের নীচু অঞ্চল ডুবে যায়, শস্যহানি ঘটে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

(২) ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত বাংলাদেশে চলেছিল বর্গীর বা মারাঠা আক্রমণ। এ আক্রমণ পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকলেও সামাজিক ভাবে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। হলওয়েল জানিয়েছেন 'বাংলায় মারাঠা আক্রমণ যুদ্ধের সমস্তরকম ধ্বংসাত্মক কুফল নিয়ে দেখা দিয়েছিল'। খাদ্যশস্যের অভাব, মজুরি বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি মারাঠা আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল।[১৫] বাঙ্গালী কবি গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' মারাঠা আক্রমণের ফলে বর্ধমান অঞ্চলে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মারাঠা আক্রমণ রুখতে বাংলা সরকারকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় এবং মোটা টাকা সৈন্য বাহিনীর বেতন হিসাবে ব্যয় হয়। এরই মধ্যে বিহারে দেখা দেয় আফগান বিদ্রোহ (১৭৪৫, ১৭৪৮)। সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয় এবং নবাবদের প্রতিবছর বহুমূল্য হীরে, মতি, জহরত কিনে টাকা জমানোর প্রবণতা আর দেখা গেল না। এজন্যে বেশ কিছু টাকা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে এল।

(৩) বাংলা সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা সায়ের খাতে আদায় করতে শুরু করে দেয়। স্থানীয় শুল্কের জন্য স্থানীয় বাজারে ভোগ্য পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলে।

(৪) এ যুগে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বাংলার বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতীবস্ত্র, কাঁচারেশম ও রেশম বস্ত্র কিনত। তাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের রীতি অনুযায়ী জিনিস-পত্রের দাম বাড়তে থাকে। ১৭৫২-তে ফরাসিদের প্রতিযোগিতার জন্যে ঢাকায় সুতীবস্ত্রের দাম বেড়েছিল।[১৬]

(৫) এর সঙ্গে ছিল বিদেশীদের আনা বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপো। বাংলার বাজারে টাকার যোগান বেশি হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা গেল।

(৬) পলাশী-উত্তর কালে (১৭৫৭-৬৯) বাংলার বাজারেও কতকগুলি নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যে ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতিলাভের আশায় পরিচালিত বেসরকারি ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ফলে বাংলার বাজারে জিনিস-পত্রের দাম বেড়েছিল। জিনিসের দাম বাড়লে মূল্য-সূচক বাড়ে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বেতন, মজুরি ইত্যাদিও বেড়ে চলে। ১৭৩৭ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে এ ধারাটি অব্যাহত ছিল।

১৭৩৭ থেকে ১৭৬৯ পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক জীবন অনেক বেশি গতিশীল। মূল্য ও মূল্যস্তর ক্রমবর্ধমান। বেতন ও মজুরিও ঊর্ধ্বগতি। অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার যোগান অনেক বেশি। এ পর্বে বাংলার অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও

১৪। গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতায় কোম্পানির রাজস্বের ম্যানেজার ছিলেন।
১৫। জে. জেড. হলওয়েল, ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস্, পৃঃ ১৫১।
১৬। কনসালটেশনস, ১১ ডিসেম্বর ১৭৫২।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে চলে। বাঙালীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ে। খাদ্যশস্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষি ও শিল্পে নতুন করে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়াতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যুগে বাংলার আর্থিক চিত্রের একটি ভাল দিক হল দেশে বেকারত্ব ছিল না। দেশে এসময় প্রচুর কাজ এবং যথেষ্ট শ্রমিক ও কারিগরের প্রকৃত অভাব ছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের শুরুতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট সংখ্যায় কাজের লোক জোগাড় করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৭] ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশ নেগ্রাইতে কিছু কুশলী কারিগরের প্রয়োজন হওয়ায় বাংলা থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। তাদের দরকার ছিল মিস্ত্রি, কর্মকার, ছুতোর, পাথর মিস্ত্রি, ইট মিস্ত্রি, কুলি প্রভৃতি। কর্মকার, ছুতোর ও মিস্ত্রি নেগ্রাই যেতে রাজী হল না। ইট মিস্ত্রি ও কুলি পাওয়া গেল বটে তবে তারা মজুরি চাইল দুগুণ এবং তার সঙ্গে দৈনিক ভাতা হিসেবে চাল, ডাল, ঘি, লবণ ইত্যাদি।[১৮] এ থেকে অনুমান করা যায় এ যুগে বাংলাদেশে এ শ্রেণীর কর্মীদের কাজের অভাব হত না।

শতাব্দীর শেষ তিনদশকে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তার অর্থনৈতিক প্রভাব। এই মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায় ও এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে যায়। তবে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা যায় না। ১৭৭১-এ সংগৃহীত রাজস্ব ১৭৬৮-র রাজস্ব থেকে সামান্য বেশি ছিল।[১৯] ১৭৬৮ ও ১৭৬৯-এ প্রচণ্ড খরায় শস্যহানি ঘটে। তার উপর কোম্পানির নায়েব, দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁর জবরদস্তি রাজস্ব আদায়ের ফলে দেশে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ মহাদুর্ভিক্ষের সময় রেজা খাঁ ও কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা খাদ্যশস্যের ব্যবসায় ফাটকাবাজি (speculation) করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন বলে অভিযোগ আছে। একটি সমকালীন ছড়ায় এ সময়কার অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল ॥
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে ॥
একচেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর ॥[২০]

১৭। সি. আর. উইলসন, দ্য বিল্ডিং অব দ্য প্রেজেণ্ট ফোর্ট উইলিয়ম, ক্যালকাটা রিভিয়্যু, জুলাই, ১৯০৪ পৃঃ ৩৭৬।
১৮। বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস্, ৩ জুলাই ১৭৫৩, জে. লঙ্, ঐ, পৃঃ ৫৪-৫৫।
১৯। ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার, এ্যানালস্, পৃঃ ৫৬।
২০। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃঃ ৮৬।

দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, উৎপাদন হ্রাস, বেকারত্ব, একচেটিয়া ব্যবসা, মূল্যবৃদ্ধি এযুগে বাংলা বাজারের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোম্পানি কতকগুলি পণ্যে—লবণ, আফিম, সোরা ইত্যাদি—একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। কোম্পানির কর্মচারীরা স্বনামে ও বেনামে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে যায় আর শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বৃটিশ বণিকরা বৈদেশিক বাণিজ্যে কোম্পানির প্রতিযোগী হিসেবে দেখা দেয়। এদের প্রতিযোগিতার জন্যে কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি দামে সুতীবস্ত্র ও রেশম কিনতে বাধ্য হয়।

শেষ পর্বে (১৭৬৯-১৭৯৯) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এযুগে মোটা চালের দাম টাকায় ষোল সের, গম টাকায় বত্রিশ সের, তেল টাকায় ছয় সের এক পোয়া, ঘি টাকায় তিন সের। লবণ একমণ আড়াই থেকে তিন টাকা। সিল্ক এক সের আট থেকে নয় টাকা এবং একটি গরুর দাম পাঁচ টাকা।[২১] দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে বেতন ও মজুরি বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। জেলা কালেক্টরিতে একজন নায়েব মাসে পেতেন একশ টাকা, একজন কেরানী দশ টাকা, একজন পিওন চার টাকা ও একজন দপ্তরি সাড়ে তিন টাকা। এ যুগে একজন তাঁতি মাসে আড়াই থেকে সাড়ে সাতটাকা পর্যন্ত রোজগার করত। একজন সুতো কাটুনীর মাসিক আয় এক টাকা ছয় আনা থেকে এক টাকা চার আনা। কলকাতায় একজন ধোপার মাসিকবেতন চারটাকা ছয় আনা, দরজীর তিন টাকা ছয় আনা, নাপিতের সাড়েপাঁচ টাকা এবং রাঁধুনীর আট থেকে পনেরো টাকা।[২২] এযুগে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সারা মাসের খরচ হল এক টাকা।[২৩] এক টাকায় একজন মানুষের একমাসের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যবস্তু কেনা যেত।

এযুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের অপর বৈশিষ্ট্য হল কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করে এদেশের তাঁতিদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে তার প্রয়োজনীয় বস্ত্র বানিয়ে নিত। কোম্পানি যে পারিশ্রমিক তাঁতিদের দিত তারও একাংশ গোমস্তারা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করত। কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের জবরদস্তি ব্যবসায় ঢাকা, সোনারগাঁ ও শান্তিপুরের তাঁতিদের ১৭৭০ দশকের পারিশ্রমিক ১৭৪০ ও ১৭৫০ দশকের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হয়ে যায়। বিহারের আফিম চাষীদেরও এদশা হয়েছিল।[২৪] পলাশীর আগে তারা সাধারণত একসের আফিমের জন্যে কমপক্ষে দু টাকা পারিশ্রমিক পেত। শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সাধারণভাবে তাদের পাওনার হার হল সের প্রতি এক টাকা নয় আনা।[২৫] ষাটের দশকে বাংলা দেশের লবণ শ্রমিক মালঙ্গিদের মজুরির হার একেবারেই বাড়েনি। আগের দশকের হারে স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল।

২১। দ্রঃ সারণী ৫।
২২। দ্রঃ সারণী ৬।
২৩। প্রসিডিংস, বোর্ড অব ট্রেড, ১৪ মার্চ, ১৭৮৭।
২৪। এন. কে. সিংহ. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-৬৮।
২৫। বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড ৮৭, ১৯৬৮।

## সারণী—১

### প্রথম পর্বের (১৭০০-১৭৩৭) দ্রব্যমূল্য

| সময় ঃ ১৭০০-১৭২২ | পরিমাণ | | দাম | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জিনিস | মণ | সের | টাকা | আনা | পয়সা | পণ | গণ্ডা |
| চাল (ভাল) | ২ | — | ১ | — | | | |
| চাল (মোটা) | ৪/৫ | — | ১ | — | | | |
| চিনি | ১ বেল = ২ মণ | ১৩ | ৯/১০ | — | | | |
| মাখন | ১ | — | ৪/৫ | | | | |
| তেল | ১ | — | ১-১২ আনা—২ টাকা | | | | |
| লম্বা লংকা | ১ | — | ৪/৫ | | | | |
| লংকা | ১ | — | ১২ | ১২ | | | |
| বাদাম | ১ | — | ৫ | ১ | | | |
| কিসমিস | ১ | — | ৩ | ৬ | | — | |
| শুকনো আঙ্গুর | ১ | — | ৪ | ২ | | — | |
| নভেম্বরবন্দ সিল্ক | — | ১ | ৪ | ২ | | — | |
| ব্রড ক্লথ (বিদেশী) সাধারণ | | ১ গজ | ২ | — | | | |
| সোরা | ১ | | ৫ | ৩ | | — | |
| সীসা | ১ | | ৪ | ২ | | — | |
| সাদা সীসা | ১ | | ২০ | — | | — | |
| চকমকি পাথর | | ১ পাউন্ড | — | ৯ | | — | |
| মাদেরা মদ ১ পাইপ | | | ১২৬-১৭৮ | ৯ | | ৯ | |
| সময় ঃ ১৭২৯ | | | | | | | |
| বাঁশফুল ভাল চাল ১নং | ১ | ১০ | ১ | — | | | |
| চাল ২নং | ১ | ২৩ | ১ | — | | | |
| চাল ৩নং | ১ | ৩৫ | ১ | — | | | |
| দেশনা চাল (মোটা) | ৪ | ১৫ | ১ | — | | | |
| পূর্বী চাল (মোটা) | ৪ | ২৫ | ১ | — | | | |
| মুনসারা চাল (মোটা) | ৫ | ২৫ | ১ | — | | | |
| কুরকাশালী চাল (মোটা) | ৭ | ২০ | ১ | — | | | |
| গম ১নং | ৩ | — | ১ | — | | | |
| গম ২নং | ৩ | ৩০ | ১ | — | | | |
| যব | ৮ | — | ১ | — | | | |
| ভেনট (ঘোড়ার খাদ্য) | ৪ | ৩৫ | ১ | — | | | |
| তেল ১নং | | ২১ | ১ | — | | | |
| তেল ২নং | | ২৪ | ১ | — | | | |
| ঘি ১নং | | ১০$\frac{১}{২}$ | ১ | — | | | |
| ঘি ২নং | | ১১$\frac{১}{৪}$ | ১ | — | | | |

সূত্র ঃ ডায়েরি এ্যান্ড কনসালটেশন বুক ১৭০৮-১৭২২, ও সিক্সথ্ রিপোর্ট, ১৭৮২, সংযোজন ১৫।

## সারণী—২

### প্রথম পর্বের (১৭০০-১৭৩৭) বেতন মজুরি।

| পদ | বেতন মাসিক | দৈনিক | টাকা | আনা | পয়সা | কাড়ি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কেরানী | ,, | | ৪ | ৬ | — | |
| পুলিশ দারোগা | ,, | | ৪ | — | — | |
| রাজস্ব আদায়কারী | ,, | | ১ | ১৩ | — | |
| পুলিশ কনেস্টবল | ,, | | ১ | ৮ | — | |
| তাঁতি | ,, | | ১ | ৮ | — | |
| সাধারণ মজুর/কুলি | | ,, | | | | ১ পণ ১২ গণ্ডা কাড়ি |
| রাজমিস্ত্রি | | ,, | | | | ২ পণ ১ গণ্ডা কাড়ি |
| কুশলী কারিগর | | ,, | — | — | ১০ | — |
| ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় কর্মচারীদের বেতন | | | | | | |
| কোতয়াল | ,, | | ৪ | — | — | |
| কেরানী | ,, | | ৪ | ১০ | — | |
| পিওন | ,, | | ২ | ১ | — | |
| পাইক | ,, | | ১ | ৯ | — | |
| করসংগ্রাহক | ,, | | — | ৯ | — | |
| ড্রামার ও পাইপার | ,, | | ১ | ১২ | — | |
| হালালদোর | ,, | | — | ১২ | — | |
| শিকদার | ,, | | ৩ | ৪ | — | |
| মণ্ডল | ,, | | ২ | — | | |
| পাটোয়ারি | ,, | | ২ | — | | |
| ভকিল | ,, | | ৫ | — | | |
| কাহার (পালকি বাহক) | ,, | | ১ | — | | |
| চোপদার | ,, | | ৩ | — | | |
| ধোবা | ,, | | ২ | — | | |
| নাপিত | ,, | | ২ | ৮ | | |
| গুয়ালি | , | | ৩ | — | | |
| পতাকাবাহক | ,, | | ২ | ৮ | | |
| মালি | ,, | | ২ | — | | |
| মির্ধা | ,, | | ৩ | — | | |
| মশালচি | ,, | | ২ | — | | |
| সারেঙ্গ | ,, | | ১০ | — | | |
| টানডেল (ছোট অফিসার) | ,, | | ৮ | — | | |
| লস্কর | ,, | | ৫ | — | | |
| কলকাতার মেয়র কোর্টের কর্মচারীদের বেতন। | | | | | | |
| দোভাষী | ,, | | ২০ | — | | |
| দেশী কোর্টসার্জেণ্ট | ,, | | ২ | ৪ | — | |
| অল্ডারম্যান | ,, | | ১৫ | — | | |
| ইউরোপীয় কোর্ট সার্জেণ্ট. | ,, | | ১০ | — | — | |
| ব্রাহ্মণ | ,, | | ৩ | ৪ | — | |
| ক্যাশিয়ার | ,, | | ৫ | — | | |
| মেথর | ,, | | ১ | — | | |

সূত্র : ডায়েরি এ্যাণ্ড কনসালটেশন বুক ১৭০০-১৭২২, সি. আর. উইলসন, আরলি এ্যানালস্ অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, চার খণ্ড, জেমস্ লঙ্ ঐ, পৃ, ৪২, ৫৪, ৬২; কনসালটেশনস্ ২৫ মার্চ ১৭২৩।

## সারণী—৩

### দ্বিতীয় পর্বের (১৭৩৭-১৭৬৯) দ্রব্যমূল্য

| সময়ঃ | জিনিস | পরিমাণ | | দাম | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মণ | সের | টাকা | আনা | পয়সা | কড়ি |
| ১৭৩৮ঃ | চাল | ২—২০—৩ মণ | | ১ | — | | |
| | কার্পাস | ১ | | ২—২ | ৮ | — | |
| ১৭৫১ ৫২ঃ | চাল | ১—৩২ ১—১৬ সের | | ১ | — | | |
| | অন্যান্য শস্য | ১—১—১২ সের | | ১ | — | | |
| | গম | ১—৩২—১—৬ সের | | ১ | — | | |
| | ময়দা | ১—৩ সের—১ মণ | | ১ | — | | |
| | তেল | ১ | | ৫ | — | | |
| | নীল | ১ | | ২২ | — | | |
| | কার্পাস | — | ২৫ | ১ | — | | |
| | কাশিমবাজার সিল্ক | | ১ | ৫ | ৮ | — | |
| | সোরা | ১ | | ৪ | ৮ | — | |
| | জ্বালানি কাঠ | ১০০ | | ১০ | — | | |
| ১৭৩৭ ৫৭ : | তামাক | ১ | | ১০ | — | | |
| | টিন | ১ | | ২৪ | — | | |
| | ইট | ১ হাজার | | ৩ | ১০ | — | |
| | চুণ | ১০০ মণ | | ৩৯ | — | | |
| | মিষ্টি | | ১ | | | ১ কাহন কড়ি | |
| | পান | দুপণ | | | | ২০ গণ্ডা কড়ি | |
| ১৭৫৯ঃ | লবঙ্গ | | ১ | ১৬ | — | | |
| | জৈত্রি | | ১ | ১২ | ২ | — | |
| | জায়ফল | | ১ | ৬ | — | — | |
| | লংকা | ১ | | ২৫ | — | | |
| | দারুচিনি | | ১ | ৫ | — | | |
| | বাদাম | ১ | | ২৫ | — | | |
| | শুকনো কিসমিস | ১ | | ৬০ | — | | |
| | দড়ি | ১ | | ১২ | — | | |
| | সাদাসীসা | ১ | | ৮ | — | | |
| | মোম | ১ | | ৩২ | — | | |
| | হিং | ১ | | ১০০ | | | |
| | চিনি | ১ | | ১৬ | — | | |
| | পারদ | | ১ | ২ | ১২ | — | |
| | ইউরোপের লোহা | ১ | | ৯ | ৮ | — | |
| | ইস্পাত | ১ | | ১৫ | — | | |
| | মাদ্রাজ লবণ | ১০০ | | ১০০ | — | | |
| ১৭৬০ঃ | চাল | ২ | ২০ | ১ | আর্কট টাকা। | | |
| | তেল | ১ | | ২ | ৮ | ,, | |
| | তুলা | | ১ | | | ৪-৫ পণ কড়ি | |
| | সিল্ক | | ১ | ৬—১০ | | | |

সূত্রঃ কনসালটেশনস, ১১ ডিসেম্বর ১৭৫২. গোবিন্দরাম মিত্রের চিঠি, ২০ নভেম্বর, ১৭৫২ ; প্রসিডিংস, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৫৭ ; প্রসিডিংস, ১৫ জানুয়ারী ১৭৫৯ ; প্রসিডিংস, ১ নভেম্বর ১৭৫৯ ; ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, মালিনীর বেসাতি পৃঃ ১৩।

## সারণী—৪

## দ্বিতীয় পর্বের ( ১৭৩৭-১৭৬৯ ) বেতন/মজুরি

| | | | বেতন | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সময়ঃ | পদ | মাসিক | দৈনিক | টাকা | আনা | পয়সা |
| ১৭৩৯ঃ | ইট মিস্ত্রি | ,, | | ৩ | — | |
| | ছুতোর | ,, | | ২ | ১৫ | |
| | মহিলা শ্রমিক | ,, | | ১ | — | |
| | কুলি/মজুর | ,, | | ২ | — | |
| | নৌকা মাঝি | ,, | | ৩ | — | |
| | পিওন | ,, | | ২ | ৮ | |
| | দারোয়ান | ,, | | ২ | ৮ | |
| | ধোপা | ,, | | ১০ | — | |
| | নাপিত | ,, | | ৩ | — | |
| | মশালচি | ,, | | ২ | — | |
| ১৭৫৯ঃ | চোপদার | ,, | | ৫ | — | |
| | প্রধান রাঁধুনী | ,, | | ৫ | — | |
| | কোচম্যান | ,, | | ৫ | — | |
| | প্রধান দাসী | ,, | | ৫ | — | |
| | জমাদর | ,, | | ৪ | — | |
| | খিতমতগার | ,, | | ৩ | — | |
| | রাঁধুনীর প্রধান সহায়ক | ,, | | ৩ | — | |
| | হেড বেয়ারার | ,, | | ৩ | — | |
| | দ্বিতীয় দাসী | ,, | | ৩ | — | |
| | পিওন | ,, | | ২ | — | |
| | পরিবারের ধোপা | ,, | | ৩ | — | |
| | একজনের ধোপা | ,, | | ১ | ৮ | |
| | সহিস | ,, | | ১ | — | |
| | নাপিত | ,, | | ১ | ৮ | |
| | হেয়ার ড্রেসার | ,, | | ১ | ৮ | |
| | গৃহমালী | ,, | | ২ | — | |
| | ঘাসুড়ে | ,, | | ১ | ৪ | |
| | নার্স | ,, | | ৪ | | |
| | সারেঙ্গ | ,, | | ১০ | — | |
| ১৭৬০ঃ | তাঁতি | ,, | | ১ | ৮ | |
| ১৭৬৭ঃ | কুলি | ,, | | ২—১২—৩ টাকা | | |

সূত্রঃ কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকর্ডস্, ৫ম খণ্ড, ১৭৩৯; ১৭৫৯, সনে কলকাতার জমিদার বীকার, হ্লাঙকল্যাণ্ড ও হলওয়েল প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের কাছে ১৭৫৯ সনের বেতনহার সুপারিশ করেছিলেন। প্রসিডিংস, ২০ মার্চ ১৭৫৯ ; প্রসিডিংস, ২০ নভেম্বর ১৭৬৭।

## সারণী—৫

### শেষ পর্বের (১৭৬৯-১৭৯৯) দ্রব্যমূল্য

| সময় | জিনিস | পরিমাণ | | দাম | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মণ | সের | টাকা | আনা | পয়সা | কাঁড়ি |
| ১৭৭৬ : | বাঁশফুল ভাল চাল ১নং | | ১৬ | ১ | — | | |
| | চাল ২নং | | ১৮ | ১ | — | | |
| | চাল ৩নং | | ২১ | ১ | — | | |
| | বেশনা চাল (মোটা) | | ৩২ | ১ | – | | |
| | পুর্বী (মোটা) | | ৩৭ | ১ | | | |
| | মুনসুরা (মোটা) | ১ | | ১ | – | | |
| | কুর্শালী (মোটা) | ১ | ১০ | ১ | -- | | |
| | গম ১নং | | ৩২ | ১ | — | | |
| | গম ২নং | | ৩৫ | ১ | | | |
| | যব ১নং | ১ | ১৩ | ১ | — | | |
| | ভেনট (ঘোড়ার খাদ্য) | | ২০-২২ | ১ | — | | |
| | তেল ১নং | | $৬^{১}$ | ১ | — | | |
| | তেল ২নং | | $৬\frac{৩}{৪}$ | ১ | — | | |
| | ঘি ১নং | | ৩ | ১ | — | | |
| | ঘি ২নং | | ৪ | ১ | - | | |
| ১৭৯৫ : | চাল, গম, যব | ১ | | — | ১২ | | -- |
| | ঘি | | ১ | — | ৩ | | — |
| | গরু | ১টি | | ৫ | - | | |
| ১৮০০ : | চাল | | ২০ | ১ | আর্কট টাকা। | | |
| | তেল | ১ | | ৪ | সিক্কা টাকা। | | |
| | তুলা | | ১ | | | | ৯ পণ কাঁড়ি |
| | লবণ | ১ | | | ২- ৮'৩ টাকা | | |
| | নীল | | ১ | | ৫ | ৮ | — |
| | আফিম | ১ চেস্ট | | | ৩২০ | | — |
| | বেংগল সিল্ক | | ১ | | ৮-৯ টাকা | | |
| | ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তৈরি সিল্ক | | ১ | | ১২-১৪ টাকা | | |
| | সোরা | ১ | | | ২-২-৮ আনা | | |

সূত্র : সংযোজন ১৫, সিক্সথ্ রিপোর্ট, ১৭৮২ ; এন. কে সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৯।

## সারণী—৬

### শেষ পর্বের ( ১৭৬৯-১৭৯৯ ) বেতন/মজুরি।

| সময় : | পদ | বেতন | মাসিক | টাকা | আনা |
|---|---|---|---|---|---|
| | ( নিজামত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন ) | | | | |
| ১৭৭২ : | দারোগা | ,, | ,, | ৩০০ | — |
| | ফৌজদার | ,, | ,, | ২০০ | — |
| | মুফতি | ,, | ,, | ১৫০ | — |
| | মৌলভী | ,, | ,, | ১০০ | — |
| | নায়েব ফৌজদার | ,, | ,, | ১০০ | — |
| | মুন্সী | ,, | ,, | ৬০ | — |
| | ভকিল | ,, | ,, | ৫০ | — |
| | মোহরার | ,, | ,, | ২০ | — |
| | ( খালসা বিভাগের কর্মচারীদের বেতন ) | | | | |
| | মোহরার | ,, | ,, | ১৫ | ৫ |
| | পোদ্দার | ,, | ,, | ১৫ | ৫ |
| | পিওন | ,, | ,, | ৪ | — |
| | জমাদার | ,, | ,, | ১০ | — |
| | ফরাস | ,, | ,, | ৫ | — |
| | মির্ধা | ,, | ,, | ২৫ | — |
| | মশালচি | ,, | ,, | ৩ | — |
| | ঝাড়ুওয়ালা | ,, | ,, | ২ | — |
| | দপ্তরি | ,, | ,, | ৭ | — |
| ১৭৭৩ : | জেলা কালেক্টরিতে কর্মীদের বেতন | | | | |
| | নায়েব | ,, | ,, | ১০০ | — |
| | পেশকার | ,, | ,, | ৫০ | — |
| | সেরিস্তাদার | ,, | ,, | ২৫ | — |
| | কেরানী | ,, | ,, | ১০ | — |
| | মুন্সী | ,, | ,, | ১০ | — |
| | খাজাঞ্চী | ,, | ,, | ২৫ | — |
| | খাজাঞ্চীর কেরানী | ,, | ,, | ১০ | — |
| | পোদ্দার | ,, | ,, | ৫ | — |
| | ভকিল | ,, | ,, | ৩০ | — |
| | জমাদার (হেডপিওন) | ,, | ,, | ১০ | — |
| | পিওন | ,, | ,, | ৪ | — |
| | দপ্তরি | ,, | ,, | ৩ | ৮ |
| | ফরাস | ,, | ,, | ৫ | — |

## সারণী—৬

| সময় : | পদ | বেতন | মাসিক | আর্কট টাকা | আনা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭৭৪ : | খানসামা | ,, | ,, | ৮ | ১৫ |
| | বাটলার | ,, | ,, | ৫ | ৮ |
| | খিতমতগার | ,, | ,, | ৪ | ৬ |
| | রাঁধুনী | ,, | ,, | ৮ | ১৫ |
| | ঐ সহকারী | ,, | ,, | ৩ | ৬ |
| | মশালচি | ,, | ,, | ৩ | — |
| | বেনিয়ান | ,, | ,, | ২ | ৩ |
| | পিওন ও হরকরা | ,, | ,, | ৩ | ৪ |
| | একাধিক ব্যক্তির | | | | ৬ |
| | চুলকাটা নাপিত | ,, | ,, | ২ | — |
| | পরিবারের নাপিত | ,, | ,, | ৫ | ৮ |
| | হেড বেয়ারা | ,, | ,, | ৫ | — |
| | অন্য বেয়ারা | ,, | ,, | ৩ | — |
| | দাড়ি কাটা নাপিত | ,, | ,, | ২ | — |
| | ঐ পরিবারের | ,, | ,, | ৪ | — |
| | হুকাবরদার | ,, | ,, | ৫ | — |
| | সরদার মালী | ,, | ,, | ৪ | — |
| | ঐ সহকারী | ,, | ,, | ৩ | — |
| | কোচম্যান | ,, | ,, | ৬ | ৮ |
| | সহিস | ,, | ,, | ৩ | ৪ |
| | ঘাসুড়ে | ,, | ,, | ২ | — |
| | একজনের ধোপা | ,, | ,, | ২ | — |
| | ইস্ত্রিকারী | ,, | ,, | ২ | ৩ |
| | পরিবারের ধোপা | ,, | ,, | ৪ | ৬ |
| | পরিবারের ইস্ত্রিকারী | ,, | ,, | ৪ | ৬ |
| | দরজী | ,, | ,, | ৩ | ৬ |
| | তাঁতি | ,, | ,, | ২/২-৮/৭-৮ আনা | |
| | সুতা কাটুনী | ,, | ,, | ১-৬/১-৪ আনা | |

সূত্র : আর. বি. র‍্যামসবোথাম, ঐ, পৃঃ ৪৮, ফিফথ্ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১, গৌতম ভদ্র, ঐ পৃঃ ৩১-৩২।

## ১৪

# স্থল ও জলপথ, পরিবহন ও যোগাযোগ

রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে একটি দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাজার, ধনোৎপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক ও আর্থিক কাজকর্ম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।[১] অন্যভাবে বলতে গেলে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সে দেশের পথঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। ভ্যালেন্টিনের গ্রন্থে প্রকাশিত ভ্যানড্যানব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০) তৎকালীন বাংলার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বা সড়কের উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র অনেক বড় বড় রাস্তা, নদীপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র বাংলাকে যুক্ত করে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জেমস্ রেনেলের 'ডেসক্রিপসন অব দ্য রোডস ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার' গ্রন্থে বাংলার প্রধান রাস্তাগুলির উল্লেখ আছে। এযুগে বাংলার প্রধান চারটি কর্মকেন্দ্র হল কলকাতা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। এগুলির সঙ্গে উত্তরে নেপাল ও ভুটান: দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণ পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও ছোটনাগপুর, পশ্চিমে কাশী ও গাজীপুর, উত্তর পশ্চিমে বিহারের বাতিয়া, উত্তর পূর্বে শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া ও খাসপুর এবং দক্ষিণ পূর্বে চট্টগ্রাম, রাজঘাট এবং জুলকুন্দার সংযোগ ছিল।[২] প্রধান প্রধান শহরগুলি ছাড়াও অনেক অপ্রধান ও কম গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানের বেশ ভাল সড়ক যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। বর্ধমান থেকে দুটি প্রধান সড়ক চন্দননগর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছিল।[৩] এর মধ্যে একটি শেরশাহ্ নির্মিত বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। বর্ধমান থেকে অনেকগুলি রাস্তা ধনিয়াখালি. তমলুক, বজবজ, নদীয়া, জলঙ্গী, রাজমহল, রাধানগর, চন্দ্রকোনা এবং গঙ্গা ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল সুতীর কাছে ফারুকাবাদ পর্যন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর হয়ে জলেশ্বর পর্যন্ত সড়কটি বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত। বাংলার নবাবদের সৈন্যবাহিনী এ পথে উড়িষ্যায় যাতায়াত করত। তেমনি এযুগে বাংলার সিল্কের বড় ঘাঁটি কাশিমবাজারের সঙ্গে একাধিক স্থানের ভাল যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। কাশিমবাজার থেকে রাজমহল হয়ে পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত ২৮১ মাইল লম্বা এক দীর্ঘ রাস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া কাশিমবাজার থেকে অনেকগুলি রাস্তা বর্ধমান, জলঙ্গী, ঢাকা, রামপুর বোয়ালিয়া, মীনখোত, দিনাজপুর, বালিটুভিখ, বীরভূম, মালদা, রংপুর, রাঙামাটি,

১। ডব্লিউ. টি. জ্যাকম্যান, ডেভেলপমেণ্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইংল্যাণ্ড, লণ্ডন, ১৯৬২, ভূমিকা।

২। জেমস রেনেল, ডেসক্রিপসন অব দ্য রোডস ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার, পৃঃ ১০-৬৯।

৩। জেমস্ রেনেল, দ্য জার্নালস্, পৃঃ ৯৭-১০৮।

গোয়ালপাড়া, বীরকীর্তি, কান্দি ও সুরুল (বীরভূম) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[৪] কলকাতা থেকে কাশিমবাজার হয়ে রাজমহলের মধ্য দিয়ে পাটনা পর্যন্ত রাস্তা ৫২২ মাইল দীর্ঘ। এ পথেই এলাহাবাদ ও মথুরার মধ্য দিয়ে দিল্লী-আগ্রা যাওয়া যেত। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দূত জন সুরমান (John Surman) সম্রাট ফারুখশিয়ারের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে এ পথেই দিল্লী গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে হলে ইছামতী, পদ্মা ও ধলেশ্বরীর ৩৮২$\frac{1}{8}$ মাইল জলপথ পাড়ি দিতে হত।[৫] লখিয়া ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দিয়ে ঢাকা থেকে গোয়ালপাড়ার জলপথ ২৮৯ মাইল দীর্ঘ। ফেণী নদী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জলপথের দৈর্ঘ্য ৪৯ মাইল আর ঢাকা থেকে লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালি) ৬৭ মাইল। ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা, ছোট মেঘনা, মেঘনা ও সুরমা নদী বেয়ে শ্রীহট্টে যেতে হলে ২৭৫ মাইল জলপথ পাড়ি দিতে হত। বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তা ছাড়াও জেলার মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগের অনেক রাস্তা ছিল। রেনেল বীরভূম জেলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অনেকগুলি রাস্তার উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রধান হল নাগর থেকে দেওঘর, কুমিরাবাদ, মানুতি ও মরাগ্রাম রাস্তা। নাগর থেকে তিনটি রাস্তা বেরিয়ে সিউড়ীতে শেষ হয়েছিল। এখান থেকে কৃষ্ণনগর, ইলামবাজার, উখাড়া, পাচেট (রাণীগঞ্জ) ও সুপুর পর্যন্ত রাস্তা ছিল। এছাড়া আরো অনেক ছোটবড় রাস্তা বীরভূম জেলার অভ্যন্তরে ভাল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

বড় বড় শহর কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বর্ধমান ও ঢাকার মধ্যে একাধিক প্রশস্ত রাজপথ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এ রাস্তাগুলির বেশির ভাগ সব ঋতুতে ব্যবহার করা যেত। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি হল ঃ (১) কলকাতা থেকে যশোর ও ফরিদপুরের মধ্য দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত রাস্তা। এ রাস্তায় যেতে হলে অনেক নৌকাফেরি পার হতে হত। (২) কলকাতা থেকে দমদম-বারাসাত হয়ে মুর্শিদাবাদ রাস্তা ; (৩) বর্ধমান থেকে কাটোয়া হয়ে মুর্শিদাবাদ ; (৪) মেদিনীপুর থেকে কলকাতা ; (৫) কলকাতা থেকে সাঁওতাল পরগনার পাচওয়ারি ও পাঁকুড় পর্যন্ত রাস্তা ও (৬) বর্ধমান থেকে হুগলী রাস্তা।[৬] বারাসাত থেকে যশোর পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা ভাল ছিল না। রেনেল তাঁর 'জার্ণালে' লিখেছেন ঃ 'বারাসত ছাড়ার পর আমরা খুব কম ভাল রাস্তা পেয়েছি ; রাস্তাগুলি খুব সঙ্কীর্ণ, অসমতল ও আঁকাবাঁকা (narrow, rough and crooked)। প্রায়ই ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে রাস্তা। যখন মাঠে চাষ শুরু হয় তখন রাস্তার হদিস পাওয়া যায় না।'[৭] যশোর থেকে খুলনা এবং খুলনা থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার ঐ একই অবস্থা। এ রাস্তা সর্বত্র বক

৪। জেমস্ রেনেল, ঐ পৃঃ ১০১-১০৮।
৫। ঐ ,, পৃঃ ১১৮-১১৯।
৬। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃঃ ১১৪।
৭। জে. রেনেল, দ্য জার্নালস্, পৃঃ ৮৬।

ও অসমান। রেনেলের আর একটি মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে বাঙালীরা নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত পছন্দ করে। এর দুটি সম্ভাব্য কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন। একটি হল পর্যাপ্ত জলের সুবিধা, অপরটি হল বাংলাদেশে সাধারণত নদীর ধার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়।[৮]

খুব স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এত ভাল ভাল রাস্তা বা সড়ক ছিল না। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখাপ্রশাখা, অসংখ্য নদী ও নালা বাংলার এ অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে।[৯] এরকম ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে দুটি রাস্তা ঢাকা এবং আরো দুটি সড়ক বাখরগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিল। কলকাতা থেকে দুটি রাস্তা চট্টগ্রাম ও একটি রাস্তা ঢাকা হয়ে শ্রীহট্ট পর্যন্ত গিয়েছিল। মেঘনা নদীর পূর্বদিকের অঞ্চলগুলিতে রাস্তার অবস্থা-ভাল ছিল না বলে জানা যায়। রেনেল লিখেছেন 'লখিপুর (নোয়াখালি) থেকে চন্দরগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাগুলি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা, আর চন্দরগঞ্জ থেকে কলিন্দ পর্যন্ত অঞ্চল নীচু বলে রাস্তা প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ে থাকত।'[১০] কলিন্দা থেকে ফেণী পর্যন্ত রাস্তাগুলির অবস্থা আরো খারাপ। ফেণী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা-গুলির মাঝে মাঝে নালা ছিল আর এ রাস্তায় চলার সময় কাছাকাছি ছোট ছোট পাহাড় ও সমুদ্র দেখা যেত। তবে বেশির ভাগ নালার উপর সেতু না থাকাতে বর্ষাকালে এগুলি পার হওয়া দুঃসাধ্য হত। বলা বাহুল্য এযুগে বাংলাদেশে বেশির ভাগই মাটির কাঁচা রাস্তা। অল্প দু একটি মাত্র পাকারাস্তা।

স্থলপথে মরীচা (ইংরেজদের মিরচা) বাংলা ও বিহারের বাণিজ্য পথের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও পরিবহন ঘাঁটি। বিহারের সোরা, সিল্ক ও আফিম এখান থেকে ভাগীরথী বা জলঙ্গী হয়ে কলকাতায় আসত।[১১] কলকাতার সোনা রুপো ও ব্রডক্লথ এ পথেই পাটনা যেত। কোম্পানির উত্তর ভারতের বাণিজ্য এ পথ ধরেই পরিচালিত হত। তবে এ পথের এক মস্ত অসুবিধা হল মরীচা ও জলঙ্গীতে মাঝে মাঝে জল শুকিয়ে যেত। তখন স্থলপথ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকত না। তবে পদ্মা দিয়ে ঘোরা পথে কলকাতায় আসার জলপথ সবসময়ই খোলা থাকত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাওয়ার ভাল রাস্তা ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে তেলিয়াগাড়ি হয়ে পাটনা পর্যন্ত রাস্তা ছিল। সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূমের পশ্চিমদিকে ছোট ছোট আধা স্বাধীন সামন্ত প্রধানরা কলকাতা ও উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতা থেকে এ অঞ্চল পর্যন্ত যে রাস্তাগুলি দেখা যায় তার মধ্যে কলকাতা থেকে ছোটনাগপুরের জুনো, কুণ্ডা ও পালামৌ রাস্তা, পাচেট পর্যন্ত দুটি রাস্তা এবং সিংভূম;

৮। জে. রেনেল, ঐ, পৃঃ ৯২।
৯। জে. রেনেল, মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্তান, পৃঃ ৩৩৫।
১০। জে. রেনেল, দ্য জার্নালস্, পৃঃ ৭৫-৭৬।
১১। সুকুমার ভট্টাচার্য্য, ঐ, পৃঃ ১৮৫-৮৬।

বরাবর চারটি রাস্তার খবর রেনেলের গ্রন্থে আছে।[১২] এ অঞ্চল দিয়ে উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৭৬৩র ডিসেম্বর মাসে লেঃ নিকল কর্মনাশা নদী থেকে কলকাতা পর্যন্ত পথ জরীপ করেছিলেন। শতাব্দীর শেষ দিকে এ পথ আরো ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক কারণে কোম্পানি ক্রমশ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে।

গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে, নদীপরিবহন ও যোগাযোগের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ডাও লিখেছেন 'এখানে প্রতিটি গ্রামের জন্যে একটি খাল, প্রত্যেক পরগনার নদী, সমস্ত দেশের জন্যে গঙ্গা যে-বিভিন্ন ধারায় সাগরে পড়ে শিল্পপণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে।'[১৩] বর্ধমান, বীরভূম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি ছারা সারা বাংলাদেশে সর্বত্র নদীপরিবহনের বেশ ভাল ব্যবস্থা ছিল। রেনেল লিখেছেন এমনকি গরমের দিনেও বাংলাদেশের যেকোন স্থান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে নদীপরিবহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। বাংলাদেশে সাধারণভাবে আট মাইলের মধ্যে নদীপথ মিলে যায়। এই নদী পরিবহনে কর্মরত থাকত বাংলার প্রায় তিনলক্ষ মানুষ।[১৪] বাংলার জলপথে এদেশের এককোটি মানুষের খাদ্য ও লবণ পরিবাহিত হত। বছরে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা মূল্যের (দু মিলিয়ন পাউণ্ড) আমদানি-রপ্তানি পণ্য নদীপথে পরিবহন করা হত। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্য, কৃষিকর্মে উৎপন্ন ফসল, বাংলার মাছ ও অন্যান্য ফসল এ পথে চলাচল করত। এযুগে নদী পরিবহনে অবশ্য অনেক সময় লেগে যেত। রেনেলের হিসেবে পূর্ববঙ্গে নদীপথে যাতায়াতে একখানি নৌকার নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত জোয়ারে প্রতিদিন চল্লিশ মাইল পাড়ি দেওয়া সম্ভব হত। অন্য সময় নৌকাগুলি গড়ে পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইল পাড়ি দিতে পারত। অনেক অগভীর খাল ও ছোট নদীতে স্রোত এত কম থাকত যে দড়ি দিয়ে নৌকা টেনে নিয়ে যেতে হত।[১৫] পূর্ব-বাংলার নদীপরিবহনে এক বিপদ হল মে ও জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বাহিত ঝড় ও বৃষ্টি। অল্প-ক্ষণস্থায়ী এ ঝড়ে অনেক সময় পণ্যবাহী নৌকাগুলি ডুবে যেত। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গের বড় বড় নদীতে এ বিপদ বেশি হত।[১৬] ১৭৫৫-এর ৮ ডিসেম্বর ডিরেক্টর সভাকে লেখা কলকাতা কাউন্সিলের একখানি চিঠিতে দেখা যায় মালদা

১২। জে. রেনেল, 'ডেসক্রিপসন', পৃঃ ৪০-৭১।

১৩। আলেকজান্ডার ডাও, হিন্দুস্তান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২।

১৪। জে রেনেল, মেমোয়ার, পৃঃ ৩৩৫। রেনেল লিখেছেন ৩০.০০০ লোক নৌপরিবহনে নিযুক্ত ছিল। বুকানন হ্যামিলটন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এর দশগুণ লোককে নদী পরিবহনে নিযুক্ত দেখেছিলেন।

১৫। জে. রেনেল, ঐ. পৃঃ ৩৬০।

১৬। ঐ ,, পৃঃ ৩৫৯।

থেকে কলকাতায় কাপড়ের বেল আনতে সময় লাগত ৪৫ থেকে ৫০ দিন।

এ সময় কলকাতা থেকে দুটি জলপথ উত্তর দিকে গিয়েছিল। একটি কলকাতা থেকে বেরিয়ে জলঙ্গী ও নদীয়া হয়ে কোশী অভিমুখে আর অপরটি ভাগীরথী হয়ে সুতী পেরিয়ে বিহারের মুঙ্গের ও পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এযুগে এ পথটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হত। কলকাতা থেকে জলপথে ঢাকা যেতে হলে জলঙ্গী হয়ে পদ্মা—সেখান থেকে পাবনা হয়ে ইছামতীর মধ্য দিয়ে জাফরগঞ্জ; জাফরগঞ্জ থেকে ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা, ঢাকা থেকে নদীপথে গোয়ালপাড়া যেতে হলে লখিয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিতে হত। ঢাকা থেকে শ্রীহট্ট যাওয়ার নদীপথে পড়ত বুড়িগঙ্গা, ছোট মেঘনা ও সুরমা নদী। বাংলার পূর্বভাগে নদীগুলি এমন সুন্দরভাবে ছড়িয়ে আছে যে জনগণের পণ্য পরিবহনে কোনো অসুবিধা হত না। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি প্রধান প্রধান শহর ও শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ ছিল। সমকালীন বিদেশী পর্যটকরা পূর্ববঙ্গের নদীপথ ও নৌপরিবহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এদের রেখে যাওয়া বর্ণনা এরকম : 'নদীতীরে অসংখ্য শহর ও গঞ্জ ; নয়নমনোহর ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত। নদীগুলি দেখতে সুন্দর ও নৌপরিবহনের অত্যন্ত উপযোগী। কোনো কোনো নদী এত চওড়া ও গভীর যে এগুলি দিয়ে বড় জাহাজ স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে।'[১৭]

এযুগে সুন্দরবনের মধ্যেও অসংখ্য নাব্য নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি দিয়ে যাতায়াত এবং সুন্দরবনের প্রধান উৎপন্ন পণ্য লবণ ও কাঠ পরিবহনের কাজ চলত। এখান থেকে দুটি জলপথ—দক্ষিণপথ ও বেলেঘাটা পথ—কলকাতার দিকে গিয়েছিল। এখান থেকে হবিগঞ্জের (মাদারিপুর) মধ্য দিয়ে জলঙ্গী পর্যন্ত নাব্য নদীপথ ছিল। সুন্দরবন থেকে নদীপথে ঢাকা যাওয়া যেত। হাজিগঞ্জের (ফরিদপুর) কাছে নবাবগঞ্জ খাল দিয়ে খুব সহজে ঢাকা ও লখিপুর যাওয়া যেত। গোয়ালন্দের কাছে জাফরগঞ্জ খাল দিয়ে ঢাকা, লখিপুর ও চট্টগ্রাম যাওয়ার পথটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হত।[১৮] সারা বছর এপথে নৌ চলাচল করত। কর্ণফুলি থেকে রাঙামাটি পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ নদীপথ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে ব্যবহৃত হত। বরিশালের কাছে দুর্গাপুর খাল দিয়ে নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জের মধ্যে নৌ চলাচল করত। মেঘনার বামতীরে নারায়ণগঞ্জের একটু নীচে রাজবাড়িতে অনেকগুলি সুন্দর পোতাশ্রয় (several commodious harbours for boats) ছিল।[১৯] ঢাকার নিকট বুড়িগঙ্গা সারা বছর, এমনকি গরমের দিনেও, বড় বড় নৌকা বহন করত। মেঘনার শাখা পাগুখিয়া দিয়ে সারা বছর মালবোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। মেঘনার অপর শাখা ছোট মেঘনা দিয়ে সবচেয়ে সোজা ও ছোট পথে দাউদকান্দি থেকে শ্রীহট্টে যাওয়া যেত।

১৭। স্ট্যাভোরিনাস, ভয়েজ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৯।
১৮। জে. রেনেল, দ্য জার্নালস্, পৃঃ ২৬-২৭।
১৯। ঐ .. পৃঃ ৩৭।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকের শাখা ছোট ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসামের চিলমারি ও গোয়ালপাড়া যাওয়ার সহজ পথ ছিল। গঙ্গা-পদ্মা পথ ছাড়াও জলঙ্গী থেকে আত্রেয়ী নদীর মধ্য দিয়ে ইছামতী হয়ে ঢাকা যাওয়া যেত।

যশোরের কপোতাক্ষ নদ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বড় বড় নৌকা যাতায়াত করার জলপথ ছিল। যশোর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বুড়াশিয়া নদী দিয়ে সারা বছর বড় বড় নৌকা চলাচল করত। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, পুনর্ভবা, মহানন্দা ও ধরলা নদী এবং মানস ও ঘোগাট খাল নৌপরিবহনে সহায়ক হত। তিস্তা নদী এসময়ে কোন কোন স্থানে খুবই সঙ্কীর্ণ ও অগভীর। গ্রীষ্মকালে তিস্তা দিয়ে নৌচলাচলে অসুবিধা দেখা দিত। ঘোগাট খাল দিয়ে জানুয়ারী পর্যন্ত ১৫০ মণী নৌকা স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারত। দিনাজপুর জেলায় যোগাযোগের নদী পুনর্ভবা। ধরলা নদী ৩৫০ গজ থেকে সিকি মাইল চওড়া এবং এ নদী দিয়ে সারা বছর দুহাজার মণী নৌকা রংপুরের কুরিগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত চলাচল করত। বর্ষাকালে ধরলা পুনর্ভবার সঙ্গে যুক্ত হত। রংপুর ও কুরিগ্রামের মধ্যে রাস্তা অসমতল ও জঙ্গলাকীর্ণ; তাছাড়া ছিল মাঝে মাঝে ঝিল। এ রাস্তায় যাতায়াত করা রীতিমত কণ্টকর হত। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান নদী মহানন্দা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া ও মালদা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মহানন্দা এ জেলাগুলির যোগাযোগ ও পরিবহনের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যাতায়াতের বা পণ্যপরিবহনের উপযোগী বহু স্থল ও জলপথ ছিল। (১) এ পথগুলি বহির্বঙ্গের সঙ্গে যেমন বাংলার যোগাযোগ রেখেছিল তেমনি দেশের অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। (২) বাংলার স্থল ও জলপথ সেযুগে খুব খারাপ ও অব্যবহার্য ছিল এমন সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। (৩) যোগাযোগের অপ্রতুলতায় বাংলাদেশে স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির (self-sufficient village economy) সৃষ্টি হয়েছিল একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তার অভাব এরকম অবস্থার জন্যে অনেকখানি দায়ী। (৪) এযুগে বাংলার স্থল ও জলপথের সবচেয়ে বড় বিপদ হল মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার ও লুঠপাট, মারাঠা আক্রমণ এবং শতাব্দীর শেষে সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুদের দলবদ্ধ লুন্ঠন। (৫) অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বিপদ হল রাজশক্তির দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অভ্যন্তরীণ শুল্ক চৌকির আবির্ভাব। বাংলার নবাব ও জমিদাররা এরকম অসংখ্য শুল্ক চৌকি বসিয়ে অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক বাধা (economic barriers) সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্যে বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পণ্যপরিবহন সহজ হত না। (৬) শতাব্দীর শেষ দিকে রাস্তাঘাট ও জলপথ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বুকানন হ্যামিলটন পাটনা জেলার রাস্তাঘাটের দুর্দশা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি

জানিয়েছেন রাস্তার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে ভারবাহী পশুরাও এ পথ দিয়ে চলতে পারত না। বর্ষাকালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে থাকত। এরকম একটি জনবহুল ও ধনী দেশের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।[২০]

সমসাময়িক ব্যক্তিদের বর্ণনা থেকে[২১] স্থল ও জলপথে ব্যবহৃত যানবাহন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়, এযুগে স্থলপথে প্রধান যান হল বলদ ও ঘোড়ায় টানা গাড়ি। বলদ ও ঘোড়ার পিঠে মাল পরিবহনের ব্যবস্থাও দেখা যায়। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিবছর দুশ বলদে টানা গাড়িতে চাপিয়ে দিল্লীতে বাংলার রাজস্ব পাঠাতেন। ইংরাজ দূত জন সারম্যান (Surman) দিল্লী যাওয়ার সময় তার সঙ্গের জিনিস-পত্র পরিবহনের জন্যে ১৬০ খানি গরুর গাড়ি ভাড়া করেছিলেন।[২২] মাল পরিবহনের জন্যে বলদ ও ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছাড়া হাতি ও পশ্চিমাঞ্চলে উটের ব্যবহার হত। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের যাতায়াতের জন্যে ছিল পালকি, সুখাসন। যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশে ঘোড়ার ব্যবহার ব্যবহার খুব কম। ঘোড়ার যেটুকু ব্যবহার ছিল তা পশ্চিমাঞ্চলেই, পূর্ববঙ্গে আরো কম। বাংলাদেশে নৌপরিবহন ও যাতায়াতের জন্য নানাধরনের নৌকা ব্যবহৃত হত। 'খুলাসাৎ' রচয়িতা জানিয়েছেন শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে নৌকার সংখ্যা হল ৪,৪০০।[২৩] নৌকাগুলি নানাধরনের। এযুগে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান নৌকাগুলি হল বালাম, গোধা, স্লুপ, সারেঙ্গা, সম্পান ও কোঁদা।[২৪] করম আলি 'মুজাফ্ফর নামায়' ঘুরাব, স্লুপ, বজরা, মাসুয়া, পাতিলা, উলাখ, জালিয়া, ময়ূরপংখী, খারদুর, কোষা, চলকর, ভাওলিয়া, পাঁসুলি, পালবার প্রভৃতি নৌকার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫]

**ডাক ব্যবস্থা :** জেমস্ রেনেল তৎকালীন বাংলার ডাক চৌকি ও ডাকরাস্তাগুলির পরিচয় রেখে গেছেন। ডাকরাস্তাগুলির মাঝে মাঝে সরাইখানা ও ডাক আদান-প্রদানের জন্যে চৌকি ছিল। এখানে পথিকরা বিশ্রাম করত, ঘোড়া ও গাড়ির বলদ, খাবার ও জল পেত। রেনেলের 'জার্নালে'ও এর উল্লেখ আছে।[২৬] কলকাতা থেকে এরকম ছটি ডাকরাস্তা বাংলার বিভিন্ন দিকে গিয়েছিল। (১) কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল হয়ে বক্সার পর্যন্ত; (২) কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে দিনাজপুর: (৩) কলকাতা থেকে যশোর হয়ে ঢাকা; (৪) কলকাতা থেকে বর্ধমান; (৫) কলকাতা থেকে কুলপি। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা থেকে পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে প্রতিদিন নিয়মিত 'ডাক' যেত। সমকালীন ব্যক্তিদের প্রতিবেদন

২০। বেংগল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পাটনা, পৃঃ ১৪৫।
২১। বিজয়রাম সেন, রামপ্রসাদ, স্ট্যাভোরিনাস প্রভৃতি।
২২। সি. আর. উইলসন, আরলি এ্যানালস, ২য় খণ্ড,২য় অংশ, পৃঃ ২০-২১
২৩। সুজন রায় ভাণ্ডারী, খুলাসাৎ-, যদুনাথ সরকার, ইণ্ডিয়া অব আরঙ্গজেব, পৃঃ ৪৬।
২৪। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২৬।
২৫। করম আলি, মুজাফ্ফর নামা, যদুনাথ সরকার, বেংগল নবাবস্, পৃঃ ৫০।
২৬। জে, রেনেল, দি জার্নালস, পৃঃ ৯২।

থেকে জানা যায় সেযুগে সারা দেশের ডাক আদান-প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলা-দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠানো বা সংগ্রহ করা চলত। ডাক-হরকরা ডাক একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দিত। ডাকহরকরা ছিল দুধরনের : ক, যারা পায়ে হেঁটে ডাক বহন করত তাদের বলা হত তাপিপ বা সাধারণ হরকরা। খ, অশ্বারোহী হরকরা 'কাসিদ' নামে পরিচিত ছিল। নবাবী যুগে এদের সকলের উপরে ছিলেন ডাক বিভাগের প্রধান। ইংরাজ আমলে দুজন অফিসার ডাক বিভগের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রধান হরকরা বা তাপিপদের প্রধান এবং কাসিদদের সুপারিন্টেডেন্ট।

কাসিদরা সাধারণত দিনে পঁচিশ থেকে তিরিশ মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারত। মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে এরা আরো দ্রুতগতিতে সংবাদ পৌঁছে দিত। প্রাক্-পলাশী যুগে মুর্শিদাবাদ থেকে ২৭ ঘন্টার মধ্যে কলকাতায় সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার নজির আছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন ইংরাজদের কাশিম-বাজার কুঠি দখল করেছিলেন। নবাব দরবারে ইংরাজ প্রতিনিধি ওয়াটস্ সাহেব এ সংবাদ পরদিন কলকাতায় ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।[২৭] এযুগে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সংবাদ পাঠাতে সাধারণত সময় লাগত দুই থেকে চারদিন। পলাশী যুদ্ধের পর ডাক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে তিরিশ ঘন্টায় সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[২৮] বালেশ্বর থেকে কলকাতায় সংবাদ আসত সাত থেকে আট দিনে। মুর্শিদাবাদ থেকে রংপুর যেতে কাসিদদের সময় লাগত চারদিন। যে জমিদারির মধ্য দিয়ে কাসিদ বা ডাকহরকরা যেত সেখানকার জমিদার ও জনসাধারণ ওদের আহার, বাসস্থান, তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করত। জমিদার ও ফৌজদাররা ওদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণ সুনিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রাখত।[২৯]

২৭। এস. সি. হিল, ঐ ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৬।

২৮। সিলেক্ট কমিটি প্রসিডিংস. ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৮।

২৯। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস, মেদিনীপুর, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮, ১৮৭ ; ঐ, চট্টগ্রাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭১ ; বেঙ্গল এ্যান্ড মাদ্রাজ পেপারস্, ২য় খন্ড, পৃঃ ২ : জে. লঙ্, ঐ, পৃঃ ৪৬৫ ; প্রসিডিংস, জুন ৩০, ১৭৬৩।

# উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার আর্থিক ইতিহাসের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বাংলার জাতীয় বয়ন শিল্পের অবক্ষয় ও বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির পরিমাণে ঘাটতি। বাংলার বয়ন শিল্পের অবক্ষয়ের কারণগুলি হল: (১) ইংল্যাণ্ডে বাংলার ছাপা ও সাদা সুতীবস্ত্রের উপর ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্কের চাপ; (২) ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর বাংলার মাঝারি ও মোটা বস্ত্র আমদানি বন্ধ হয়ে যায়; (৩) শিল্প বিপ্লবের আগেই বাংলার বয়ন শিল্পের উপর আঘাত শুরু হয়েছিল। কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বাংলার বয়নশিল্পের অনেকখানি ক্ষতি করেছিল। কর্ণওয়ালিশ যখন এই ক্ষতিকর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলার বয়নশিল্পকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করলেন ঠিক তখনই শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় বাংলার জাতীয় শিল্পের সর্বনাশ হল। (৪) বিপ্লবী ফ্রান্স ও নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ (১৭৯০-১৮১৫) বাংলার বস্ত্রশিল্পের ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে দীর্ঘকাল ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্র বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। বাংলার বয়নশিল্পের অবক্ষয় এদেশের আর্থিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব রেখে যায়। প্রথমত, বাংলার মানুষের শিল্প-মুখী মানসিকতা (industrial spirit of the people)[১] নষ্ট হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে উৎকট শিল্পবিমুখতা বাঙালীকে গ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, বয়নশিল্পের পতনের পর বাংলার বস্ত্রশিল্পী, কারিগর ও সুতো মজুররা জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি বয়নশিল্পের পতনকে দ্রুততর করে। কৃষি ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল বাংলার মানুষ শুধু কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।

পলাশী-উত্তরকালে বাংলা থেকে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের একাংশ দেশের বাইরে চলে যায়। এজন্যে বাংলায় নতুন পুঁজির গঠন ও বিনিয়োগে অসুবিধা দেখা দেয়। পলাশী পরবর্তীকালে (১৭৫৭-১৭৭২) যে-অরাজকতা বাংলায় চলেছিল তার ফলেও নতুন পুঁজি গড়ে উঠেনি। যেটুকু পুঁজি বাংলার বণিক ও মহাজনদের হাতে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সেটুকু জমিতে লগ্নী করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নব্য ধনীরা তাদের পুঁজি কলকাতায় জমি ও বাড়ি, মফঃস্বলে জমিদারি ও মহাজনী কারবারে নিয়োগ করেছিল।[২] বাংলার পুঁজিপতিরা শিল্প ও বাণিজ্য থেকে পিছিয়ে এসে নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন জমিদারি, বাড়ি, জমি, মুদ্রা ও সুদের কারবারে। সম্ভবত বাংলার বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে তাদের গত চার দশকের অভিজ্ঞতা তাদের এমন দুর্ভাগ্যজনক মানসিকতার সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

১। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ২৭৭।
২। এন. কে. সিংহ, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৫।

পলাশী-পরবর্তীকালে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এদেশীয়রা ইউরোপীয়দের সহযোগী বেনিয়ান, গোমস্তা, সরকার হিসেবে টিকে ছিল ঠিকই তবে তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। এযুগে ইউরোপীয়দের বেসরকারি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মূলধনের একাংশ, সংগঠন ও অভিজ্ঞতা এদেশীয়রা সরবরাহ করত।[৩] তবে কতকগুলি পণ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার (লবণ, আফিম সোরা) এবং অন্যান্য পণ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কের ব্যক্তিগত সুবিধাজনক ব্যবসা এদেশীয় বণিক সমাজের ক্ষতিসাধন করেছিল। অসম প্রতিযোগিতার জন্যে এদেশীয় বণিকরা হয় ব্যবসায় ছেড়েছিল অথবা ইউরোপীয়দের সহযোগী হিসেবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে টিকে ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়। ইউরোপীয়রা নিজেদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শতাব্দীর শেষে তিনটি ব্যাঙ্ক, চারটি বীমা কোম্পানি,[৪] ও পনেরোটি এজেন্সি হাউস স্থাপন করেছিলেন। এদেশীয়দের মূলধন, সংগঠন ও আর্থিক প্রতিবিধানগুলির সাহায্য আর তাদের প্রয়োজন হত না। বাঙালী ও অবাঙালী বণিকরা যারা বাংলাদেশে এতকাল এগুলি সরবরাহ করত তাদের বিদায় লগ্ন আসন্ন হয়ে উঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন এ পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে সুফলগুলি কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন তার অনেকগুলিই অপূর্ণ রয়ে গেল। প্রথমদিকে সরকারি ভূমিরাজস্বের দাবী অত্যধিক বেশি হওয়ায় এবং সুদের হার বাড়তে থাকায় জমিদারির দাম নামতে থাকে। ১৭৯৭-৯৮তে জমিদারির দাম দাঁড়ায় দেয় ভূমি রাজস্বের মাত্র ৯½ গুণ।[৫] এসময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সুদের হার নামতে থাকায় জমিদারির দাম বাড়তে শুরু করে। গ্রামবাংলায় জমিদার-কৃষকের সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। সরকারি রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি জমিদার-রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ১৭৯৯-এর ৭নং রেগুলেশনে জমিদারের হাতে বাকী খাজনার দায়ে রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার দেওয়া হয়। কর্ণওয়ালিশের নতুন বিচার-বিধি জমিদার-কৃষকের সম্পর্ককে আদালতে নিয়ে হাজির করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার সুফল বাংলার কৃষকের জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। আগের দিনে যে জমিদার ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কর্ণওয়ালিশের নতুন ভূমি বন্দোবস্তে সে হল শুধু কর সংগ্রাহক।[৬] জমিদারির উন্নয়নমূলক কাজকর্মে—বাঁধ দেওয়া, জলসেচের

৩। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ২৭০।

৪। এ চারটি বীমা কোম্পানি হল 'দি ওল্ড ক্যালকাটা ইনস্যুরেন্স কোং, ক্যালকাটা ইনস্যুরেন্স কোং, বেঙ্গল ইনস্যুরেন্স কোং ও এশিয়াটিক ইকুইটেবল ইনস্যুরেন্স কোং', এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ১১।

৫। এ. ত্রিপাঠী, ঐ, পৃঃ ৮০।

৬। এন. কে. সিংহ, ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭।

ব্যবস্থা করা, জঙ্গল কেটে চাষ বাড়ানো, রাস্তাঘাট, পাঠশালা/টোল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি—খুব কম জমিদারই আগ্রহ দেখিয়েছিল। অনার্জিত আয়ে শহরে জীবন কাটানো এদের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষির আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি ও সেই সূত্র ধরে ধনসঞ্চয় বা ব্যবসা বাণিজ্য বাড়েনি। 'দায়ভাগ' ব্যবস্থায় ভূসম্পত্তি বন্টনের সুব্যবস্থা থাকায় বাংলাদেশে জমির অতি খণ্ডীকরণ ( maximum fragmentation ) পর্ব শুরু হয়ে যায় যা বাংলার কৃষির পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ( colonial economy ) রূপান্তরিত হতে শুরু করে। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন শুরু হয়। দেওয়ানি থেকে বাংলার রপ্তানি পণ্যে ইংল্যাণ্ডের সরকার ও ডিরেক্টর সভা রাজস্ব নিতে ( tribute ) শুরু করে দেয়। ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতির স্বার্থে এদেশ থেকে একে একে রেশমবস্ত্র, সুতো, মাঝারি ও মোটা কাপড় রপ্তানি বন্ধ হয়। আবার ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে এদেশ থেকে নীল ও তুলো রপ্তানি শুরু করা হয়। তেমনি পাট, শণ, তৈলবীজ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের শিল্পে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ এদেশের উৎপন্ন শিল্প পণ্যের রপ্তানি কমিয়ে বা একেবারে বন্ধ করে এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের পর্ব শুরু হয়ে যায়। বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এরই ফলশ্রুতি। বাংলার কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদন কমিয়ে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়। এগুলি হল তৈলবীজ, পাট, শণ, বাদাম, আখ, তামাক, আফিম, নীল, তুলা প্রভৃতি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অপর বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের পণ্য উপনিবেশের নিরাপদ ও একচেটিয়া বাজারে এনে বিক্রি করা অবশ্য এযুগে শুরু হয়নি। তবে ম্যানচেস্টারে বস্ত্রশিল্পে প্রস্তুত মস্লিন ও অন্যান্য কাপড় পরীক্ষামূলকভাবে বাংলার বাজারে পাঠানো হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অপর বৈশিষ্ট্য—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ—এ পর্বে নিঃসন্দেহে দেখা গিয়েছিল। রেশম উৎপাদন, আখের চাষ, চিনি শিল্প ও নীলের চাষে বিদেশী পুঁজি লগ্নী করা শুরু হয়। জাহাজ তৈরি ও পরিবহন বিদেশীদের একচেটিয়া কারবার হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ও কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের বাণিজ্য স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা ও আপস। কোম্পানি কতকগুলি পণ্যে—সোরা, আফিম ও লবণ—একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিল। তাছাড়া ইউরোপীয়

৭। জে. সি. সিংহ, ঐ, পৃঃ ২৮০।
৮। পি. জে. মার্শাল, ঐ, পৃঃ ২৭১।

বাণিজ্য ছিল কোম্পানির একচেটিয়া। অপরদিকে সিল্ক, চিনি ও নীলে বৃটিশ পুঁজি ক্রমশ কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করে। কিছুকালের জন্যে চূণ ওসুপারির ব্যবসা এদের হস্তগত হয়। বাংলায় এশীয় বাণিজ্য এদের হাতে চলে যায়। সারা শতকে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য স্বার্থ ও বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে সংঘাত ছিল তবে এ দুটি বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কখনো মারাত্মক রূপ নেয়নি। ১৭৯৩-এর চার্টার এ্যাক্টে বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের দুয়ার সীমিতভাবে তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার ও বৃটিশ বণিকদের স্বাধীন বাণিজ্যের দাবী নিয়ে দ্বন্দ্ব শেষ হল ১৮১৩ সনে যখন কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবলুপ্তি ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইউরোপীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বাংলার শিল্প ও কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ে। এজন্যে বাংলার শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে নতুন পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। বাংলার অর্থনীতির এ দুই শাখায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল এরকম অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। তবে যে অগ্রিম বা দাদন পদ্ধতিতে ইউরোপীয়দের অধীনে এদেশে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হত তাতে এদেশীয়রা খুব বেশি লাভবান হয়নি। এদেশে বহুকাল যাবত প্রচলিত দাদ্‌নি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয়রা এদেশের উৎপাদকদের নানাভাবে ঠকাত। তাই বাংলা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও বাংলার উৎপাদকরা বাড়তি পারিশ্রমিক পায়নি। বাংলার তাঁতি, রেশম কারিগর ও লবণ শ্রমিক মালঙ্গিদের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ইউরোপীয়রা এদেশীয় উৎপাদক ও শ্রমিকদের ঠকাত ঠিকই তবে এদেশের শ্রমিক-শ্রেণীর মানসিকতা ও শ্রমবিমুখতা তাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার জন্যে অনেকখানি দায়ী ছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৮০২-এ তমলুকের সল্ট এজেন্ট এদেশের সাধারণ শ্রমিকের মানসিকতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা এদেশের সমস্ত শ্রেণীর শ্রমিক সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে। 'যদি একজন শ্রমিক তার এবং তার পরিবারের জীবিকার প্রয়োজনীয় অর্থ মাসে মাসে বা এমনকি দিনে দিনে রোজগার করতে পারে তাহলে সে সন্তুষ্ট। যদি তার একমাসের রোজগারে দুমাস চলে তাহলে সে অধিক পরিশ্রম করে স্থায়ী সম্পদ অর্জন করার পরিবর্তে সাধারণত আলস্যে সময় কাটায় যতক্ষণ না তার প্রয়োজন আবার তাকে জীবিকার্জনে বাধ্য করে।'[৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির কর্মচারীদের বেসরকারি ব্যবসার স্বর্ণযুগ। শতাব্দীর শুরু থেকে কর্ণওয়ালিশ পর্যন্ত কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার পেয়েছিল। কর্ণওয়ালিশ থেকে শুধু বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার সীমিত অধিকার ভোগ করত। মুঘল সম্রাট ও বাংলার নবাবরা কোম্পানিকে যে বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধাগুলি দিয়েছিলেন কোম্পানির কর্মচারীরা তা ভোগ করত। শতাব্দীর শুরু থেকে মীরকাশিমের সময় পর্যন্ত বাংলার নবাবরা কর্মচারীদের

৯। এন. কে. সিংহ সম্পাঃ মেদিনীপুর সল্ট পেপার্স, ভূমিকা।

ব্যক্তিগত ব্যবসাকে ভাল চোখে দেখেননি। বিনাশুল্কে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অধিকারগুলি এদেশীয়দের হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে তারা আপত্তি জানিয়েছিলেন। কর্মচারীদের অবৈধ ও বিনাশুল্কের বাণিজ্য নবাব ও কোম্পানির মধ্যে অনেক বিরোধের কারণ। পলাশীর যুদ্ধ ও মীরকাশিমের সঙ্গে সংঘর্ষের পশ্চাতে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অতি মুনাফার ঝোঁক একটি শক্তিশালী কারণ হিসেবে দেখা গিয়েছিল। দেওয়ানি থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের উৎকোচ, উপঢৌকন, পারিতোষিক ও ব্যবসা থেকে লাভের পরিমাণ বিশাল। এদেশের অভ্যন্তরীণ (চাল, মোটা কাপড় ও তামাক ছাড়া), উপকূল ও এশীয় বাণিজ্য এদের একচেটিয়া। এ ব্যবসায়ে লাভের অধিকাংশই দেশে পাঠানো হয়েছিল।

বাংলার আর্থিক ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য দিকটি হল নিয়মিত আর্থিক নিষ্ক্রমণ। হ্যারি ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও এডম্যাণ্ড বার্ক থেকে আধুনিককালে হোল্ডেন ফারবার ও পি. জে. মার্শাল পর্যন্ত দুশ বছরের অধিককাল ধরে আর্থিক নিষ্ক্রমণের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিমাপ ও বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকে এবং ইংল্যাণ্ডে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ক্রমাগত আর্থিক নিষ্ক্রমণকে বাংলার আর্থিক দুর্দশার কারণ বলে মনে করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা আর্থিক নিষ্ক্রমণকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। এ শতাব্দীতে আর্থিক নিষ্ক্রমণের উৎপত্তি, পরিমাণ বা পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক অনেকখানি স্তিমিত। এখন এ বিষয়ে মূল প্রশ্নটি হল এই আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিবর্তে বাংলাদেশ বা ভারত সত্যিই কিছু লাভ করেছিল কিনা। যদি বাংলাদেশ এর পরিবর্তে অদৃশ্য সেবা বা আমদানি ভোগ করে থাকে তাহলে আর্থিক নিষ্ক্রমণকে আদৌ এ নামে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে কিনা সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। এ শতাব্দীতে থিয়োডর মরিসন থেকে পি. জে. মার্শাল পর্যন্ত সকলেই আর্থিক নিষ্ক্রমণের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদের যুক্তি হল বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর যেমন বেশ কিছু টাকা বা সম্পদ দেশের বাইরে চলে গেছে তেমনি এর বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছে: (১) বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্য, (২) বর্ধিত উৎপাদন ও বর্ধিত কর্মসংস্থান, (৩) উন্নত প্রশাসন ও সেনাবাহিনী, (৪) উন্নত ধরনের আর্থিক সংস্থা-সমূহ—ব্যাঙ্কিং, বীমা, এজেন্সি হাউস ইত্যাদি, (৫) জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ পরিবহন, চিনি ও রেশম শিল্পে উন্নত ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগ, (৬) সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যবসায়ের লভ্যাংশে এদেশে নব্য ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এদের মতে এগুলির আর্থিক মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব হলে আর্থিক নিষ্ক্রমণের ঘটনা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। এমনকি আর্থিক নিষ্ক্রমণ নামক ঘটনার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এদের সবচেয়ে জোরালো যুক্তিটি হল আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিবর্তে বাংলা-দেশ যদি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত কখনো

আর্থিক নিষ্ক্রমণ নয়। আমদানি বাণিজ্যে ঘাটতি অদৃশ্য আমদানি ও সেবা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। এদের মতে আর্থিক নিষ্ক্রমণে বাংলাদেশে আর্থিক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল বা বাংলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা যায় না। বাংলার লোকসংখ্যা, মোট উৎপাদন, মোট আয় প্রভৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে এ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

এযুগে মুদ্রা ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাসংকট। পলাশী-উত্তরকালে কোম্পানির হাতে প্রচুর টাকা আসায় রপ্তানি পণ্যক্রয়ে দেশ থেকে সোনারুপো আনার প্রয়োজন হল না। আর কোম্পানির কর্মচারীদের সঞ্চিত সম্পদ অন্যান্য বিদেশী কোম্পানিগুলির বাংলা বাণিজ্যের মূলধন হল। এজন্যে রুপোর সরবরাহ হ্রাস পায়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য ক্লাইভের সময় থেকে বাংলার বাজারে রুপোর সিক্কা টাকার পাশাপাশি সোনার মোহর বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালানোর চেষ্টা হয়। তবে সোনার মোহরের দাম রুপোর টাকার তুলনায় বেশি ধার্য হওয়ায় মোহর জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়া এরকম বেশি মূল্যের টাকা বাজারে খুচরো লেনদেনে বেশি কাজে লাগে না। মুদ্রাসংকটের অপর বৈশিষ্ট্য হল বহু মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা। কর্ণওয়ালিশ সমস্ত রকম প্রচলিত মুদ্রার বিনাব্যয়ে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে এ সংকটের সমাধান করেছিলেন। শতাব্দীর শেষে রুপোর সিক্কা (১৯ সূর্যবর্ষ সিক্কা) ও সোনার মোহর বাংলার বাজারে বৈধ মুদ্রা।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার দেশীয় ব্যাঙ্কিং-এর অবনতি শুরু হয়। জগৎ শেঠদের প্রতিযোগী অনেক ব্যাঙ্কিং পরিবার গড়ে উঠে। এরাও কোম্পানির সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারত না। হেস্টিংসের সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় হুণ্ডিতে টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দেয়। এজন্যে হেস্টিংস সরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ডিরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়ায় তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। শিল্প-বাণিজ্য থেকে সরে এসে এদেশীয় ব্যাঙ্কিং টাকার বিনিময় ও হুণ্ডির ব্যবসায় আশ্রয় করে। শতাব্দীর শেষ দিকেও কলকাতায় এদেশীয় টাকার একচেটিয়া কারবারীরা কোম্পানিকে বেশি বাট্টায় টাকা ধার দিত। মাঝে মাঝে টাকার বাজারের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ দেখা যেত। সত্তরের দশক থেকে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং ও এজেন্সি হাউসের আবির্ভাবের পর থেকে এদেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং স্বতন্ত্র ধারায় চলতে থাকে। বাংলার এশীয় ও ইউরোপীয় বাণিজ্য এদেশীয় মূলধনের আওতার বাইরে চলে যায়।

# শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|---|---|
| আইমা | বিদ্বান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত নিষ্কর জাগির। |
| আবওয়াব | অতিরিক্ত কর বা সেস। |
| আসল জমা | ভূমি রাজস্বের মূল বন্দোবস্ত (original revenue settlement)। |
| আর্কট টাকা | প্রথমদিকে আর্কটের নবাবের মুদ্রা। পরে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের দক্ষিণ ভারতের টাঁকশালে মুদ্রিত টাকা। ইংরাজ আমলে কলকাতা ও ঢাকা টাঁকশালে আর্কট টাকা তৈরি হত। |
| আমিলনামা বা আমলনামা | লিখিত নির্দেশ। |
| আমিল | রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী। |
| আহক | শ্রীহট্ট থেকে জনহিতকর কাজের জন্য আনা চুণের জন্যে অতিরিক্ত কর বা আবওয়াব। |
| আড়ঙ্‌ | পণ্য উৎপাদনের কারখানা বা মাল মজুত করার গুদাম। |
| ইজারা | সর্বোচ্চ রাজস্ব বা কর প্রদানকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত। |
| ইজারাদার | ইজারা গ্রহণকারী। |
| ইনাম-ই-আলতামঘা | বিশ্বস্ত কর্মচারীদের বংশপরম্পরায় ভোগ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত জাগির। |
| এজেন্সি সিস্টেম | কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের মাধ্যমে সরাসরি রপ্তানি পণ্যক্রয় ব্যবস্থা। |
| এজেন্সি হাউস | ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়ক আর্থিক সংস্থা। |
| ওয়াজাসাৎ খাসনোবিশি | মুৎসুদ্দি বা করণিকদের জন্যে মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত বাড়তি ভূমিরাজস্ব বা আবওয়াব। |
| কানুনগো | ভূমিরাজস্বের রেজিস্ট্রার। |
| কিমত খেস্ত গৌড় | গৌড়ের প্রাসাদ ভেঙ্গে ইট পাথর আনার খরচ। আলিবর্দি প্রবর্তিত আওয়াব। |
| ক্রোরি | ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। |
| কাসিদ | অশ্বারোহী ডাক হরকরা। |
| কন্ট্রাক্ট সিস্টেম | এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির |

| | |
|---|---|
| | রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতি। |
| কিস্তি | দেয় টাকা অল্প পরিমাণে আস্তে আস্তে শোধ দেওয়া। |
| কোর্ফা রায়ত | রায়তের অধীনস্থ রায়ত। |
| কৈফিয়ৎ | মানে লাভ। মীরকাশিমের সময় গোপন ভূমিরাজস্ব উদ্ধার। আবওয়াব। |
| কবুলিয়ত | স্বীকৃতিপত্র। ভূমিরাজস্ব আদায়কারী ও সরকারের মধ্যে এধরনের চুক্তি হত। |
| কড়ি | অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত নিম্নতম মুদ্রা। |
| কোঠি | এদেশীয় ব্যাঙ্কার ও বণিকদের কার্যালয়। |
| কাটুনি বা কাটানি | মহিলা সুতো কাটা শ্রমিক। |
| খালসা | (১) সরকারি কোষাগারে রাজস্ব প্রদানকারী অঞ্চল, (২) রাজস্ব বিভাগ |
| খালারি | সমুদ্র উপকূলে লবণ উৎপাদনের উপযোগী জমি। |
| খামার | জমিদার যে জমি ভাগচাষী দিয়ে চাষ করাত এবং শস্যের অংশ রাজস্ব হিসাবে নিত। |
| খাস জমি | সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানের জমি। |
| খাজাঞ্চী | কোষাধ্যক্ষ। |
| খেদা আফিয়াল | নবাবদের হাতি ধরার খরচ। আবওয়াব। |
| খেলাত | সম্মানসূচক বস্ত্র। আবওয়াব। |
| খোদখস্ত | যে গ্রামে চাষের জমি সে গ্রামেই বাস এমন কৃষক। স্থায়ী রায়ত। |
| গঞ্জ | বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র। |
| গোমস্তা | ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা জমিদার-মহাজনের কর্মচারী। |
| গানি | পাটের কাপড় বা চট। |
| চাকলা | মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত ভূমিরাজস্বের প্রশাসনিক বিভাগ। অনেকগুলি পরগনার সমষ্টি হল চাকলা। |
| চালানি টাকা | হিসেবের সুবিধার জন্যে কাল্পনিক টাকা। |
| চৌথ মারাঠা | আবওয়াব। মারাঠা আক্রমণের অব্যবহিত পরে আলিবর্দি এ বাড়তি ভূমিকর ধার্য করেছিলেন। |
| চৌকি | থানা বা শুল্ক আদায় করার অফিস। |
| চৌধুরী | পরগনা প্রধান, ভূমিরাজস্বের সুপারিন্টেডেন্ট ও জমিদার। |
| চাকরাণ | কর্মচারীদের দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি। |
| চোপদার | পতাকাবাহক। |

| | |
|---|---|
| জার মাথোট | পুন্যাহ্ নজর। খেলাত, বাঁধ ও মফঃস্বল থেকে রাজস্ব আনার খরচ। আবওয়াব। |
| জাগির বা জায়গির | রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট নিষ্কর জমি। |
| জাবতি | কর্মচারীদের যাবজ্জীবন ভোগের জন্যে রাষ্ট্রপ্রদত্ত নিষ্কর জমি। |
| জাছনদার | ফ্যাক্টরিতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার কর্মচারী। |
| জমা | জমিদার কর্তৃক সরকারকে দেয় বা রায়ত কর্তৃক জমিদারকে দেয় মোট রাজস্ব। |
| জরীপ বা জরীব | জমির মাপ সম্পর্কিত কার্যধারা |
| জোত | ভূমিখণ্ড। |
| জমাওয়াশিলবাকী | রাজস্বের পরিমাণ, আদায় ও বাকীর হিসাব। |
| তালুকদার | ছোট জমিদার, তালুকদার দু রকমের। হুজুরি তালুকদার হল তারা যারা সরাসরি রাজ সরকারে রাজস্ব জমা দিত। মাজকুরি তালুকদার তার উপর-ওয়ালা বড় জমিদারের মাধ্যমে রাস্বস্ব দিত। |
| তাকাবি | কৃষি ঋণ। |
| তখলিস | বার্ষিক ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের বিস্তৃত হিসেব। |
| তাপ্পি | পদাতিক ডাকহরকরা। |
| তুমার জমা | মোট ধার্য ভূমিরাজস্ব। |
| তৌফির | বর্ধিত রাজস্ব। |
| দর্শনী হুণ্ডি | হুণ্ডিতে উল্লিখিত টাকা দেখামাত্র হুণ্ডির মালিককে দেওয়া। |
| দেওয়ান | ভূমিরাজস্ব বিভাগের প্রধান। |
| দেবোত্তর | দেবতা বা দেবস্থানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিষ্কর সম্পত্তি। |
| দাম | তাম্রমুদ্রা। ৪০ দামে এক টাকা। মুঘলদের রাজস্ব দামে নির্ধারিত হত। |
| দাদ্নি বণিক | কোম্পানির অগ্রিম নিয়ে যারা রপ্তানি পণ্য সরবরাহের চুক্তি করত। |
| দস্তক | বিনাশুল্কে কোম্পানির পণ্য চলাচলের জন্যে দলিল বা ছারপত্র (পাশপোর্ট)। |
| দালাল | কমিশনে পণ্য সরবরাহকারী মধ্যস্থ ব্যক্তি। |
| দস্তুরি | কমিশন। |
| দরপত্তনিদার | পত্তনিদারের অধীনস্থ ভূমিরাজস্ব আদায়কারী। |
| নজর বা নজরানা | উপঢৌকন। |

| | |
|---|---|
| নাজিম | প্রদেশের সেনা, পুলিশ ও ফৌজদারি বিচার বিভাগের কর্তা। |
| নজরানা মোকররারি | দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোর জন্যে সুজাউদ্দিন প্রবর্তিত বাড়তি ভূমি রাজস্ব। আবওয়াব। |
| নজরানা মনসুরগঞ্জ | সিরাজের প্রাসাদ, হিরাঝিলের পাশের বাজারের উপর আলিবর্দি প্রবর্তিত আবওয়াব। |
| নিরিক | প্রচলিত স্থানীয় রাজস্ব হার। |
| নানকর | জমিদার ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট নিষ্কর জমি। |
| নারায়ণী টাকা | কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের টাকা। রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত। |
| নিমকি | লবণ উৎপাদন ক্ষেত্র। |
| নিমফালুস | তামার আধ পয়সা। |
| নবারা | নৌবহর। |
| পাইকস্ত | একগ্রামে বাস আর অন্য গ্রামে চাষের জমি এমন চাষী। অস্থায়ী রায়ত। |
| পরগনা | কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত রাজস্ব বিভাগ। |
| পত্তনিদার | তালুকের চুক্তিবদ্ধ রাজস্বের মালিক। |
| পাট্টা | জমিদার কর্তৃক রায়তকে দেয় দলিল, এতে রায়তের অধিকার, রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। |
| পুলবন্দি | বাঁধের সংস্কার। |
| পুন্যাহ্ | রাজস্ববর্ষের শুরুতে অনুষ্ঠান, সাধারণত ১লা বৈশাখ। |
| পাটোয়ারি | গ্রামের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী। |
| প্যাগোডা | দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণমুদ্রা হান। ওজন প্রায় ৫২ গ্রেন। |
| পাউ ফালুস | তামার সিকি পয়সা। |
| পাইকার | কমিশনে পণ্য সরবরাহকারী মধ্যস্থ বণিক। বড় পণ্য-ব্যবসায়ী। |
| পরোয়ানা | আদেশ বা কমিশন। |
| ফালুস | তামার পয়সা। |
| ফ্যাক্টর | ফ্যাক্টরির অধ্যক্ষ ; কোম্পানির চাকরিতে রাইটারদের পরবর্তী উচ্চপদ। |
| ফারমান | বাদশাহী আদেশ। |
| ফৌজদার | প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফৌজদারি বিচার বিভাগের জেলাকর্তা। |
| ফৌজদারি আবওয়াব | সুদূর সীমান্ত জেলাগুলির ফৌজদারি কর। আবওয়াব। |

| | |
|---|---|
| বানিয়ান বা বেনিয়ান | ইউরোপীয়দের এদেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগী। |
| বাট্টা | বিল, হুণ্ডি বা টাকার বিনিময় মাশুল। |
| বিঘা | বাংলাদেশে জমির পরিমাপের একক। এক একরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা প্রায় ১৬০০ বর্গ গজ। |
| বাজে জমিন | সরকার প্রদত্ত নিষ্কর জমি বা সামান্য রাজস্ব প্রদানকারী জমি। |
| ভকিল | এজেন্ট বা আইনব্যবসায়ী |
| মাদাদিমাস | বিদ্বান ও ধর্মপ্রাণব্যক্তিদের রাষ্ট্রপ্রদত্ত নিষ্কর জাগির। |
| মাসরুৎ | বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাগির। রাজকর্মচারীকে রাষ্ট প্রদত্ত নিষ্কর জাগির। কর্মচারী অবসর নিলে বা পদত্যাগ করলে রাষ্ট্র এ ধরনের জাগির ফিরে পেত। |
| মালজামিন বা মালজামিনী | ঋণ বা রাজস্বের নিরাপত্তার লিখিত চুক্তি বা জামিন। |
| মাথোট ফিলখানা | নাজিম ও দেওয়ানের হাতির খরচ, আবওয়াব। |
| মাথোট | জমিদার কর্তৃক রায়তের উপর স্থাপিত বর্ধিত কর। |
| মাঙ্গন | অর্থভিক্ষা, বাংলার জমিদারদের ধার্য বাড়তি রাজস্ব। |
| মাদোসি | তামার আধ আনি। দু পয়সা। |
| মুৎসুদ্দি ও মুকদ্দম | রাজস্ব বিভাগের হিসাব রক্ষক ও করণিক। |
| মাল | রাজস্ব বা কর। |
| মালগুজার | রাজস্ব প্রদানকারী। |
| মালঙ্গি | লবণ শিল্পে নিযুক্ত কারিগর। |
| মোশাইরা বা মাসোহারা | জমিদারি থেকে উৎখাত হওয়া জমিদারদের মাসিক রাহা খরচ। |
| মোহর | সোনার টাকা। |
| মুচলেকা | লিখিত চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি। |
| মিরাশী | বংশপরম্পরায় ভোগ দখল করা সম্পত্তি। |
| মোকরারি | স্থায়ী। |
| রায়ত | জমিচাষকারী কৃষক। রাজস্ব দানের বিনিময়ে জমি ভোগ করার অধিকারী। |
| রায়তওয়ারি | সরাসরি জমিচাষকারী কৃষকের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত। |
| রাহাদারি | অভ্যন্তরীণ সায়ের শুল্ক। |
| রায়রায়ান | সরকারি রাজস্ব বা খালিসা বিভাগের প্রধান। |
| রুসুদ | বর্ধিত রাজস্ব। |

| | |
|---|---|
| রুসুম | প্রচলিত কমিশন। |
| রবানা | শুল্ক চৌকির দারোগা-প্রদত্ত শুল্ক প্রদানের সার্টি-ফিকেট। |
| লাখেরাজ | করমুক্ত। |
| শিকদার | রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। |
| সওদা-ই-খাস | শাসকের একচেটিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা। |
| সওদা-ই-আম | সরকারি ব্যবসা। |
| সায়ের বা সায়ির | ভূমিরাজস্ব ছাড়া আর সবরকম কর। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও অন্যান্য শুল্ক। |
| সিক্কা | আরবী শব্দ, অর্থ মুদ্রা তৈরির ছাঁচ। কিন্তু নবাবী বাংলার বৈধ রুপোর টাকা। |
| স্রফ | মুদ্রা ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার। |
| সাজোয়াল | সরকারি কর্মচারী। জমিদারের দেয় খাজনা বাকী পড়লে নবাবরা সাজোয়াল পাঠিয়ে খাজনা আদায় করতেন। |
| সেরেস্তা | সরকারি দলিল বা অফিস। |
| সোনাত | অর্থ বছর। সিক্কা তিন বছর পর সোনাত হত তখন এর দাম কমে যেত। ১০০ সিক্কা সমান ১১৬ চা. টাকা, ১০০ সোনাত সমান ১১১ চা. টাকা। |
| হস্তবুদ | ভূমি ও রাজস্বের অতীত ও বর্তমানের বিস্তৃত হিসেব (rent roll)। |
| হাট | সাপ্তাহিক বা আধাসাপ্তাহিক বাজার। |
| হুশবুল হুকুম | সম্রাটের নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দেওয়া আদেশ। |
| হুণ্ডি | বিল অব এক্সচেঞ্জ। |
| হিস্যা | অংশ। |

# গ্রন্থপঞ্জী


| | |
|---|---|
| আবদুল করিম | মুর্শিদকুলি এ্যাণ্ড হিজ টাইমস্, ঢাকা, ১৯৬৩। |
| — | ঢাকা, দ্য মুঘল ক্যাপিটাল, ঢাকা, ১৯৬৪। |
| — | ঢাকাই মসলিন, ঢাকা সাহিত্য একাডেমী, ১৯৬৫। |
| আবদুল মজিদ খান | দ্য ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল, ১৭৫৬-১৭৭৫, কেম্ব্রিজ, ১৯৬৯। |
| ইউসুফ আলি খান | আহবাল-ই-আলিবর্দি খাঁ, ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার, বেঙ্গল নবাবস্, কলিকাতা, ১৯৫২। |
| ইরফান হাবিব | দি এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব মুঘল ইণ্ডিয়া, ১৫৫৬-১৭০৭, বোম্বাই, ১৯৬৩। |
| — | এ্যান এ্যাটলাস অব দ্য মুঘল এম্পায়ার, অক্সফোর্ড, ইণ্ডিয়া, ১৯৮২। |
| উইলসন, সি. আর. | আরলি এ্যানালস অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, চার খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৯৫-১৯০০। |
| এ্যাসকলি, এফ. ডি. | আরলি রেভেন্যু হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এ্যাণ্ড দ্য ফিফথ্ রিপোর্ট, ১৮১২, অক্সফোর্ড, ১৯১৭। |
| এ্যাসটন, টি. এস. | দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ১৭৬০-১৮৩০, লণ্ডন, ১৯৭৫। |
| ওয়ালশ, জে. এইচ. টি. | এ হিস্ট্রি অব মুর্শিদাবাদ, লণ্ডন, ১৯০২। |
| ওরমে, রবার্ট | মিলিটারি ট্রানজাকশনস্ তিন খণ্ড, লণ্ডন, ১৭৭৮। |
| — | হিস্টোরিক্যাল ফ্রাগমেন্টস্ অব দ্য মুঘল এম্পায়ার, লণ্ডন, ১৮০৩। |
| কোলব্রুক, এইচ. টি. | রিমার্কস অন দ্য হাজবাণ্ড্রি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাল কমার্স অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৮০৪। |
| করম আলি | মুজাফ্ফরনামা, ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার, বেঙ্গল নবাবস্, কলিকাতা, ১৯৫২। |
| কর্মকার, কে. সি. | চন্দননগর য়েট ডুপ্লে, কলিকাতা, ১৯৬৩। |
| গঙ্গারাম | মহারাষ্ট্রপুরাণ, সম্পাদক হারাধন দত্ত, কলিকাতা ১৩৭৩। |
| গভঃ ইণ্ডিয়া | ফোর্ট উইলিয়াম-ইণ্ডিয়া হাউস করেসপণ্ডেন্স, ১-৮ খণ্ড, নিউ দিল্লী, ১৯৪৯। |
| গোলাম হোসেন | সিয়ার মুতাক্ষরীণ, ইং অনুবাদ মঁশিয়ে রেমণ্ড, চারখণ্ড, কলিকাতা, ১৯০২। |

গোলাম হোসেন সলিম — রিয়াজ-উস-সালাতীন, ইং অনুবাদ আবদুস সালাম, কলিকাতা, ১৯০৪।

গ্রোস, জে. — ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ. দুখণ্ড, লণ্ডন, ১৭৭২।

গুপ্ত, ব্রিজেন — সিরাজুদ্দৌলা এ্যাণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, লিডেন. ১৯৬২।

গ্রান্ট, জেমস — হিস্টোরিক্যাল এণ্ড কম্পারেটিভ এ্যানালিসিস অব দ্য ফিনান্সেস অব বেঙ্গল, ১৭৮৬। ফিফথ্ রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড।

ঘোষাল, এইচ. আর. — দি ইকনমিক ট্রানজিশন ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৭৯৩-১৮৩৩, কলিকাতা, ১৯৬৬।

চৌধুরী, কে. এন. — দ্য ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া এ্যাণ্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬০-১৭৬০। কেম্ব্রিজ, ১৯৭৮।

চৌধুরী, সুশীল — ট্রেড এ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অরগানিজেশন ইন বেঙ্গল, ১৬৫০-১৭২০। কলিকাতা ১৯৭৫।

চৌধুরী, ননীগোপাল — কার্টিয়ার, কলিকাতা, ১৯৭০।

চ্যাটার্জী, অঞ্জলি — বেঙ্গল ইন দ্য রেইন অব আরঙ্গজেব। কলিকাতা, ১৯৬৮।

ডাও, আলেকজাণ্ডার — দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দুস্থান, তিনখণ্ড, লণ্ডন, ১৭৬৮-১৭৭২।

ত্রিপাঠী, অমলেশ — ট্রেড এ্যাণ্ড ফিনান্স ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৭৯৩-১৮৩৩। কলিকাতা, ১৯৭৯।

দত্ত, রমেশচন্দ্র — পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৮৭৪।

— স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসেস মিনিটস অন দ্য সাবজেক্ট অব এ পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ফর বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯০১।

— দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, দিল্লী. ১৯৬০।

দত্ত, কালীকিংকর — আলিবর্দি এ্যাণ্ড হিজ টাইমস্, কলিকাতা, ১৯৬৩।

— দ্য ডাচ ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার, ১৭৪০-১৮২৫, পাটনা, ১৯৪৮।

— স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল সুবা, ১৭৪০-১৭৭০, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৬।

— সার্ভে অব ইণ্ডিয়াজ সোস্যাল এ্যাণ্ড ইকনমিক কণ্ডিশন ইন দি এইটিনথ্ সেঞ্চুরি, ১৯৬১।

— সিরাজুদ্দৌলা, কলিকাতা, ১৯৭১।

| | |
|---|---|
| পাত্তুলো, হেনরি | এ্যান এসে অন দ্য কাল্টিভেশন অব দ্য ল্যাণ্ডস্ এ্যাণ্ড ইমপ্রুভমেন্টস্ অব দ্য রেভেন্যুস্ অব বেঙ্গল, লণ্ডন, ১৭৭২। |
| ফারমিংগার, ডব্লিউ. এ. কে. (সম্পাঃ) | দি ফিফথ্ রিপোর্ট, ১৮১২, তিন খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৭। |
| ফারবার, হোল্ডেন | জন কোম্পানি এ্যাট ওয়ার্ক, কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্, ১৯৪৮। |
| বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসন্ন | ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, কলিকাতা, ১৯৫৪। |
| বদরুদ্দিন উমর | চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, কলিকাতা, ১৯৮০। |
| বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন | বাংলার ইতিহাস, নবাবী আমল, কলিকাতা। |
| বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. সি. | দি এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব বেঙ্গল, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০। |
| বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি. এন. | আরলি ল্যাণ্ড রেভেন্যু সিস্টেম ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার কলিকাতা, ১৯৩৬। |
| বোল্টস, উইলিয়ম | কনসিডারেশন্স অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স, লণ্ডন, ১৭৭২। |
| ভ্যানসিটার্ট, এইচ. | এ ন্যারেটিভ অব দ্য ট্রানজাকশনস ইন বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৭৬। |
| ভেরেলস্ট, এইচ. | এ ভিউ অব দ্য রাইজ, প্রগ্রেস, এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব দি ইংলিশ গভর্ণমেন্ট ইন বেঙ্গল, লণ্ডন, ১৭৭২। |
| ভট্টাচার্য্য, সুকুমার | দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ্যাণ্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল, ১৭০৪-১৭৪০। কলিকাতা, ১৯৬৯। |
| ভাণ্ডারি, সুজনরায় | খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ, ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার, ইণ্ডিয়া অব আরঙ্গজেব, কলিকাতা, ১৯০১। |
| মার্টিন, এম | ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া, তিন খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৩৮। |
| মার্শাল, পি. জে. | ইস্ট ইণ্ডিয়ান ফরচুনস : দ্য ব্রিটিশ ইন বেঙ্গল ইন দি এইটিনথ্ সেঞ্চুরি। অক্সফোর্ড, ১৯৭৬। |
| মজুমদার, আর. সি. | বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৫। |
| মোরল্যাণ্ড, ডব্লিউ. এইচ. | এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইণ্ডিয়া, কেম্ব্রিজ, ১৯২৯। |
| র‍্যামসবোথাম, আর. বি, | স্টাডিজ ইন দ্য ল্যান্ড রেভেন্যু হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১৭৬৯-৮৭ অক্সফোর্ড, ১৯২৬। |

| | |
|---|---|
| রায়চৌধুরী, তপনকুমার | বেঙ্গল আণ্ডার আকবর এ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর, কলিকাতা, ১৯৫৩। |
| রেনেল, জেমস্‌। | মোমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্তান, লণ্ডন, ১৭৯৩ |
| — | দ্য জার্নালস্‌, কলিকাতা, ১৯১০। |
| — | ডেসক্রিপসন অব রোডস্‌ ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার, লণ্ডন, ১৭৭৮। |
| লিট্‌ল, জে. এইচ. | দ্য হাউস অব জগৎশেঠ। এন. কে. সিংহ সম্পাঃ কলিকাতা, ১৯৬৭। |
| লঙ্‌ রে. জে. | সিলেকশনস্‌ ফ্রম দি আনপাবলিশড রেকর্ডস্‌ অব দ্য গভর্ণমেন্ট, ১৭৪৮-১৭৬৭। কলিকাতা, ১৯৭৩ |
| সরকার, যদুনাথ | মুঘল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা, ১৯৩৬। |
| (সম্পাঃ) | হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৪৮। |
| সিং. এস. বি, | ইউরোপীয়ান এজেন্সি হাউসেস ইন বেঙ্গল, ১৭৮৩-১৮৩৩, কলিকাতা, ১৯৬৬। |
| সিংহ, হরিশ্চন্দ্র | বাংলার ব্যাঙ্কিং, কলিকাতা, ১৯৩৯। |
| — | আরলি ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯২৭। |
| সিংহ. জে. সি. | ইকনমিক এ্যানালিস্‌ অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯২৭ |
| সিংহ. এন. কে. | দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, তিন খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৬-৭০ |
| (সম্পাঃ) | হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৭ |
| স্টুয়ার্ট, চার্লস | হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, লণ্ডন, ১৮১৩। |
| স্ট্যাভোরিনাস | ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ, ইং অনুবাদ উইলকক, তিন খণ্ড, ১৭৯৩। |
| স্টুয়ার্ট, জেমস | দ্য প্রিন্সিপল অব মানি এপ্লায়েড টু দ্য প্রেজেন্ট স্টেট অব দ্য কয়েন অব বেঙ্গল, লণ্ডন, ১৭৭২। |
| স্টোকস্‌ এরিক | দি ইংলিশ ইউটিলিটেরিয়ানস এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, অক্সফোর্ড, ইণ্ডিয়া, ১৯৮২। |
| হলওয়েল, জে, জেড. | ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস, তিন ভাগে, লণ্ডন, ১৭৬৫-১৭৭১। |
| হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ. | দি এ্যানালস্‌ অব রুরাল বেঙ্গল, ১৮৮৩। |
| হিল, এস. সি. | বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, তিন খণ্ড, লণ্ডন, ১৯০৫। |
| — | থ্রি ফ্রেঞ্চমেন ইন বেঙ্গল, লণ্ডন, ১৯০৩। |

# নির্দেশিকা